মণির পাহাড়

সোভিয়েত দেশের নানা জাতির রূপকথা



সোভিয়েত দেশের নানা জাতির রূপকথা



মণির পাহাড়

সোভিয়েত দেশের নানা জাতির রূপকথা

সোভিয়েত দেশের নানা জাতির রূপকথা



মণির পাহাড়

সোভিয়েত দেশের নানা জাতির রূপকথা



'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ: ননী ভৌমিক, সুপ্রিয়া ঘোষ

সম্পাদনা: অরুণ সোম

Гора самоцветов

СКАЗКИ НАРОДОВ СССР

На языке бенгали

A Mountain of Gems

FAIRY TALES OF THE PEOPLES
OF THE SOVIET LAND

In Bengali

দ্বিতীয় সংস্করণ

স্কুলের মাঝারি বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

ISBN 5-05-001768-8

সূচী

প্রকাশকের কথা

তোমরা হয়ত জানো যে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রকাণ্ড দেশ — আয়তনে এ দেশ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো। হৃৎপিণ্ড তার মস্কো, বরফের টুপি পরা মাথাটা তার উত্তর মহাসাগরে, কাঁধের একপ্রান্ত ছুঁয়েছে আলাস্কা, অন্য প্রান্তে স্কাণ্ডিনেভিয়া, পা রেখেছে পার্বত্য ককেশাস আর পামীরে। দূর প্রাচ্যের খাবারভস্কে যখন ঊষা, পশ্চিমের মিন্‌স্ক, কিয়েভ ও অন্যান্য শহরে তখন পাটে বসছে সূর্য। ইয়াকুৎ অঞ্চলে যখন তুহিন হাওয়ার গর্জন চলে, ফারের তলায় আত্মরক্ষা করে মানুষ, তখন তাশখন্দে গোলাপ ফোটার সময়, আর কৃষ্ণ সাগর উপকূলে রোদ পোড়া হয় লোকে।

এই মস্ত দেশখানায় নানা জাতির বাস। সকলেরই তাদের আপন আপন রীতিনীতি, ঐতিহ্য, ভিন্ন ভিন্ন ভাষা। যেমন, উজবেক ভাষার সঙ্গে রুশ কি মলদাভীয় ভাষার ততটুকুই মিল, যেমন মিল ইংরেজি কি চীনা ভাষার সঙ্গে আরবী ভাষার।

আর সোভিয়েত দেশের এই সকল জাতিরই আছে নিজ নিজ উপকথা, কাহিনী। নেনেৎস, ইয়াকুৎ, চুকচি প্রভৃতি উত্তরবাসী জাতিদের উপকথা আমাদের টেনে নিয়ে যায় বরফ ঢালা তুন্দ্রায়, মেরু রাত্রির রাজ্যে, যেখানে ফুঁসে চলে বরফ ঝড়, বল্গা হরিণ আর কুকুর যেখানে মানুষের সেরা সাথী। আবার মধ্য এশিয়ার কাহিনীগুলিতে চলে উটের কারাভান, তপ্ত দক্ষিণী সূর্যের নিচে পেকে ওঠে ডালিম, রসে টইটম্বুর খরমুজ, ঝিরঝির করে অসংখ্য সেচ খাল চিরপ্রত্যাশী

ক্ষেতে ক্ষেতে জল এনে দেয়। রুশ রূপকথাগুলিতে ফুটে উঠবে আবার অন্য এক ছবি। এ সব কাহিনীর নায়কেরা হল তরুণ বীর, গ্রীষ্মে সবুজ আর শীতে সাদা বরফে ঢাকা বনকান্তার পেরিয়ে তারা ঘোড়া ছুটিয়ে যায়, আর কাঠের কোঠায় অভ্রের বাতায়নে তাদের জন্যে অপেক্ষা করে থাকে পরমাসুন্দরী রাজকন্যারা।

বইটি খোলামাত্রই পাঠক গিয়ে পড়বে রূপকথার এক জগতে। চাষীর ছেলে ইভানের সঙ্গে লড়তে শুরু করবে নাক দিয়ে আগুন-ছোটানো দ্বাদশমুণ্ড অসুর, মটর-গড়গড়ির পেছু পেছু নেমে যাবে পাতালপুরীর রাজ্যে, পাড়ি দেবে ঈগলের পিঠে চড়ে, বুদ্ধিমতী জার্নিয়ারের কাছে ধূর্ত নিষ্ঠুর শাহকে জব্দ হতে দেখে অবাক মানবে, উদ্দীপিত হবে নির্ভীক ব্যাধ বরোল্‌দেই-মের্গেনকে দেখে, জাতিকে উদ্ধার করার জন্যে যে তার আপন ছেলেটিকে ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে পাঠিয়েছিল, মুগ্ধ হবে রাজার জ্ঞানীগুণী মন্ত্রীদের ছাপিয়ে সাধারণ এক তাঁতীর অশেষ উপস্থিত বুদ্ধি দেখে।

আশা রইল, এদের সঙ্গে, তোমাদের কাছে নতুন এই সব নায়কদের সঙ্গে পরিচয় হলে তোমরা তাদের ভালোবাসবে, তারাও তোমাদের আপন জন হয়ে উঠবে।

ব্যাঙ রাজকুমারী

(রুশী রূপকথা)





অনেকদিন আগে ছিল এক রাজা। তার তিন ছেলে। সবাই যখন সাবালক হল তখন একদিন রাজা তাদের ডেকে বললে:

'দেখ বাছারা, আমি তোমাদের বিয়ে দিয়ে মরবার আগে নাতিনাতনির মুখ দেখে যেতে চাই।'

ছেলেরা উত্তর দিল, 'সে তো ভালো কথা বাবা, আশীর্বাদ করুন। বলুন কাকে বিয়ে করব?'

'তোমরা প্রত্যেকে এক একটি করে তীর নিয়ে ফাঁকা মাঠে গিয়ে ছুঁড়বে। যার তীর যেখানে পড়বে তার ভাগ্য সেখানে বাঁধা।'

রাজপুত্ররা বাবাকে প্রণাম করে একটি করে তীর নিয়ে ফাঁকা মাঠে চলে গেল। ধনুক টেনে তীর ছুঁড়ল।

বড়ো রাজপুত্রের তীর পড়ল এক আমীরের বাড়ীর উঠোনে। আমীরের মেয়ে সেটি তুলে নিলে। মেজো রাজপুত্রের তীর পড়ল এক সওদাগরের বাড়ীর উঠোনে। সওদাগরের মেয়ে সেটি তুলে নিলে।

কিন্তু ছোটো ইভান রাজপুত্রের তীর উঁচুতে উঠে কোথায় যে গেল, কে জানে। তীরের খোঁজে রাজপুত্র চলে আর চলে। যেতে যেতে একটা জলার কাছে এসে দেখে একটা ব্যাঙ তীরটা নিয়ে বসে আছে।

রাজপুত্র বলল, 'ব্যাঙ, ও ব্যাঙ, আমার তীর ফিরিয়ে দাও।'

আর ব্যাঙ বলে, 'আগে বিয়ে করো আমায়!'

'সে কী, একটা ব্যাঙকে বিয়ে করব কী?'

'বিয়ে করো, সেই যে তোমার ভাগ্য।'

রাজপুত্রের ভীষণ দুঃখ হল। কিন্তু কী আর করে। ব্যাঙটাকে তুলে বাড়ী নিয়ে এল। রাজা তিনটে বিয়ের উৎসব করলে: বড়োজনের বিয়ে দিলে আমীরের মেয়ের সঙ্গে, মেজোজনের সওদাগর কন্যের সঙ্গে আর বেচারী ছোটো ইভান রাজপুত্রের বিয়ে হল একটা ব্যাঙের সঙ্গে।

একদিন রাজা ছেলেদের ডেকে বললে, 'আমি দেখতে চাই, তোমাদের কোন বৌয়ের হাতের কাজ ভালো। কাল সকালের মধ্যেই সবাই একটা করে শার্ট সেলাই করে দিক।'

ছেলেরা বাবাকে প্রণাম করে বেরিয়ে গেল।

ছোটো ইভান রাজপুত্র বাড়ী গিয়ে মাথা হেঁট করে বসে রইল। ব্যাঙটা থপ্‌থপ্‌ করে এসে জিজ্ঞেস করে:

'কী হল রাজপুত্র, মাথা হেঁট কেন? কোন বিপদে পড়েছ বুঝি?'

'বাবা বলেছেন, তোমায় কাল সকালের মধ্যে একটা শার্ট সেলাই করে দিতে হবে।'

ব্যাঙ বলল:

'ভাবনা নেই ইভান রাজপুত্র, বরং ঘুমিয়ে নাও। রাত পোয়ালে বুদ্ধি খোলে।'

রাজপুত্র শুতে গেল। আর ব্যাঙ করল কী, থপ্‌থপিয়ে বারান্দায় গিয়ে ব্যাঙের

চামড়া খসিয়ে হয়ে গেল যাদুকরী ভাসিলিসা — রূপবতী সেই, তুলনা তার নেই!

যাদুকরী ভাসিলিসা হাততালি দিয়ে ডেকে বললে:

'দাসীবাঁদীরা জাগো, কোমর বেঁধে লাগো! কাল সকালের মধ্যেই আমায় একটা শার্ট সেলাই করে দেওয়া চাই, ঠিক যেমনটি আমার বাবা পরতেন।'

পরদিন সকালে ইভান রাজপুত্র উঠে দেখে ব্যাঙ থপ্‌থপ্‌ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর টেবিলের ওপর তোয়ালে মোড়া একটি শার্ট। রাজপুত্রের আর আনন্দ ধরে না। শার্টটা নিয়ে এল সোজা বাপের কাছে। রাজা তখন অন্য ছেলেদের উপহার নিচ্ছে। বড়ো ছেলের শার্টটা নিয়ে রাজা বললে:

'এ শার্ট পরে দীন দরিদ্রে।'

মেজো রাজপুত্র শার্টটা মেলে ধরতে রাজা বললে:

'এটা পরে বাইরে যাওয়া চলে না।'

এবার ইভান রাজপুত্র তার শার্টটা মেলে ধরল। সে শার্টে সোনায় রূপোয় চমৎকার নক্সা তোলা। চোখ পড়তেই রাজা বললে:

'একেই বলে শার্ট। পালপার্বণে পরার মতো।'

বড়ো দু'ভাই বাড়ী যেতে যেতে বলাবলি করে:

'ইভান রাজপুত্রের বৌকে নিয়ে আমাদের হাসাহাসি করা ঠিক হয় নি। ব্যাঙ নয় ও, মায়াবিনী...'

আবার রাজা তিন ছেলেকে ডেকে পাঠালে।

'তোমাদের বৌদের বলো কাল সকালের মধ্যে আমায় রুটি বানিয়ে দিতে হবে। কে সবচেয়ে ভালো রাঁধে দেখব।'

আবার ছোটো ইভান রাজপুত্র মাথা হেঁট করে বাড়ী ফিরে এল। ব্যাঙ বললে:

'রাজপুত্র, এত মনভার কেন?'

'রাজামশাই বলেছেন কাল সকালের মধ্যে রুটি বানিয়ে দিতে হবে।'

'ভাবনা করো না রাজপুত্র। শুতে যাও, রাত পোয়ালে বুদ্ধি খোলে।'

অন্য বৌরা ব্যাঙকে নিয়ে আগে হাসাহাসি করেছে। এবার কিন্তু এক বুড়ী দাসীকে পাঠিয়ে দিল দেখে আসতে, কী করে ব্যাঙ রুটি বানায়।

ব্যাঙ কিন্তু ভারি চালাক। টের পেয়ে গেল ওদের মতলব। তাই ময়দা মেখে লেচি তৈরী করে নিয়ে চুল্লির উপরটা ভেঙে সবটা লেচি সেই গর্তে ঢেলে দিল। বুড়ী দাসী দৌড়ে গিয়ে রাজবধূদের খবর দিলে। বৌরাও ঠিক তাই করতে লাগল।

তারপর ব্যাঙ কিন্তু ওদিকে লাফিয়ে বাইরে গিয়ে যাদুকরী ভাসিলিসা হয়ে গেল। হাততালি দিয়ে ডেকে বলল:

'দাসীবাঁদীরা জাগো, কোমর বেঁধে লাগো! কাল সকালের মধ্যেই আমায় একটা সাদা ধবধবে নরম রুটি বানিয়ে দিতে হবে, ঠিক যেমনটি আমি বাড়ীতে খেতাম।'

পরদিন সকালে রাজপুত্র উঠে দেখে টেবিলের ওপরে এক রুটি, গায়ে তার নানা রকম নক্সা: চারিপাশে কত শত মূর্তি, উপরে নগর আর তোরণ।

রাজপুত্র ভারি খুশী, তোয়ালে মুড়ে রুটি নিয়ে গেল বাবার কাছে। রাজা তখন বড়ো ছেলেদের রুটি নিচ্ছিল। বুড়ী দাসীর কথা মতো বড়ো দুই ভাইয়ের বৌ ময়দাটা সোজা চুল্লির ভিতর ফেলে দিয়েছিল। ফলে যা হল সে এক পোড়াধরা এক একটা তাল। রাজা বড়ো ছেলের হাত থেকে রুটিটা নিয়ে দেখেই পাঠিয়ে দিলে নোকর মহলে। মেজো রাজপুত্রের রুটিরও সেই একই দশা হল। আর ছোটো ইভান রাজপুত্র রাজার হাতে রুটি দিতেই রাজা বলে উঠলে:

'একেই বলে রুটি! এই হল পালপার্বণে খাওয়ার মতো।'

পরদিন রাজা তার তিন ছেলেকে বৌ নিয়ে নেমন্তন্নে আসতে বললে।

ইভান রাজপুত্র আবার মুখ ভার করে বাড়ী ফিরল, দুঃখে মাথা হেঁট করল। ব্যাঙ থপ্‌থপ্‌ করে লাফায়:

'গ্যাঙর গ্যাঙ, গ্যাঙর গ্যাঙ, রাজপুত্র, মন খারাপ কেন তোমার? বাবা বুঝি কিছু মন্দ কথা বলেছেন!'

'ব্যাঙ বৌ, ব্যাঙ বৌ, মন খারাপ না হয়ে করি কী? বাবা চান তোমাকে নিয়ে আমি নেমন্তন্নে যাই। কিন্তু লোকজনের সামনে তোমায় দেখাই কী করে?'

ব্যাঙ বলে:

'রাজপুত্র, ভাবনা করো না, একাই যেও নেমন্তন্নে, আমি পরে যাব। খট্‌খট্‌ দুম্‌দাম্‌ শব্দ হলে ভয় পেও না। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলো, 'ও আমার ব্যাঙ বৌ আসছে কৌটোয় চড়ে।' '

ইভান রাজপুত্র তাই একাই গেল। বড়ো দুই ভাই গেল গাড়ী হাঁকিয়ে, বৌ জাঁকিয়ে। কত বেশ, কত ভূষা, গালে রঙ, চোখে কাজল। সবাই ছোটো রাজপুত্রকে নিয়ে হাসাহাসি করতে লাগল।

'সে কী, তোর বৌকে আনলি না যে? একটা রুমালে করেও তো আনতে পারতিস, সত্যি রূপসীকে জোটালি কোথা থেকে? কোন খাল বিল তল্লাশ করে?'

তিন ছেলে নিয়ে ছেলের বৌ নিয়ে, অতিথি অভ্যাগত নিয়ে রাজামশাই বসলে জাজিম ঢাকা ওক কাঠের টেবিলে। ভোজ শুরু হবে। হঠাৎ শুরু হল খট্‌খট্ দুম্‌দাম্ আওয়াজ। সে আওয়াজে সারা রাজপুরী কেঁপে উঠল থরথরিয়ে, অতিথিরা ভয়ে লাফিয়ে উঠল। কিন্তু ইভান রাজপুত্র বললে, 'অতিথ সজ্জন ভয় নেই, ও আমার ব্যাঙ বৌ এল কৌটোয় চড়ে।'

ছ'টা সাদা ঘোড়ায় টানা সোনা মোড়া এক জুড়ি গাড়ী এসে থামল রাজপুরীর অলিন্দের কাছে। গাড়ী থেকে নেমে এল যাদুকরী ভাসিলিসা, আকাশী নীল পোশাকে তার ঝলমলে তারা, মাথায় জ্বলজ্বলে বাঁকা চাঁদ; সে কী রূপ, জানার নয় বোঝার নয়, রূপকথাতেই পরিচয়। ভাসিলিসা ইভান রাজপুত্রের হাত ধরে নিয়ে গেল জাজিম ঢাকা ওক কাঠের টেবিলে।

শুরু হল পানভোজন, ফুর্তি। যাদুকরী ভাসিলিসা করল কি, গেলাস থেকে পান করে বাকিটুকু ঢেলে নিলে বাঁ হাতার মধ্যে। মরালীর মাংস কামড়ে খেয়ে হাড়গুলো রেখে দিলে ডান হাতার মধ্যে।

দেখাদেখি বড়ো বৌ দু'জনও তাই করল।

খাওয়া হল দাওয়া হল, শুরু হল নাচ। যাদুকরী ভাসিলিসা ইভান রাজপুত্রের হাত ধরে এগিয়ে গেল। তালে তালে নাচে, ঘুরে ঘুরে নাচে — সবাই একেবারে অবাক। নাচতে নাচতে বাঁ হাত দোলালে ভাসিলিসা আর হয়ে গেল একটা হ্রদ। ডান হাত দোলালে, অমনি সাদা সাদা মরালী জেগে উঠল। রাজা আর অতিথি অভ্যাগতেরা সবাই বিস্ময়ে হতবাক্।

তারপর অন্য বৌরাও নাচতে উঠল। ওরাও এক হাত দোলাল, অতিথিদের গা ভিজল শুধু। অন্য হাত দোলাল, ছড়িয়ে পড়ল শুধু হাড়। একটা হাড় গিয়ে

লাগল একেবারে রাজার চোখে। রাজা ভয়ানক রেগে গিয়ে তক্ষুনি দুই বৌকে বের করে দিলে।

ইতিমধ্যে ইভান রাজপুত্র করেছে কি, লুকিয়ে লুকিয়ে দৌড়ে বাড়ী গিয়ে ব্যাঙের চামড়াটা ছুঁড়ে সোজা একেবারে উনুনে।

যাদুকরী ভাসিলিসা বাড়ী এসে ব্যাঙের চামড়া আর খুঁজে পায় না! মনের দুঃখে একটা বেঞ্চে বসে ভাসিলিসা রাজপুত্রকে বলল:

'এ কী করলে রাজপুত্র! আর যদি তিনদিন অপেক্ষা করতে তবে আমি চিরদিনের মত তোমার হয়ে যেতাম। কিন্তু এখন বিদায়। সাত সমুদ্দুর আর তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে যেখানে পিশাচ রাজা থাকে সেখানে আমার খোঁজ করো...'

এই বলে যাদুকরী ভাসিলিসা একটা ধূসর রঙের কোকিল হয়ে উড়ে গেল জানলা দিয়ে। রাজপুত্র কাঁদে কাঁদে, তারপর উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমে প্রণাম করে চলে গেল যেদিকে দুচোখ যায়: যাদুকরী ভাসিলিসাকে খুঁজে বার করবে। গেল অনেকদূরে ন্যাকি অল্প দূরে, অনেক দিন নাকি অল্প দিন, কে জানে; বুটের গোড়ালি ক্ষয়ে গেল, জামার কনুই ছিঁড়ে গেল, টুপি হল ফাড়া ফাড়া। যেতে যেতে এক থুড়থুড়ে ক্ষুদে বুড়োর সঙ্গে দেখা।

'কুশল হোক কুমার, কিসের খোঁজে নেমেছ? কোন পথে চলেছ?'

রাজপুত্র বুড়োকে তার বিপদের কথা খুলে বলল। ক্ষুদে বুড়ো বললে:

'হায়, হায়, ব্যাঙের চামড়াটা পোড়াতে গেলে কেন রাজপুত্র? ওটা তোমার পরার নয়, ওটা তোমার খোলারও নয়। যাদুকরী ভাসিলিসা তার বাবার চেয়েও বেশি যাদু জ্ঞান নিয়ে জন্মেছিল। তাই ওর বাবা শাপ দিয়ে তিনবছরের জন্যে ওকে ব্যাঙ করে দিয়েছিলেন। যাক, এখন তো আর কোনো উপায় নেই। এই সুতোর গুটি ন্যাও। এটা যেদিকে গড়াবে সেদিকে যেও। ভয় পেয়ো না।'

ইভান রাজপুত্র বুড়োকে ধন্যবাদ দিয়ে সুতোর গুটির পেছন পেছন চলল। সুতোর গুটি আগে আগে গড়িয়ে চলে, আর রাজপুত্র পেছন পেছন যায়। একদিন এক ফাঁকা মাঠে ভালুকের সঙ্গে দেখা। রাজপুত্র লক্ষ্যস্থির করে মারতে যাবে, হঠাৎ মানুষের গলায় কথা কয়ে উঠল ভালুক:

'মেরো না রাজপুত্র, কোনদিন হয়ত আমি তোমার কাজে লাগতে পারি।'



রাজপুত্র ভালুককে আর মারল না। এগিয়ে চলল। হঠাৎ দেখে একটা হাঁস মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। রাজপুত্র লক্ষ্যস্থির করতেই হাঁসটা মানুষের গলায় বলে উঠল:

'মেরো না রাজপুত্র, কোনদিন হয়ত আমি তোমার কাজে লাগতে পারি।'

রাজপুত্র হাঁসটাকে ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে চলল। হঠাৎ একটা খরগোস দৌড়ে বেরিয়ে এল। রাজপুত্র তীর-ধনুক তুলে মারতে যাবে; খরগোসটা মানুষের মতো গলায় বলে উঠল:

'মেরো না রাজপুত্র, কোনদিন হয়ত আমি তোমার কাজে লাগতে পারি।'

রাজপুত্র খরগোসটাকে আর মারল না। এগিয়ে চলল। হাঁটতে হাঁটতে দেখে কি, নীল সমুদ্রের ধারে একটা পাইক মাছ ডাঙার বালিতে পড়ে খাবি খাচ্ছে।

'ইভান রাজপুত্র, দয়া করো আমায়, নীল সমুদ্রে ছেড়ে দাও!'

রাজপুত্র পাইক মাছটা জলে ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রের তীর ধরে হাঁটতে লাগল কতদিন কে জানে, সুতোর গুটি গড়াতে গড়াতে এল এক বনের কাছে। সেখানে রাজপুত্র দেখে মুরগীর পায়ের উপর একটা কুঁড়েঘর ক্রমাগত ঘুরে চলেছে।

'কুঁড়েঘর, ও কুঁড়েঘর, বনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আমার দিকে মুখ করে দাঁড়াও!'

কুঁড়েঘরটা বনের দিকে পিঠ রেখে রাজপুত্রের দিকে মুখ করে দাঁড়াল। রাজপুত্র ঘরে ঢুকে দেখে চিমনীর কাছে ন'থাক ইঁটের ওপর শুয়ে আছে বাবা-ইয়াগা ডাইনি, তার খ্যাংড়াকেঠো পা, দাঁত নেমেছে হেথা, নাক উঠেছে হোথা!

রাজপুত্রকে দেখে ডাইনিটা বলে উঠল, 'আমার কাছে কেন আগমন, সজ্জন কুমার? কাজ আছে কি করার, নাকি কাজের ভয়ে ফেরার?'

'ওরে পাজী বুড়ী থুবড়ি, আগে খাওয়া দে, দাওয়া দে, চানের জন্যে জল দে, তারপর শুধোস।'

বাবা-ইয়াগা আগে রাজপুত্রকে গরম জলে চান করালে, খাওয়ালে দাওয়ালে, বিছানা পেতে শোয়ালে। ইভান রাজপুত্র তখন বাবা-ইয়াগাকে বলল যে সে তার বৌ যাদুকরী ভাসিলিসাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ডাইনি বলল, 'জানি, জানি! তোমার বৌ এখন পিশাচ রাজার কবলে। ওকে

2-406

ফিরে পাওয়া বাপ্‌ মুশকিল। পিশাচ রাজার সঙ্গে এঁটে ওঠা সহজ না। ওর প্রাণ আছে এক ছুঁচের ডগায়, ছুঁচ আছে এক ডিমের ভিতর, ডিম আছে এক হাঁসের পেটে, হাঁস আছে এক খরগোসের পেটে, খরগোস আছে এক পাথরের সিন্দুকে, সিন্দুক আছে এক লম্বা ওক গাছের মাথায় আর ঐ গাছটা পিশাচ রাজার চোখের মণি, কড়া পাহারা সেখানে।'

রাজপুত্র রাত্তিরটা বাবা-ইয়াগার বাড়ীতেই কাটাল। পরদিন সকালে বুড়ী তাকে সেই লম্বা ওক গাছে যাবার পথটা দেখিয়ে দিল। অনেক পথ নাকি অল্প পথ, কতদূর রাজপুত্র গেল কে জানে। দেখে — দাঁড়িয়ে আছে এক লম্বা ওক গাছ। শনশন করছে তার পাতা, সেই গাছের মাথায় একটা পাথরের সিন্দুক। কিন্তু তার নাগাল পাওয়া অসম্ভব।

হঠাৎ কোথা থেকে সেই ভালুকটা এসে করল কি, শেকড়সুদ্ধ উপড়ে দিলে গাছটাকে। সিন্দুকটা দুম্ করে মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে চৌচির। অমনি সিন্দুক থেকে একটা খরগোস বেরিয়ে যত জোর পারে দৌড়ে পালাতে গেল। কিন্তু সেই আগের খরগোসটা ওকে তাড়া করে ধরে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল। অমনি খরগোসটার পেট থেকে একটা হাঁস বেরিয়ে সাঁ করে আকাশে উঠে গেল। তখন দেখতে না দেখতে সেই আগের হাঁসটা তাকে ধাওয়া করে ঝাপটা মারতেই ডিম পড়ল। সে ডিম পড়ল নীল সমুদ্রে...

রাজপুত্র তখন ভীষণ কাঁদতে লাগল। সমুদ্র থেকে কী করে এখন ডিম খুঁজে পাবে! হঠাৎ দেখে সেই পাইক মাছটা সাঁতার কেটে পারের দিকে আসছে, মুখে সেই হাঁসের ডিমটা। রাজপুত্র ডিমটা নিয়ে ভেঙ্গে ফেলল। তারপর ভাঙতে লাগল ছুঁচের ডগা। রাজপুত্র ভাঙে আর উথালপাথাল করে পিশাচ রাজা, দাপাদাপি করে। কিন্তু যতই করুক পিশাচ রাজা ছুঁচের ডগাটি ভেঙে ফেলল রাজপুত্র, মরতে হল তাকে।

রাজপুত্র তখন চলল পিশাচের শ্বেতপাথরের পুরীতে। যাদুকরী ভাসিলিসা ছুটে এল রাজপুত্রের কাছে। চুমো খেল তার মধুঢালা মুখে। তারপর ভাসিলিসা আর রাজপুত্র দু'জনে নিজেদের দেশে ফিরে এল। সেখানে তারা অনেক বুড়ো বয়স অবধি সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করতে লাগল।

কুড়ুলের জাউ

(রুশী কাহিনী)



ছুটিতে বাড়ী যাচ্ছে এক বুড়ো সৈনিক। হেঁটে হেঁটে পা টাটাচ্ছে; ক্ষিদেও পেয়েছে। এক গ্রামে পৌঁছেই সে প্রথম কুঁড়েটার দরজায় টোকা দিল।

'দরজা খোলো গো, পথের লোক জিরিয়ে নেবে।'

দরজা খুলেল এক বুড়ী। বললে:

'এস, এস সৈনিক।'

'দুটি মুখে তোলার মতো কিছু আছে, গিন্নিমা?'

বুড়ীর সবই ছিল কিন্তু সৈনিককে খাওয়াতে মন উঠল না, ভান করলে যেন অনাথা অভাগা।

'কী আর বলি ভালো মানুষের পো, আমি নিজেই আজ এখানো কিছু মুখে তুলি নি, কিছুই নেই ঘরে।'

সৈনিক বলে, 'নেই যখন, নেই! কী আর করা।'

হঠাৎ তার চোখে পড়ল বেঞ্চির তলায় একটা হাতল-ভাঙা কুড়ুল।
বলে, 'আর কিছু যখন নেই তখন ঐ কুড়ুলটা দিয়েই জাউ রাঁধা যাক।'
বুড়ী হাঁ করে তাকিয়ে রইল।
'কুড়ুল দিয়ে জাউ, সে আবার কেমন?'
'দেখই না! একটা পাত্র দাও তো!'
পাত্র নিয়ে এল বুড়ী। সৈনিকটি কুড়ুলটা বেশ করে ধুয়ে, পাত্রটায় রাখল। তারপর জল দিয়ে উনুনে চাপিয়ে দিলে।
বুড়ীর চোখ একেবারে ছানাবড়া।
একটা চামচে নিয়ে ঘট্‌ঘট্‌ করে নাড়তে লাগল সৈনিক। চেখে দেখল।
বলে, 'এক্ষুনি হয়ে যাবে। ইস, একটু নুন যদি থাকত।'
'তা নুন বাপু আমার আছে,' বুড়ী বললে, 'এই নাও!'
নুন দিয়ে আবার চেখে বলে:
'ইস্‌, এর মধ্যে এক মুঠো ক্ষুদ যদি পড়ত, তাহলে আর দেখতে হত না।'
বুড়ী ভাঁড়ার থেকে ছোট একটা থলে ভর্তি ক্ষুদ এনে দিলে।
'তা নাও, যেমনটি দরকার তেমনি করেই রাঁধো!'
সৈনিকটি রাঁধছে তো রাঁধছেই। খালি চামচে নাড়ছে আর থেকে থেকেই চাখছে।
বুড়ী আর সেদিক থেকে চোখ ফেরাতে পারে না।
'আহ্‌, দিব্যি হয়েছে জাউ। শুধু এই সঙ্গে একটু ঘি যদি পড়ত না, তাহলে তোফা হত!'
বুড়ী ঘিও যোগাড় করে আনল।
তৈরি হল জাউ।
'নাও খেতে শুরু করো, গিন্নিমা!'
দু'জনে মিলে খায়। প্রশংসা আর ধরে না।
'দ্যাখো দিকি, ভাবতেই পারি নি যে কুড়ুল দিয়ে আবার এমন খাসা জাউ রাঁধা যায়,' অবাক হয় বুড়ী।
সৈনিকটি খেয়েই চলে আর মিটিমিটি হাসে।

সিভ্কা-বুর্কা

(রুশী রূপকথা)



এক যে ছিল বুড়ো। তার তিন ছেলে। বড়ো দুই ছেলে চাষবাস দেখত, মাথা উঁচিয়ে চলত, বেশভূষা করত। ছোট ছেলে বোকা ইভান তেমন কিছু নয়। সারাদিন সে বাড়ীতেই চুল্লীর উপরের তাকে বসে কাটাত। আর মাঝে মাঝে বনে যেত ব্যাঙের ছাতা তুলতে।

বুড়োর যখন মরবার সময় তখন একদিন তিন ছেলেকে ডেকে বললে:

'আমি মরে গেলে পর পর তিন রাত আমার কবরে রুটি নিয়ে আসিস।'

বুড়ো মারা গেল। তাকে কবর দেওয়া হল। সেই রাত্রে বড়ো ভাইয়ের কবরে যাওয়ার পালা। কিন্তু বড়ো ভাইয়ের আলসেমি লাগে নাকি ভয় পায়। ছোট ভাই বোকা ইভানকে বলে:

'ইভান, আজ যদি তুই আমার বদলে বাবার কবরে যাস, তবে তোকে একটা পিঠে কিনে দেব।'

ইভান তক্ষুনি রাজি। রুটি নিয়ে চলে গেল বাবার কবরে। বসে বসে অপেক্ষা করে। ঠিক রাত দুপুরে কবরের মাটিটা দু'ফাঁক হয়ে বুড়ো বাবা বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে:

'কে ওখানে? আমার বড়ো ছেলে নাকি? বল তো শুনি, রুশদেশের খবর কী? কুকুরেরা কি ডাকছে, নেকড়েরা গজরাচ্ছে, নাকি আমার বাছারা কাঁদছে?'

ইভান বললে, 'বাবা, এই যে আমি, তোমার ছেলে। রুশদেশ বেশ শান্তিতেই আছে বাবা!'

বুড়ো তখন পেট ভরে রুটি খেয়ে আবার কবরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। আর ইভান পথে থামতে থামতে ব্যাঙের ছাতা কুড়িয়ে কুড়িয়ে বাড়ী ফিরল। বাড়ী ফিরতে বড়ো ভাই জিজ্ঞেস করলে:

'হ্যাঁ রে, বাবাকে দেখলি?'

'হ্যাঁ, দেখেছি।'

'রুটি খেল?'

'হ্যাঁ খেল, পেট পুরে।'

আর একটা দিন কেটে গেল। সেদিন মেজো ভাইয়ের যাবার পালা। আলসেমি করেই হোক বা ভয় পেয়েই হোক মেজো ভাই বলে:

'ইভান, তুই বরং আজ আমার বদলে যা, তোকে এক জোড়া ছালবাকলের জুতো বুনে দেব।'

ইভান বললে, 'বেশ।'

রুটি নিয়ে ইভান আবার গেল কবরের কাছে। অপেক্ষা করে বসে রইল। ঠিক রাত দুপুরে কবরের মাটিটা দু'ফাঁক হয়ে ইভানের বুড়ো বাবা বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে:

'কে ওখানে? আমার মেজো ছেলে নাকি? বল তো শুনি, রুশদেশের খবর কী? কুকুরেরা কি ডাকছে, নেকড়েরা গজরাচ্ছে, নাকি আমার বাছারা কাঁদছে?'

ইভান জবাব দিলে:

'আমি তোমার ছেলে, বাবা। রুশদেশ বেশ শান্তিতেই আছে।'

বুড়ো তখন পেট ভরে রুটি খেয়ে কবরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। পথে থেমে থেমে ব্যাঙের ছাতা কুড়িয়ে কুড়িয়ে বাড়ী ফিরল ইভান। বাড়ী ফিরতে মেজো ভাই জিজ্ঞেস করলে:

'হ্যাঁ রে, রুটি খেল বাবা?'

'খেল, পেট পুরে খেল।'

তৃতীয় রাত্তির। সেদিন ইভানের যাবার পালা। ইভান দাদাদের বললে:

'দু' রাত্তির আমি গেছি। আজ তোমরা কেউ যাও। আমি বাড়ীতে বিশ্রাম করি।'

দাদারা বললে:

'সে কী রে, ইভান, তোর তো বেশ জানা শোনা হয়ে গেছে, তুই বরং যা।'

'তা বেশ, আমিই যাব।'

রুটি নিয়ে ইভান চলে গেল। ঠিক রাত দুপুরে কবরের মাটিটা দু'ফাঁক হয়ে ইভানের বুড়ো বাবা উঠে এল। জিজ্ঞেস করলে:

'কে ওখানে? আমার ছোট ছেলে ইভান নাকি? বল তো শুনি, রুশদেশের খবর কী? কুকুরেরা কি ডাকছে, নেকড়েরা গজরাচ্ছে, নাকি আমার বাছারা কাঁদছে?'

ইভান জবাব দিলে:

'আমি ইভান, বাবা, তোমার ছেলে; রুশদেশ বেশ শান্তিতেই আছে।'

বাপ তখন পেট ভরে রুটি খেয়ে বললে:

'তুই একমাত্র আমার কথা শুনলি। পর পর তিন রাত্তির আমার কবরে আসতে একটুও ভয় পাস নি। এবার এক কাজ কর, খোলা মাঠে গিয়ে চীৎকার করে ডাকবি: 'সিভ্‌কা-বুর্কা, যাদুকা লেড়কা, চেকনাই ঘোড়া, সামনে এসে দাঁড়া!' ঘোড়াটা তোর সামনে আসবে, তুই ওর ডান কান দিয়ে ঢুকে বাঁ কান দিয়ে বেরিয়ে আসিস। দেখবি তোর রূপ খুলে যাবে। তারপর ঘোড়ায় চেপে যথা ইচ্ছা তথা যাস।'

বুড়ো বাবা ইভানকে একটা লাগাম দিলে। ইভান লাগামটা নিয়ে বাবাকে

ধন্যবাদ দিয়ে পথে পথে ব্যাঙের ছাতা কুড়িয়ে বাড়ী ফিরল। বাড়ী ফিরতেই ভাইয়েরা জিজ্ঞেস করলে:

'কি রে, বাবার সঙ্গে দেখা হল?'

'হল।'

'রুটি খেল?'

'পেট পুরে খেল। বললে কবরে আর আসতে হবে না।'

এদিকে হয়েছে কি, রাজা তখন চারদিকে ঢেঁড়া পিটিয়ে দিয়েছে রাজ্যের যত রূপবান, আইবুড়ো, কুমারদের সব রাজদরবারে উপস্থিত হওয়া চাই। রাজকন্যা লাবণ্যবতীর জন্যে ওক গাছের বারো খুঁটির ওপর, বারো কুঁদো দিয়ে এক কোঠা বানান হয়েছে। সেই কোঠার একেবারে ওপরে রাজকন্যা বসে থাকবে, আর ঘোড়ার পিঠে বসে এক লাফে পৌঁছে যে রাজকন্যার ঠোঁটে চুমু খেতে পারবে, রাজা তাকেই অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা লাবণ্যবতীকে দেবে। তা সে যে ঘরের ছেলেই হোক।

ইভানের ভাইয়েদের কানেও একথা পৌঁছতে দেরি হল না। বললে, 'দেখা যাক ভাগ্য পরীক্ষা করে!'

তেজী ঘোড়াদুটোকে ওরা বেশ করে যবের ছাতু খাওয়াল। তারপর নিজেরা ফিটফাট পোশাক পরে, বাবরি চুলটি আঁচড়ে তৈরী হল। ইভান তখন চিমনির পেছনে চুল্লীর তাকে বসে। বললে:

আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলো না দাদা, আমিও একবার ভাগ্য পরীক্ষা করে আসি!'

'দূর, হতভাগা! তুই বরং বনে ব্যাঙের ছাতা খুঁজে বেড়াগে যা, লোক হাসিয়ে দরকার নেই।'

বড়ো দু'ভাই তেজী ঘোড়ায় চড়ে। টুপি বাঁকিয়ে চাবুকটা চালিয়ে শিস দিতেই একরাশ ধুলোর মেঘ আকাশে। ইভান তখন বাবার দেওয়া লাগামটা নিয়ে চলে গেল খোলা মাঠে। তারপর বাবার কথা মতো ডাকলে:

'সিভ্‌কা-বুর্কা, যাদুকা লেড়কা, চেকনাই ঘোড়া, সামনে এসে দাঁড়া!'

কোত্থেকে কে জানে, ছুটে এল ঘোড়া। তার খুরের দাপে মাটি কাঁপে, নাক দিয়ে আগুন ছোটে, কান দিয়ে ধোঁয়া বেরোয়। মাটিতে পা গেঁথে বলে:

'বলো কী হুকুম!'

ইভান ঘোড়াটার গলা চাপড়ে দিয়ে তাকে লাগাম পরাল, তারপর তার ডান কান দিয়ে উঠে বাঁ কান দিয়ে বেরিয়ে এল। আর কী আশ্চর্য! অমনি সে হয়ে গেল এক সুন্দর তরুণ: কী তার রূপ, সে রূপ বলার নয়, কওয়ার নয়, কলম দিয়ে লেখার নয়। ঘোড়ার পিঠে চড়ে রাজার প্রাসাদের দিকে রওনা হল ইভান। ছুটল ঘোড়া কদমে, কাঁপল মাটি সঘনে, পেরিয়ে গিরি কান্তার, মস্ত সে কি ঝাঁপ তার।

ইভান এসে পৌঁছল রাজদরবারে, চারিদিক লোকে লোকারণ্য। বারো খুঁটির ওপর, বারো কুঁদো দিয়ে এক কোঠা। তার চিলেকোঠায় জানলার পাশে বসে আছে রাজকন্যা লাবণ্যবতী।

রাজা অলিন্দে বেরিয়ে এসে বললে:

'তোমাদের মধ্যে যে তার ঘোড়ার পিঠে চড়ে লাফিয়ে উঠে আমার মেয়ের ঠোঁটে চুমু খেতে পারবে তার সঙ্গেই আমার মেয়ের বিয়ে দেব, আর যৌতুক দেব অর্ধেক রাজত্ব।'

কুমারেরা সবাই তখন এক এক করে এগিয়ে লাফাল, কিন্তু কোথায় কে! জানলার নাগাল কেউ ধরতে পারল না। ইভানের দুই ভাইও চেষ্টা করলে, কিন্তু অর্ধেকটা পর্যন্ত গেল না। এবার এল ইভানের পালা।

সিভ্‌কা-বুর্কাকে সে কদমে ছুটিয়ে হাঁক পেড়ে ডাক ছেড়ে লাফ মারলে। কেবল দুটো কুঁদো বাদে সব কুঁদো সে ছাড়িয়ে গেল। ফের আবার ঘোড়া ছুটাল সে। এবারকার লাফে বাকি রইল একটা কুঁদো। ফের ফিরল ইভান, পাক খাওয়ালে ঘোড়াকে, গরম করে তুললে। তারপর আগুনের হলকার মতো এক প্রচণ্ড লাফে জানলা পেরিয়ে রাজকন্যা লাবণ্যবতীর মধুঢালা ঠোঁটে চুমু খেয়ে গেল ইভান। রাজকন্যাও অমনি তার হাতের আংটি দিয়ে ইভানের কপালে ছাপ এঁকে দিলে।

লোকজনেরা সব 'ধরো ধরো!' করে চেঁচিয়ে উঠল। কিন্তু ইভান ততক্ষণে উধাও।

সিভ্‌কা-বুর্কা ছুটিয়ে ইভান এল সেই খোলা মাঠে। তারপর ঘোড়ার বাঁ কান বেয়ে উঠে ডান কান দিয়ে বেরিয়ে এল। আর অমনি সে ফের হয়ে গেল সেই বোকা ইভান। সিভ্‌কা-বুর্কাকে ছেড়ে দিয়ে সে রওনা হল বাড়ীর দিকে। যেতে

যেতে ব্যাঙের ছাতা কুড়িয়ে নিলে। বাড়ী এসে ন্যাকড়া দিয়ে কপালটা বেঁধে চুল্লীর উপরের তাকে উঠে শুয়ে রইল।

ভাইয়েরাও যথা সময়ে ফিরে এসে বলতে লাগল, কোথায় গিয়েছিল, কী দেখল।

'খাসা খাসা সব জোয়ান, একজন কিন্তু সবার সেরা। ঘোড়ার পিঠে চড়ে এক লাফে উঠে রাজকন্যার ঠোঁটে চুমু খেয়ে গেছে। দেখলাম কোত্থেকে এল, দেখা গেল না কোথায় গেল।'

চিমনির পিছন থেকে ইভান বলে:

'আমি নই ত?'

ওর ভাইয়েরা সে কথা শুনে ভীষণ চটে গেল:

'বাজে বকিস না, হাঁদা কোথাকার! তার চেয়ে চুল্লীর উপর বসে বসে ব্যাঙের ছাতা গেল্।'

ইভান তখন কপালের পটিটা খুলে ফেলল যেখানে রাজকন্যা তাকে মেরেছিল আংটি দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গেই কুঁড়েঘরটা আলোয় আলোয় ভরে গেল। ভাইয়েরা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল:

'কী, করছিস কী, হাঁদা কোথাকার! ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিবি যে!'

পরদিন রাজবাড়ীতে বিরাট ভোজ। পাত্র মিত্র, জমিদার প্রজা, ধনী গরীব, বুড়ো বাচ্চা সকলের নেমন্তন্ন।

ইভানের ভাই দু'জনও ভোজে খেতে যাবে বলে তৈরী। ইভান বললে:

'দাদা, আমাকেও তোমাদের সঙ্গে নিয়ে চলো!'

'কী বললি? তোকে নিয়ে যাব? লোকে হাসবে। তার চেয়ে তুই এখানে চুল্লীর উপরে বসে বসে ব্যাঙের ছাতা গেল্।'

দু'ভাই তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে রাজবাড়ীর দিকে চলে গেল। আর পায়ে হেঁটে ইভান গেল ওদের পেছন পেছন। রাজপ্রাসাদে পেঁৗছে দূরে এককোণে বসে রইল ইভান। রাজকন্যা লাবণ্যবতী তখন নিমন্ত্রিতদের প্রদক্ষিণ করতে শুরু করেছে। হাতে তার মাধবী সুরার পাত্র। তা থেকে সে এক এক জনকে সুরা খেতে দেয় আর দেখে কপালে তার আংটির ছাপ আছে কিনা।

সকলকে প্রদক্ষিণ করে এল রাজকন্যা, বাদ রইল কেবল ইভান। ইভানের দিকে

রাজকন্যা যত এগোয় তত তার বুক দুরদুর করে। ইভানের সারা গায়ে কালি, মাথায় খোঁচা খোঁচা চুল। রাজকন্যা লাবণ্যবতী জিজ্ঞেস করে:

'কে তুমি? কোথা থেকে এসেছো? কপালে তোমার ঐ পটি বাঁধা কেন?'

ইভান বলে, 'পড়ে গিয়ে কেটে গেছে।'

রাজকন্যা পটি খুলে ফেলতেই সারা রাজপ্রাসাদ আলোয় আলোয় ভরে গেল। রাজকন্যা চেঁচিয়ে উঠল:

'এ তো আমারই ছাপ! একেই তো আমি বরণ করেছি!'

রাজামশাই কাছে এসে বলে:

'কী যত বাজে কথা, এ যে একেবারে কালিঝুলি মাখা এক হাঁদা!'

ইভান রাজাকে বলে:

'রাজামশাই, অনুমতি দিন একবার মুখ ধুয়ে আসি।'

রাজামশাই অনুমতি দিলে। ইভান উঠোনে গিয়ে বাবার কথা মতো হাঁক দিল:

'সিভ্‌কা-বুর্কা, যাদুকা লেড়কা, চেকনাই ঘোড়া, সামনে এসে দাঁড়া!'

অমনি কোত্থেকে কে জানে, ছুটে এল ঘোড়া। তার খুরের দাপে মাটি কাঁপে, নাক দিয়ে আগুন ছোটে, কান দিয়ে ধোঁয়া বেরোয়। ইভান তার ডান কান দিয়ে ঢুকে বাঁ কান দিয়ে বেরিয়ে এল, আর অমনি সে হয়ে গেল সেই রূপবান তরুণ — সে রূপ বলার নয়, কওয়ার নয়, কলম দিয়ে লেখার নয়। সব লোকে একেবারে আহামরি করে উঠল।

অমনি সব কথা মিটে গেল, বিয়ের ভোজ চলল ধুমধাম করে।

চাষীর ছেলে ইভান আর আজব দানব

(রুশী রূপকথা)





সে এক রাজ্যে, সে এক দেশে ছিল দুই বুড়োবুড়ি, তাদের তিন ছেলে। ছোটো ছেলেটির নাম ইভান। দিন কাটাত খেটেখুটে: সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কেবল একাজ, সেকাজ: লাঙল দিত, বীজ বুনত।

হঠাৎ সেই সে রাজ্যে সেই সে দেশে শোনা গেল এক দুঃসংবাদ: আজব দানব ঠিক করেছে হামলা করবে তাদের দেশে, লোকজনকে মারবে, গ্রাম-নগর ছারখার করবে। বুড়োবুড়ি হায় হায় করতে লাগল। তখন বড়ো দুই ছেলে তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বললে:

'দুঃখ কোরো না, মা বাবা। আমরা চললাম আজব দানবের কাছে, লড়াই করে মারব ওকে। ইভান রইল তোমাদের কাছে, একা একা লাগবে না। ও এখনো ছোটো, লড়াইয়ে যাবার বয়স হয় নি।'

ইভান বললে, 'না, তোমাদের পথ চেয়ে ঘরে বসে থাকতে চাই না। আজব দানবের সঙ্গে আমিও যাব লড়তে।'

বুড়োবুড়ি সাধ্য সাধনা করে ওকে ধরে রাখার চেষ্টা করলে না।

যাত্রার জন্যে তিন ছেলেকেই সাজিয়ে দিলে তারা। তিন ভাই নিলে তাদের কাঠের ভারি ভারি লাঠি, থলে ভরে নিলে নুন আর রুটি, তারপর ঘোড়ায় চেপে রওনা দিলে।

অল্প পথ নাকি দূর পথ, কত দূরে পাড়ি দিল কে জানে। দেখা হল এক বুড়োর সঙ্গে:

'কুশল হোক বাছা, ভালো মানুষেরা!'

'কুশল হোক, দাদু!'

'তা তোরা চললি কোথায়?'

'চলেছি রাক্ষস আজব দানবের সঙ্গে লড়তে, যুঝতে, দেশের মাটি রুখতে!'

'সাধু! সাধু! তবে লড়তে গেলে লাঠি নয়, চাই দামাস্কাস ইস্পাতের তরোয়াল।'

'তা পাই কোথায়, দাদু?'

'তবে বলি শোন; একেবারে নাক বরাবর চলে যাও বাছা, ভালো মানুষেরা। চলে যাবে এক উঁচু পাহাড় পর্যন্ত। সেই পাহাড়ে আছে এক গভীর গুহা। মস্ত এক পাথর দিয়ে তার মুখ আটকানো। পাথর ঠেলে গুহায় ঢুকলেই দেখবে দামাস্কাস ইস্পাতের তরোয়াল।'

বুড়োকে ধন্যবাদ দিয়ে তিন ভাই ওর কথা মতো চলল সিধে পথ ধরে। দেখল দাঁড়িয়ে আছে এক মস্ত পাহাড়, তার এক পাশে মস্ত এক ছাইরঙা পাথর দিয়ে মুখ আটকানো। তিন ভাই পাথর ঠেলে সরিয়ে ঢুকল গুহার মধ্যে। নানা রকম অস্ত্রের সেখানে ছড়াছড়ি, গুনে শেষ করা যায় না! এক এক ভাই এক একটি তরোয়াল বেছে নিয়ে চলল এগিয়ে।

বলল, 'পথের বুড়োটাকে ধন্যবাদ। তরোয়াল নিয়ে যুদ্ধ করা অনেক সহজ!'

চলতে চলতে গিয়ে পেঁাছল এক গ্রামে। চারিদিকে চেয়ে দেখল একটি জনপ্রাণী নেই। সবই জ্বালাপোড়া, ছারখার। টিকে আছে কেবল একটি ছোট্ট কুটির। কুটিরের মধ্যে ঢুকল তিন ভাই। দেখে চুল্লির ওপর শুয়ে আছে এক বুড়ি, কোঁকাচ্ছে।

'নমস্কার, দিদিমা!' বললে তিন ভাই।

'নমস্কার, বাছারা! চলেছ কোথায়?'

'চলেছি স্মরোদিনা নদীর কালিনা সাঁকোয়। আজব দানবের সঙ্গে লড়ব। দেশের মাটি রুখব।'

'সাধু, সাধু সংকল্প করেছিস বাছারা! সবকিছু ছারখার করছে পিশাচটা! আমাদের গাঁয়েও এসেছিল, বেঁচে আছি কেবল আমি একলা...'

বুড়ির ঘরে রাত কাটালে তিন ভাই, তারপর ভোর ভোর উঠে রওনা দিলে।

এল সেই স্মরোদিনা নদীর কালিনা সাঁকোয়। সারা তীর ছড়িয়ে আছে ভাঙা ধনুক, ভাঙা তরোয়াল, পড়ে আছে মানুষের হাড়...

একটা ফাঁকা ঘর খুঁজে তিন ভাই ঠিক করলে সেখানেই থাকবে।

ইভান বললে, 'কিন্তু ভাই, আমরা এসে পড়েছি বিদেশ বিভুঁইয়ে। তাই চোখ কান মেলে রাখতে হবে। এসো আমরা পালা করে পাহারা দিই, কালিনা সাঁকো দিয়ে আজব দানব যেন না এসে পড়ে।'

প্রথম রাত্রিতে পাহারায় রইল বড়ো ভাই। তীরে গিয়ে তাকিয়ে দেখল স্মরোদিনা নদীতে সব চুপচাপ; কাউকে দেখা যায় না, কিছু শোনা যায় না। একটা ঝোপের ধারে শুয়ে পড়ল বড়ো ভাই, অঘোরে ঘুমল, সজোরে নাক ডাকাল।

এদিকে ঘরের মধ্যে শুয়ে আছে ইভান, ঘুম তার আসে না, চোখের পাতা বোজে না। রাত দু'পহর পেরতেই সে দামাস্কাস ইস্পাতের তরোয়াল নিয়ে চলল স্মরোদিনা নদীতে।

দেখে কি, ঝোপের ধারে ঘুমুচ্ছে বড়ো ভাই, দিব্যি নাক ডাকাচ্ছে। ইভান কিন্তু ভাইকে জাগাল না, কালিনা সাঁকোর নিচে গিয়ে লুকিয়ে রইল, চোখ রাখল পথটার ওপর।

হঠাৎ ফুঁসে উঠল নদীর জল, ওক গাছে চেঁচিয়ে উঠল ঈগল — এগিয়ে এল

ছয়মুণ্ডু আজব দানব। কালিনা সাঁকোর মাঝামাঝি এসেছে, এমন সময় হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার ঘোড়া, কাঁধের ওপরকার দাঁড়কাকটা ডানা ঝটপট করতে লাগল, আর পেছন পেছন আসা কালো কুকুরটা শিউরে উঠল।

ছয়মুণ্ডু আজব দানব বললে:

'সে কী, কেন হুমড়ি খেয়ে পড়লি, আমার ঘোড়া? কেন ঝটপটিয়ে উঠলি তুই, কালো দাঁড়কাক? কেন শিউরে উঠলি তুই, কেলে কুকুর? নাকি তোরা টের পেয়েছিস যে চাষীর ছেলে ইভান এসে হাজির হয়েছে এখানে? কিন্তু তার তো জন্মই হয় নি এখনো, জন্মে থাকলেও লড়বার যুগ্যি হয় নি। এক হাতে তুলে ধরে অন্য হাতে চাপড়েই শেষ করে দেব!'

চাষীর ছেলে ইভান তখন সাঁকোর তল থেকে বেরিয়ে এসে বললে:

'বড়াই রাখ তুই পাষণ্ড, আজব দানব! ঝলমলে বাজ পাখিটাকে না মেরেই তার পালক ছাড়াতে চাস। ভালো মানুষের পো'কে না চিনেই গালমন্দ করতে আসিস না! বরং আয়, শক্তি পরীক্ষা হোক: যে জিতবে, বড়াই করবে সে।'

তাই ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা, তরোয়ালে তরোয়ালে ঠোকাঠুকি হল, এমন জোরে ঘা পড়ল যে চারিদিকের মাটি কেঁপে উঠল।

কিন্তু আজব দানবের কপাল মন্দ: এক ঘায়েই তার তিনটি মাথা কেটে ফেলল চাষীর ছেলে ইভান।

আজব দানব চেঁচিয়ে বললে, 'দাঁড়া বাপু চাষীর ছেলে ইভান! আমায় একটু দম নিতে দে!'

'এখনি দম নেবার কী হল, আজব দানব! তোর তিনটে মাথা, আমার একটা। তোর যখন কেবল একটা মাথা থাকবে, তখন জিরিয়ে নেওয়া যাবে।'

ফের ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা, ফের ঘা মারল।

আজব দানবের শেষ তিনটে মাথাও কেটে ফেলল চাষীর ছেলে ইভান। তারপর তার লাশটা কেটে টুকরো টুকরো করে স্মরোদিনা নদীতে ফেলে দিল, আর মাথা ছ'টা রাখল কালিনা সাঁকোর নিচে। তারপর ঘরে ফিরে শুয়ে ঘুমতে গেল।

সকালে ফিরে এল বড়ো ভাই। ইভান তাকে জিজ্ঞেস করলে:

'কিছুই চোখে পড়ে নি কাল?'

'ভাই, ধারেকাছে একটি মাছিও আসে নি!'

জবাবে একটি কথাও তাকে বললে না ইভান।

পরের দিন পাহারায় গেল মেজো ভাই। এদিকে গেল ওদিকে গেল, চারিপাশ দেখে নিশ্চিন্ত হল। তারপর ঝোপের ধারে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

তার ওপরও ভরসা করল না ইভান। রাত দু'পহর হতেই সে সাজসজ্জা শুরু করলে, ধারালো তরোয়ালটি নিয়ে চলে গেল স্মরোদিনা নদীতে। কালিনা সাঁকোর নিচে লুকিয়ে পাহারা দিতে লাগল।

হঠাৎ ফুঁসে উঠল নদীর জল, ওক গাছে চেঁচিয়ে উঠল ঈগল পাখি — এগিয়ে আসছে নয়মুণ্ডু আজব দানব। কালিনা সাঁকোর ওপর আসতেই ঘোড়াটা তার হুমড়ি খেয়ে পড়ল, ঝটপটিয়ে উঠল কাঁধের কালো দাঁড়কাক, শিউরে উঠল পেছনের কেলে কুকুরটা... আজব দানবের চাবুক পড়ল ঘোড়ার গায়ে, কাকের পালকে, কুকুরের কানে।

'এ কী, হুমড়ি খেলি কেন আমার ঘোড়া? ঝটপটিয়ে উঠলি কেন কালো দাঁড়কাক? শিউরে উঠলি কেন কেলে কুকুর? নাকি তোরা ভেবেছিস, চাষীর ছেলে ইভান এসে হাজির হয়েছে এখানে? ওর তো এখনো জন্মই হয় নি, জন্মালেও লড়বার যুগ্যি হয় নি: ওকে আমি এক আঙুলেই খতম করে দেব!'

কালিনা সাঁকোর তল থেকে বেরিয়ে এল চাষীর ছেলে ইভান:

'দাঁড়া রে আজব দানব, বড়াই করতে যাস না! কাজে নাম আগে। দেখব কে জেতে।'

দামাস্কাস তরোয়ালের একে একে দুই কোপেই ছয়টি মুণ্ডু খসে গেল আজব দানবের আর আজব দানবের ঘা খেয়ে ভেজা মাটিতে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল ইভান। চাষীর ছেলে ইভান তখন এক মুঠো বালি নিয়ে ছুঁড়ে মারলে সোজাসুজি আজব দানবের চোখে। আজব দানব চোখ মোছে আর মোছে ওদিকে ইভান তার বাকি মুণ্ডুগুলো কেটে ফেলল। তারপর তার লাশটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ছুঁড়ে ফেলল স্মরোদিনা নদীতে, আর ন'টা মুণ্ডু রাখলে কালিনা সাঁকোর তলায়। নিজে সে ফিরে গেল কুটিরে। শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল, যেন কিছুই হয় নি।

সকালে ফিরে এল মেজো ভাই।

ইভান বললে, 'তা রাত্রে কিছু চোখে পড়েছিল ভাই?'

'না তো। একটি মাছিকেও উড়তে দেখি নি, একটি মশাও গুন গুন করে নি।'

'বটে, তাহলে এসো আমার সঙ্গে, মশা মাছি দেখিয়ে দিই।'

ভাইদের নিয়ে ইভান গেল কালিনা সাঁকোর নিচে; আজব দানবের মাথাগুলো দেখালে।

বললে, 'দেখো কেমন মশা মাছি এখানে। তোমাদের বাপু ঘরে গিয়ে চুল্লির গরমে শুয়ে থাকাই ভালো, যুদ্ধ তোমাদের কম্ম নয়!'

লজ্জা হল ভাইদের।

বললে, 'ঘুম এসে গিয়েছিল চোখে...'

তৃতীয় রাতে পাহারায় যাবার পালা ইভানের।

বললে, 'ভয়ংকর লড়াইয়ে চললাম আমি; তোমরা ভাই সারা রাত ঘুমিয়ো না, কান পেতে রেখো। যেই আমার শিস শুনবে, অমনি আমার ঘোড়াটাকে ছেড়ে দেবে আর নিজেরা আসবে সাহায্যে।'

চাষীর ছেলে ইভান গেল স্মরোদিনা নদীর কাছে, অপেক্ষা করে রইল কালিনা সাঁকোর নিচে।

মাঝ রাত পেরতেই দুলে উঠল ভেজা মাটি, ফুঁসে উঠল নদীর জল, পাক দিয়ে উঠল বাতাস, ওক গাছে চেঁচিয়ে উঠল ঈগল। এবার আসছে দ্বাদশ মুণ্ডু আজব দানব। বারো মুণ্ডেই শিস দিচ্ছে, বারো মুখে আগুনের হলকা। আজব দানবের যে ঘোড়া তার বারোটি পাখা, তামার লোম, লোহার লেজ, লোহার কেশর। কালিনা সাঁকোর ওপর আসতেই ঘোড়া তার হুমড়ি খেয়ে পড়ল, ঝটপটিয়ে উঠল কাঁধের দাঁড়কাক, শিউরে উঠল পেছনকার কালো কুকুর। ঘোড়ার গায়ে, দাঁড়কাকের পালকে, কুকুরের কানের ওপর চাবুক মারলে আজব দানব।

'কেন হুমড়ি খেয়ে পড়লি তুই, আমার ঘোড়া? কী দেখে ঝটপটিয়ে উঠলি দাঁড়কাক, কী জন্যে শিউরে উঠলি কেলে কুকুর? নাকি তোরা টের পেয়েছিস চাষীর ছেলে ইভান এসেছে এখানে? তার তো জন্মই হয় নি, আর জন্ম যদি বা হয়ে থাকে, লড়ার যুগ্যি হয় নি। একবার নিঃশ্বাস ফেললেই ছাইটুকুও আর পড়ে থাকবে না!'

কালিনা সাঁকোর তল থেকে তখন বেরিয়ে এল চাষীর ছেলে ইভান।

'দাঁড়া রে আজব দানব, বড়াই করিস না, সেধে নিজের মান খোয়াস না।'

'আরে তুই, চাষীর ছেলে ইভান না কি? এখানে এসেছিল যে বড়ো?'

'এসেছি রাক্ষস তোর শক্তি দেখতে, সাহসের পরখ নিতে!'

'সাহসের পরখ নিবি আমার! আমার কাছে তো তুই একটা মাছি!'

আজব দানবকে বললে চাষীর ছেলে ইভান:

'বাজে কথা শুনতে আসি নি, শোনাতে আসি নি। এসেছি মৃত্যুপণ লড়াইয়ে, দুরাত্মা তুই, তোর কবল থেকে ভালো মানুষদের বাঁচাতে!'

ইভান তার তরোয়ালের এক কোপে তিনটে মাথা কেটে ফেলল আজব দানবের। আজব দানব কিন্তু সে মাথা লুফে নিয়ে তার আগুনে-আঙুল বুলিয়ে বসিয়ে দিল কাঁধে, সঙ্গে সঙ্গে তিনটে মাথাই জুড়ে গেল, যেন কিছুই হয় নি।

ইভানের হাল হল কাহিল: আজব দানবের শিসে ওর কানে তালা ধরে, আগুনে ছ্যাঁকা লাগে, ফুলকিতে গা জ্বলে যায়, সোঁদা মাটিতে ডুবে যায় হাঁটু পর্যন্ত ... আজব দানব উপহাস করে বলে:

'একটু জিরিয়ে নিবি নাকি, চাষীর ছেলে ইভান?'

'জিরব কী? লড়ো, মারো, নিজের কথা ভাবলে কি চলে? — এই আমাদের রীতি!'

শিস দিল ইভান, ভাইয়েরা অপেক্ষা করে আছে কুটিরে, সেই কুটিরে ছুড়ে মারল তার ডান হাতের দস্তানা। তাতে জানলার কাচ সব ভেঙে পড়ল, কিন্তু ভাইয়েরা ঘুমে অচেতন, কিছুই কানে যায় না।

সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে ইভান ফের আর এক কোপ বসাল; এটা আগের চেয়েও জোরে — ছয় মুণ্ডু কেটে ফেলল আজব দানবের। আজব দানব মুণ্ডুগুলোকে লুফে নিয়ে আগুনে-আঙুল বুলিয়ে বসিয়ে দিল ঘাড়ে — সবই আবার যে-কে সেই। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে ইভানের ওপর, ভেজা মাটিতে কোমর পর্যন্ত গেড়ে গেল ইভান।

ইভান দেখে, অবস্থা খারাপ। বাঁ হাতের দস্তানা খুলে ছুড়ে মারলে কুটিরের

দিকে। দস্তানার ঘায়ে ভেঙে পড়ল কুঁড়ের ছাদ কিন্তু ভাইয়েদের ঘুম আর ভাঙে না, কোনো কিছু কানে যায় না।

তৃতীয় বার কোপ বসালে চাষীর ছেলে ইভান — নয়টা মুণ্ডু কেটে ফেললে আজব দানবের। আজব দানব সব মুণ্ডু লুফে নিয়ে আগুনে-আঙ্গুল বুলিয়ে ফের বসিয়ে দিলে ঘাড়ে। মাথা জুড়ে গেল আবার। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ইভানের ওপর, ভেজা মাটিতে কাঁধ পর্যন্ত গেড়ে গেল ইভান...

মাথার টুপি খুলে তখন ছুড়ে মারলে ইভান। সে আঘাতে থরথরিয়ে কেঁপে উঠল কুঁড়ে; দেয়াল ভেঙে পড়ে আর কি! তখন ঘুম ভাঙল ভাইয়েদের, শোনে — ইভানের ঘোড়া ডাক ছাড়ছে, কড়মড়িয়ে কামড় দিচ্ছে শেকলে।

ছুটে গিয়ে ঘোড়া খুলে দিলে তারা, নিজেরা এল পেছন পেছন।

ইভানের ঘোড়া ছুটে এসে চাঁট মারতে লাগল আজব দানবকে। শিস দিল আজব দানব, হিসিয়ে উঠল, ফুলকি ছড়াতে লাগল ঘোড়ার গায়ে।

আর সেই অবসরে মাটি থেকে উঠে এল চাষীর ছেলে ইভান, কেটে ফেললে আজব দানবের আগুনে-আঙুল। তারপর লাগাও কোপ মাথায়! একটি মাথাও বাকি রইল না। লাশটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে দিল স্মরোদিনা নদীতে।

ততক্ষণে ছুটে এসেছে ভাইয়েরা।

ইভান বললে, 'ছি! ছি! তোদের ঘুমের জন্যে আমার মাথাটি খোয়াতে বসেছিলাম!'

ভাইয়েরা তাকে নিয়ে এল কুটিরে, ধোয়ালে মোছালে, বিছানায় শুইয়ে দিলে।

রাত ভোর হতেই সাজসজ্জা শুরু করলে ইভান।

'সাত সকালে চললি কোথায়?' ভাইয়েরা বললে, 'অমন লড়াইয়ের পর একটু গড়িয়ে নে।'

ইভান বলে, 'না, গড়িয়ে নেবার সময় নেই আমার: স্মরোদিনা নদীতে চললাম, কোমরবন্ধটা হারিয়ে বসেছি, খুঁজে দেখি গে।'

'কী দরকার!' ভাইয়েরা বলে, 'শহরে যাব, নতুন কিনে নিস।'

'উহুঁ, আমার নিজেরটাই আমার চাই!'

ইভান গেল স্মরোদিনা নদীতে, কিন্তু কোমরবন্ধ না খুঁজে কালিনা সাঁকো বেয়ে

চলে গেল অপর পারে; চুপি চুপি গিয়ে হাজির হল আজব দানবের পাষাণ পুরীতে। খোলা জানলার কাছে গিয়ে কান পাতল: কেউ এখানে ফন্দি-ফিকির আঁটছে না তো?

দেখে কি — বসে আছে আজব দানবের তিন বৌ আর মা, বুড়ি নাগিনী। বসে বসে আলাপ করছে।

প্রথম বৌ বলে:

'আমার স্বামীর হয়ে প্রতিশোধ নেব চাষীর ছেলে ইভানের ওপর। ইভান আর তার ভাইয়েরা যখন বাড়ি ফিরবে, তখন ওদের আগে আগে ছুটে যাব আমি, গরম ছাড়ব চারিদিকে আর নিজে একটা কুয়োর রূপ ধরব। জল খেতে চাইবে ওরা আর প্রথম ঢোকেই মরণে ঢলে পড়বে।'

'এটা বেশ ফন্দি করেছিস তুই!' বলে বুড়ি নাগিনী।

দ্বিতীয় বৌ বলে:

'আর আমি আগে আগে গিয়ে একটা আপেল গাছের রূপ ধরব। এক একটা করে আপেল খাবে আর অমনি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে সবাই।'

'এটা বেশ ফন্দি করেছিস তুই!' বলে বুড়ি নাগিনী।

তৃতীয় বৌ বলে:

'আর আমি ওদের ওপর ঘুম আর ঢুলুনি ছেড়ে দেব, নিজে এগিয়ে গিয়ে হয়ে দাঁড়াব একটা তুলতুলে গালিচা, তাতে রেশমী বালিশ। একটু শুয়ে গড়িয়ে নেবার ইচ্ছে হবে ভাইয়েদের — অমনি পুড়ে মরবে আগুনে।'

'এটা বেশ ফন্দি করেছিস তুই!' বললে নাগিনী, 'আর তোরা যদি ওদের মারতে না পারিস তাহলে আমি নিজে হব একটা মস্ত শুয়োর, তেড়ে গিয়ে ওদের সবকটাকে গিলে খাব।'

এই সব কথা শুনেটুনে ভাইয়েদের কাছে ফিরে এল চাষীর ছেলে ইভান।

ভাইয়েরা জিজ্ঞেস করে, 'কী রে, পেলি তোর কোমরবন্ধ?'

'পেয়েছি।'

'তার জন্যে এত সময় নষ্ট করা সাজে?'

'সাজে বৈকি!'

তারপর গোছগাছ করে সবাই রওনা দিল বাড়ির দিকে।

চলল তারা তেপান্তর পেরিয়ে, চলল ডাঙা পেরিয়ে। গরমে প্রাণ আই-ঢাই। ভয়ানক তেষ্টা — ধৈর্য আর ধরে না! হঠাৎ ভাইয়েরা দেখে কি — এক কুয়ো। কুয়োর জলে ভাসছে রুপোর কলস। ইভানকে তারা বললে:

'আয় ভাই, একটু থামি। ঠান্ডা জল নিজেরা খাব, ঘোড়াকে খাওয়াব।'

'কে জানে এ কুয়োর জল কী রকম,' ইভান বললে, 'হয়ত বা পচা, নোংরা।'

ঘোড়া থেকে নেমে সে তরোয়াল দিয়ে ছিন্নভিন্ন করতে লাগল কুয়োটাকে। গাঁঙিয়ে উঠল কুয়ো, ককিয়ে উঠল আর্তনাদ করে... অমনি কুয়াসা নেমে এল, গরম কেটে গেল, তেষ্টা আর পেল না।

ইভান বললে, 'দেখলে তো কুয়োর জল কেমন?'

আরো এগিয়ে গেল ওরা।

গেল অনেক পথ, নাকি অল্প পথ, কে জানে। দেখে কি — এক আপেল গাছ। তাতে বড়ো বড়ো লাল লাল আপেল।

ঘোড়া থেকে নেমে ছুটে গেল ভাইয়েরা, ভেবেছিল আপেল পেড়ে খাবে। ইভান কিন্তু আগে আগে ছুটে গিয়ে এক ঘা! আপেল গাছের শিকড় সমেত কেটে ফেললে। গাঁঙিয়ে উঠল আপেল গাছ, ককিয়ে উঠল...

'দেখলে তো ভাইয়েরা, কেমন আপেল গাছ? এ আপেল বড়োই কটু!'

ঘোড়ায় উঠে ফের এগিয়ে চলল তিন ভাই।

যায়, যায়, আর ভয়ানক ক্লান্তি লাগে। দেখে কি — মাঠের মধ্যে পাতা আছে এক রঙীন তুলতুলে গালিচা, তার ওপর পালকের সব বালিশ।

ভাইয়েরা বলে, 'চল একটু গড়িয়ে নিই গালিচায়, কয়েক দণ্ড ঘুমিয়ে নিই!'

'না ভাই, এ গালিচা শোবার মতো নরম নয়,' উত্তর দিলে ইভান।

ভাইয়েরা চটে উঠল:

'খুব যে শেখাতে এসেছিস আমাদের, এটা চলবে না, সেটা চলবে না!'

জবাবে একটি কথাও বললে না ইভান। নিজের কটিবন্ধটা খুলে সে ছুড়ে দিল গালিচায়। কটিবন্ধটা দপ করে জ্বলে উঠে ছাই হয়ে গেল।

'তোমাদেরও ঐ দশা হত,' ভাইয়েদের বললে ইভান।

তারপর গালিচার কাছে গিয়ে, মারো বাড়ি তরোয়াল দিয়ে! গালিচা বালিশ কেটে কুচিকুচি করে ঠেলে দিয়ে ইভান বললে:

'খামোকা আমায় বকাবকি করলে, ভাইয়েরা! কুয়ো, আর আপেল, আর গালিচা — এ সবই যে হল আজব দানবের বউ। ভেবেছিল আমাদের মারবে, কিন্তু হল না, মরল নিজেরাই।'

আরো এগিয়ে গেল ভাইয়েরা।

গেল অল্প পথ নাকি অনেক পথ কে জানে; হঠাৎ আঁধার হয়ে এল আকাশ, গাঙিয়ে উঠল বাতাস, গুরু গুরু করে উঠল মাটি। ওদের দিকে ধেয়ে এল মস্ত এক শুয়োর। আকর্ণ মুখ হাঁ করল সে — গিলে খায় আর কি ইভান আর তার ভাইয়েদের! কিন্তু সাবাস! বুদ্ধি আছে বটে! থলে থেকে সের কয়েক করে পথখোরাকী নুন বার করে তারা ছুড়ে মারল শুয়োরের হাঁয়ের মধ্যে।

শুয়োরের আনন্দ আর ধরে না, ভাবল চাষীর ছেলে ইভান আর তার ভাইয়েদের ধরে ফেলেছে। তাই দৌড় থামিয়ে সে নুন চিবতে লাগল। কিন্তু যেই বুঝল নুন, অমনি ফের ছুটে গেল তাড়া করে।

ছুটছে শুয়োর, খাড়া হয়ে উঠেছে লোম, কড়মড় করছে দাঁত। এই বুঝি ধরে ধরে...

অমনি ইভান বললে, তিন ভাই তিনদিকে চলে যাক: একজন ছুটল ডাইনে, একজন বাঁয়ে আর ইভান নিজে — সামনে।

ছুটতে গিয়ে থেমে গেল শুয়োর — বুঝতে পারল না কাকে আগে ধরবে।

ও যতক্ষণ ভাবছে আর চারদিকে মাথা ঘোরাচ্ছে, ততক্ষণে ইভান তার দিকে ধেয়ে এসে প্রাণপণে তাকে শূন্যে তুলে ধরে এক আছাড়। শুয়োর হয়ে গেল ধুলো, আর সে ধুলো উড়ে গেল বাতাসে।

সেই থেকে সে দেশে আর কখনো কোনো আজব দানব কি নাগিনী দেখা যায় নি — নির্ভয়ে দিন কাটাতে শুরু করে লোকেরা।

আর চাষীর ছেলে ইভান তার ভাইয়েদের সঙ্গে ফিরে এল ঘরে, এল বাপের কাছে, মায়ের কাছে। সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটে তাদের, হাল দেয়, লাঙল দেয়, বীজ বোনে, ফসল তোলে।

কাজীর বিচার

(রুশী কাহিনী)



দুই ভাই। এক ভাই গরিব, আর এক ভাই ধনী। গরিব ভাইয়ের বাড়িতে কাঠ নেই। কী দিয়ে চুল্লি ধরাবে? কুঁড়েঘরটা ঠান্ডায় জমে আছে।

বনে গিয়ে কাঠ কাটে, কিন্তু ঘোড়া নেই। কাঠ বইবে কিসে?

'ভাইয়ের কাছে গিয়ে তার ঘোড়াটা চাইব।'

ধনী ভাই কিন্তু মুখ ব্যাজার করলে।

'ঘোড়া নিবি নে, কিন্তু দেখিস, বেশি বোঝা চাপাস নে। আর ফের কখনো আমার কাছে আসিস না; আজ এটা দে, কাল ওটা দে, শেষ কালে আমাকেই ভিক্ষেয় বেরতে হবে আর কি!'

গরিব ভাই ঘোড়া নিয়ে বাড়ি এল। মনে পড়ল:

'যাঃ আমার যে জোয়াল নেই! ওই সঙ্গে চাই নি, এখন গিয়ে ফল নেই — ভাই তা দেবে না।'

ভাইয়ের ঘোড়ার লেজের সঙ্গে কোনো রকমে স্লেজটা জুতে ও রওনা দিলে।

ফেরার পথে স্লেজটা আটকে গিয়েছিল একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে। গরিব ভাই খেয়াল না করে চাবুক হাঁকাল।

ঘোড়াটা ছিল খুব খ্যাপা, তীর বেগে ছুটতেই তার লেজটি খসে গেল।

ধনী ভাই যখন দেখলে তার ঘোড়ার লেজ নেই তখন ধমকাধমকি, গালমন্দ করতে লাগল:

'ঘোড়াটাকে আমার শেষ করে দিয়েছিস! আমি এর ফয়সালা না করে ছাড়ছি না!'

মামলা ঠুকলে গরিব ভাইয়ের নামে।

দিন যায়, আদালত থেকে ডাক পড়ল দুই ভাইয়ের।

দুই ভাই চলে আর চলে। গরিব ভাই ভাবে:

'নিজে কখনো আদালতে যাই নি কিন্তু কথায় আছে: সবলের মার নেই, ধনীর বিচার নেই। আমার বিরুদ্ধেই রায় দেবে।'

যাচ্ছিল ওরা সাঁকোর ওপর দিয়ে। সাঁকোর বেড়া ছিল না। পা পিছলে গরিব পড়ে গেল নিচে। ঠিক সেই সময় জমাট নদীর বরফের ওপর দিয়ে স্লেজ চালিয়ে বুড়ো বাপকে বদ্যির কাছে নিয়ে যাচ্ছিল এক সওদাগর।

গরিব পড়বি তো পড় একেবারে স্লেজের মধ্যেই; ফলে সওদাগরের বুড়ো বাপটি মারা পড়ল আর গরিব ভাইটি নিজে কিন্তু অক্ষত দেহেই বেঁচে রইল।

সওদাগর জাপটে ধরল গরিবটিকে।

'চল আদালতে!'

শহরে এল তিন জনাই: গরিব ভাই, ধনী ভাই আর সওদাগর।

গরিব ভাইয়ের দুঃখ আর ধরে না।

'এবার আমায় নিশ্চয়ই শাস্তি দেবে।'

সেই সময় তার চোখে পড়ল রাস্তার ধারে বড়ো মতো একটা পাথর। পাথরটি নিয়ে সে ন্যাকড়ায় জড়িয়ে রেখে দিল কোর্তার ভেতরে।

'সাত চড়ের এক ঘা — আমায় যদি শাস্তি দেয় তো বিচারককেই খুন করব।'

আদালতে এল সবাই। আগের মামলার সঙ্গে জুটল নতুন মামলা। বিচার শুরু করল বিচারক, জেরা করতে লাগল।

গরিব ভাই ওদিকে বিচারকের পানে তাকায় আর কোর্তার ভেতর থেকে ন্যাকড়া মোড়া পাথরটা বার করে ফিসফিসিয়ে বলে:

'বিচার করো বাপু, আর এদিক পানে একটু চেয়ো।'

একবার দুবার তিনবার। দেখেশুনে বিচারক ভাবলে: 'চাষীটা আমায় এক তাল সোনা দেখাচ্ছে না তো?'

ফের একবার তাকিয়ে দেখলে — জিনিসটা বড়ো সড়োই।

'নয় রুপোই হল, তাতেও অনেক টাকা।'

রায় দিলে: বেঁড়ে ঘোড়াটার যতদিন না লেজ গজাচ্ছে ততদিন তা গরিব ভাইয়ের কাছেই থাকবে।

সওদাগরকে বললে:

'এ লোকটা যখন তোমার বাপকে পিষে মেরে ফেলেছে তখন এবার গিয়ে ঐ সাঁকোর নিচে বরফের ওপর দাঁড়িয়ে থাক, আর তুমি সাঁকো থেকে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে পিষে মেরে ফেলো।'

এই করেই বিচার শেষ হল।

ধনী ভাই তখন বলে:

'যাক গে, লেজ দরকার নেই; বেঁড়ে ঘোড়াই আমায় ফেরত দে।'

গরিব বলে, 'সে কী ভাই! বিচারক যা বলেছে তাই হবে। লেজ গজানো পর্যন্ত ওটা আমার কাছেই থাকবে।'

তখন কাকুতি-মিনতি করতে হল ধনী ভাইকে।

'তিরিশ রুব্‌ল দিচ্ছি তোকে, ঘোড়াটা ফেরত দে।'

'বেশ, তাই সই। দাও টাকা।'

তিরিশটি টাকা গুণে দিয়ে মিটমাট করে নিল ধনী ভাই।

এবার সওদাগর মিনতি করলে:

'বলি শোন, চাষী, তোর দোষ আমি তোকে মাফ করে দিলাম। মরা বাপ তো আর ফিরছে না।'

'উহ্ু, সেটি হবে না। বিচারক যখন রায় দিয়েছে তখন চলো যাই, সাঁকোর ওপর থেকে তুমি লাফিয়ে পড়বে আমার ওপর।'

'মারতে চাই না তোকে, আয় মিটমাট করে নে আমার সঙ্গে, একশ' রুবল দেব তোকে,' বলে সওদাগর।

সওদাগরের কাছ থেকে একশ' টাকা পেল গরিব ভাই। চলে যাবে এমন সময় কাছে ডাকল বিচারক:

'এবার আমায় যা দেবে বলেছিলে দাও।'

কোর্তার তল থেকে পুঁটলিটা বার করলে গরিব ভাই, মোড়ক খুলে দেখালে পাথরটাকে।

'এইটে দেখিয়ে তোমায় বলেছিলাম: 'বিচার করো বাপু, আর এদিক পানে একটু চেয়ো।' আমায় শাস্তি দিলেই তোমায় আমি খুন করতাম।'

বিচারক ভাবলে: 'ভাগ্যিস এই চাষীটার পক্ষে রায় দিয়েছি, নইলে তো প্রাণেই বাঁচতাম না।'

গরিব ভাই তখন মহানন্দে গান গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরল।

মটর-গড়গড়ি

(উক্রাইনী রূপকথা)



এক লোকের ছয় ছেলে, একটি মেয়ে। ছয় ছেলে একদিন গেল মাঠে লাঙল দিতে, বলে গেল বোন যেন তাদের খাবার নিয়ে যায়। বোন বলে:

'কোথায় তোমরা লাঙল দেবে? আমি তো জানি না।'

ওরা বলে:

'এই কুঁড়ে থেকে একটা ফালের দাগ দিয়ে যাব আমরা। এই দাগ দেখে আসিস তুই।'

চলে গেল তারা।

আর সেই মাঠের কাছে বনের মধ্যে ছিল এক নাগ। সে এই ফালের দাগ বুজিয়ে দিয়ে নিজের পুরী পর্যন্ত একটা দাগ টেনে দিলে। মেয়েটি ভাইয়েদের জন্যে খাবার দিতে গিয়ে এই দাগ ধরে এগুল — যেতে যেতে একেবারে গিয়ে পৌঁছল সেই নাগের আঙিনায়। অমনি তাকে ধরে ফেললে নাগ।

ছয় ছেলে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এসে মাকে শুধোয়:

'সারা দিন লাঙল দিলাম, আর তুমি একটু খাবারও পাঠালে না!'

'পাঠালাম না কী! আলিওঙ্কা নিয়ে গেল যে! আমি ভাবছিলাম তোদের সঙ্গেই সে ফিরবে। পথ হারায় নি তো?'

ভাইয়েরা বলে:

'খুঁজে দেখতে হয় তাহলে।'

ফালের ওই দাগ ধরে ছয় ভাই গিয়ে পেঁছল নাগের ওই আঙিনায়। গিয়ে দেখে কি — বোনটি সেখানেই।

'আদরের ভাইয়েরা আমার, নাগ যখন ফিরবে তখন কোথায় তোমাদের লুকোব? সে যে খেয়ে ফেলবে তোমাদের!'

নাগ ততক্ষণে উড়ে এসেছে।

'ফু-ফু-ফু! মানুষের গন্ধ পাচ্ছি! কী রে বাচ্চারা, লড়বি নাকি মিটিয়ে নিবি?'

বলে, 'না, লড়ব!'

'চল তাহলে লোহার ঝাড়াই মণ্ডপে!'

লোহার ঝাড়াই মণ্ডপে এল সবাই লড়তে। বেশিক্ষণ লড়তে হল না, নাগের এক ঘায়েই লোহার মণ্ডপের মধ্যে গেড়ে গেল সবাই। আধমরা ছয় ছেলেকে টেনে বার করে নাগ তাদের ঢুকিয়ে দিলে এক গভীর অন্ধকূপে।

মা-বাপে ওদিকে পথ চেয়েই আছে — ছেলেরা আর ফেরে না।

মা একদিন নদীতে গেল কাপড় কাচতে। দেখে কি, রাস্তায় গড়াচ্ছে একটা মটর। মটর দানাটি কুড়িয়ে নিয়ে সে খেলে।

কালে ছেলে হল তার। নাম দিল মটর-গড়গড়ি।

দিনে দিনে বেড়ে উঠল ছেলে। বয়স কম কিন্তু বাড় অনেক।

ছেলের সঙ্গে বাপ একদিন কুয়ো খুঁড়ছে, খুঁড়তে খুঁড়তে কোদাল লাগল মস্ত এক পাথরে। পাথর তুলতে সাহায্যের জন্যে লোক ডাকতে গেল বাপ। ওদিকে মটর-গড়গড়ি নিজেই ততক্ষণে উপড়ে তুলেছে পাথরটাকে। লোকজন এসে দেখে আর অবাক হয়। ছেলেটার গায়ে অত শক্তি দেখে ভয় পেয়ে গেল তারা। ঠিক করল

মেরে ফেলবে ওকে। ছেলেটা কিন্তু পাথরটা ছুড়ে লোফালুফি করলে। ব্যাপার দেখে লোকেরা সব পালাল।

ছেলের সঙ্গে খুঁড়ে চলেছে বাপ — কোদাল ঠেকল মস্ত এক লোহায়। লোহাটাকে টেনে তুলে লুকিয়ে রাখল মটর-গড়গড়ি।

একদিন মা-বাপকে জিজ্ঞেস করে মটর-গড়গড়ি:

'আমার ভাই বোন কেউ ছিল বলে মনে হচ্ছে যেন?'

বলে, 'ছিল রে বাছা, কী বলব! ছিল তোর এক বোন আর ছয় ভাই!' সব কথাই বললে ওকে।

ও বলে, 'ওদের খুঁজতে চললাম আমি।'

মায়ে বাপে বোঝালে:

'যাস নে ছেলে, যাস নে: ছয় জনে মিলে গেল, ফিরল না। তুই একলা তো পারবি না!'

'না যাব, নিজের সহোদরদের উদ্ধার করব না, সে কী হয়!'

খুঁড়ে পাওয়া লোহাটি নিয়ে সে গেল কামারের কাছে।

বলে, 'একটা তরোয়াল গড়ে দাও আমায়, বেশ বড়ো সড়ো!'

কামার তাকে এমন একটা তরোয়াল বানিয়ে দিলে যে কামারশাল থেকে টেনে বার করাই মুশকিল। মটর-গড়গড়ি সে তরোয়াল ঘুরিয়ে ছুড়ে দিলে আকাশে। বাপকে বললে:

'আমি ঘুমতে চললাম। বারো দিন পরে তরোয়াল যখন মাটিতে এসে পড়বে তখন আমায় জাগিয়ে দিও।'

এই বলে শুল। তেরো দিনের দিন গুরু গুরু শব্দে উড়ে আসছে তরোয়াল। বাপ জাগিয়ে দিলে ছেলেকে। ছেলে ছুটে গিয়ে মুঠো পেতে রইল। তরোয়াল মুঠোর সঙ্গে ধাক্কা খেতেই দু'টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল। ছেলে বললে:

'না, এ তরোয়াল নিয়ে ভাইবোনদের খুঁজতে যাওয়া চলে না। অন্য তরোয়াল চাই।'

ফের কামারের কাছে নিয়ে এল তরোয়াল।

বলে, 'নাও, ফের গড়ে দাও, আমার যুগ্যি যেন হয়!'

আগের চেয়েও বড়ো করে তরোয়াল পিটিয়ে দিল কামার। মটর-গড়গড়ি তরোয়াল আকাশে ছুড়ে দিয়ে ফের বারো দিন ধরে ঘুমুল। তেরো দিনের দিন গুরু গুরু শব্দে তরোয়াল ফিরছে মাটি কাঁপছে। মটর-গড়গড়িকে জাগিয়ে দেওয়া হল। মটর-গড়গড়ি ছুটে গিয়ে মুঠো পেতে রইল। সে মুঠোর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে তরোয়াল একটু বেঁকে গেল কেবল।

'হ্যাঁ, এই তরোয়াল নিয়ে ভাইবোনদের খুঁজতে যাওয়া চলে। রুটি সেঁকে দাও মা, কিছু রুটি শুকিয়ে দাও — যাব এবার।'

তরোয়ালটি নিয়ে, থলেয় শুকোনো-রুটি পুরে বিদায় নিয়ে যাত্রা করল।

গেল সেই হালের দাগ ধরে, এখন তা প্রায় মুছে এসেছে, গেল সেই বনের মধ্যে। যেতে যেতে গিয়ে পেঁছুল আঙিনায়। আঙিনা পেরিয়ে পেঁছুল পুরীতে। নাগ নেই, ঘরে আছে কেবল বোন আলিওঙকা।

মটর-গড়গড়ি বললে, 'কুশল হোক, রূপসী মেয়ে!'

'কুশল হোক, উদার তরুণ! এখানে এলে কেন তুমি? নাগ ধেয়ে আসছে, তোমায় খেয়ে ফেলবে।'

'হয়ত বা খাবে না, কিন্তু তুমি কে?'

'আমি ছিলাম বাপ-মায়ের এক মেয়ে; নাগ আমায় হরণ করেছে। ছয় ভাই উদ্ধার করতে এসেছিল, পারল না।'

'কোথায় তারা?'

'নাগ তাদের অন্ধকূপে ফেলে রেখেছে, জানি না বেঁচে আছে, কি নেই।'

মটর-গড়গড়ি বললে, 'তোমায় আমি উদ্ধার করব।'

'তুমি করবে! ছয় জনে পারল না আর তুমি একা!'

'ভাবনা নেই,' বললে মটর-গড়গড়ি।

জানলায় বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

সেই সময় উড়ে এল নাগ। উড়ে এল সে ঘরের মধ্যে। নাক ঘুরিয়ে বলে:

'হুঁ-হুঁ-হুঁ! মানুষের গন্ধ পাচ্ছি!'

'কেন পাবে না, এই যে আমি এখানে,' বললে মটর-গড়গড়ি।

'আরে বাচ্চা, কী চাস তুই, লড়বি নাকি মিটিয়ে নিবি?'

'মিটিয়ে নেব কেন, লড়ব!' বললে মটর-গড়গড়ি।

'তবে চল লোহার ঝাড়াই মণ্ডপে।'

'চল!'

গেল ওরা। নাগ বললে:

'নে, মার দেখি!'

'না, তুই মার আগে!' বললে মটর-গড়গড়ি।

নাগের আঘাতে মটর-গড়গড়ি গোড়ালি পর্যন্ত গেড়ে গেল লোহার মণ্ডপের মধ্যে। কিন্তু পা খসিয়ে তরোয়াল হাঁকিয়ে সে এমন ঘা মারলে নাগকে যে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল সে লোহায়। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে নাগ এবার এমন মারলে যে মটর-গড়গড়ির হাঁটু পর্যন্ত গেড়ে গেল। আর মটর-গড়গড়ি ফের যখন ঘা মারলে তখন কোমর পর্যন্ত গেড়ে গেল তার — আর তৃতীয় ঘায়ে একেবারেই মরে গেল নাগ।

সেখান থেকে গেল গভীর অন্ধকূপটায়, ভাইয়েদের উদ্ধার করলে — তাদের অবস্থা তখন মরো মরো। তারপর ভাইয়েদের জোটাল, বোন আলিওঙকাকে জোটাল, আর নাগের ঘরে যত সোনা রুপো ছিল সব জুটিয়ে রওনা দিল বাড়ির দিকে।

চলেছে সবাই, মটর-গড়গড়ি কিন্তু বলে নি যে সে তাদের ভাই। অনেক পথ নাকি অল্প পথ — যেতে যেতে ওরা বসল এক ওক গাছের নিচে বিশ্রাম করতে। লড়াইয়ের পর ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল মটর-গড়গড়ি, অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল। ছয় ভাই ওদিকে পরামর্শ করে:

'লোকে হাসবে আমরা ছয় জনে নাগের সঙ্গে পেরে উঠি নি, আর ও একা তাকে মেরে ফেলল। নাগের সমস্ত ধনও ও একাই নিচ্ছে।'

পরামর্শ করে-টরে ঠিক করল: এখন ও ঘুমুচ্ছে কোনো বোধ নেই, ওক গাছের সঙ্গে ওকে এ'টে বে'ধে রাখা যাক — বাঁধন খুলতে যাতে না পারে। বনের জানোয়ারেই ওকে খাক। যেমন বলন তেমনি করণ। ওকে বে'ধেছে'দে রওনা দিল ওরা।

মটর-গড়গড়ি ঘুমচ্ছে — কোনো বোধ নেই। দিন ভোর ঘুমল, রাত ভোর

ঘুমল, তারপর জেগে দেখে — বাঁধা। কিন্তু এক ঝটকাতেই গাছটাকে সে শেকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলল, তারপর সেটা কাঁধে নিয়ে রওনা দিল। ঘরের কাছাকাছি যেতেই শোনে, ভাইয়েরা পোঁছে গেছে, জিজ্ঞাসাবাদ করছে:

'আর ছেলেমেয়ে হয়েছিল মা তোমার?'

'নয়ত কী, ছেলে হয়েছিল মটর-গড়গড়ি উদ্ধার করতে গেছে তোদের।'

ওরা তখন বলে:

'তাহলে আমরা ওকেই যে বেঁধে রেখে এসেছি! বাঁধন খুলে দেওয়া দরকার।' মটর-গড়গড়ি তখন ওক গাছটা নিয়ে ছাতের ওপর এমন বাড়ি কষলে যে ঘর ভেঙে পড়ে আর কি।

বললে, 'এই যদি তোমাদের স্বরূপ তবে থাকো তোমরা! আমি চললাম দুনিয়া ঘুরে দেখতে।'

এই বলে তরোয়াল কাঁধে বেরিয়ে পড়ল।

আপন মনেই চলল মটর-গড়গড়ি। চলতে চলতে দেখে কি — এদিকে পাহাড়, ওদিকে পাহাড়, মাঝখানে এক মানুষ, হাতে-পায়ে চাপ দিয়ে সে ঠেলে দিচ্ছে পাহাড়গুলোকে। মটর-গড়গড়ি বললে:

'কুশল হোক!'

'কুশল হোক!'

'কী করছ তুমি, ভালো মানুষের পো?'

'পাহাড় ঠেলে ফাঁক করে রাস্তা করছি।'

'চলেছ কোথায় তুমি?'

'সুখের সন্ধানে।'

'আমিও তাই। কিন্তু কী নাম তোমার?'

'পাহাড়-ঠেলিয়ে। তোমার নাম?'

'মটর-গড়গড়ি। চলো যাই একসঙ্গে!'

'বেশ চলো।'

চলল ওরা। যায়, যায়... দেখে কি, বনের মধ্যে একটা লোক; হাত দুলিয়ে দেয় আর শেকড় শুদ্ধ উপড়ে আসে ওক গাছ।

'কুশল হোক!'

'কুশল হোক!'

'কী করছ তুমি, ভালো মানুষের পো?'

'গাছ তুলে ফেলছি, আরামে হাঁটা যাবে।'

'চলেছ কোথায়?'

'সুখের সন্ধানে।'

'আমরাও তাই। কী নাম তোমার?'

'ওক-উপড়ানো। তোমাদের?'

'মটর-গড়গড়ি আর পাহাড়-ঠেলিয়ে। চলো একসঙ্গে যাই!'

'বেশ চলো।'

চলল তিনজনে। যায়, যায়... দেখে কি — মস্ত গোঁপওয়ালা একটা লোক উপুড় হয়ে আছে নদীর ওপর। গোঁপ দিয়ে নাড়া দেয় আর নদীর জল ফাঁক হয়ে যায়, হেঁটে যাওয়া যায় নদীতলের ওপর দিয়ে।

ওরা বলে:

'কুশল হোক!'

'কুশল হোক!'

'কী করছ তুমি, ভালো মানুষের পো?'

'জল সরিয়ে দিচ্ছি, নদী পার হব।'

'চলেছ কোথায়?'

'সুখের সন্ধানে।'

'আমরাও তাই। কী নাম তোমার?'

'পাকানো-গোঁপ। আর তোমাদের?'

'মটর-গড়গড়ি, পাহাড়-ঠেলিয়ে, ওক-উপড়ানো। চলো একসঙ্গে যাই!'

'বেশ চলো।'

চলল ওরা। অসুবিধা নেই চলতে: পথের মধ্যে পাহাড় পড়লে পাহাড়-ঠেলিয়ে ঠেলে সারায়, বন পড়লে ওক-উপড়ানো উপড়ে ফেলে, নদী পড়লে পাকানো-গোঁপ জল ফাঁক করে দেয়।

একদিন এল ওরা এক মস্ত বনের মধ্যে। দেখে কি বনের মধ্যে এক কুটির। কুটিরের মধ্যে গিয়ে দেখে কেউ নেই। মটর-গড়গড়ি বলে:

'রাত কাটান যাক এইখানে।'

রাত কাটাল। পরের দিন মটর-গড়গড়ি বলে:

'পাহাড়-ঠেলিয়ে, তুমি থাক ঘরে, রান্না করে রেখো, আমরা তিনজন চললাম শিকারে।'

শিকারে চলে গেল ওরা। পাহাড়-ঠেলিয়ে সেদ্ধ-ভাজা, রান্নাবান্না করে শুল একটু গড়িয়ে নেবার জন্যে। হঠাৎ কে টোকা দেয় দরজায়।

'দরজা খোল!'

পাহাড়-ঠেলিয়ে বলে, 'কে আমার মহারাজা, খুলতে হয় নিজে খোল!'

দুয়োর খুলে গেল, ফের কে বললে:

'চৌকাট পার করিয়ে দে আমায়!'

'কে আমার মহারাজা, পেরতে হয় নিজে পেরো!'

অমনি চৌকাট পেরিয়ে এসে দাঁড়াল এক বুড়ো-আঙুলে বুড়ো, তেরো হাত লম্বা তার দাড়ি। পাহাড়-ঠেলিয়ের ঝুঁটি ধরে বুড়ো তাকে টাঙিয়ে রাখল দেয়ালের পেরেকে। আর সেদ্ধ-ভাজা যা ছিল নিজে খেলে, পান করলে, তারপর পাহাড়-ঠেলিয়ের পিঠ থেকে এক চিলতে চামড়া তুলে নিয়ে চলে গেল।

পাহাড়-ঠেলিয়ে আঁকুপাঁকু করে ঝুঁটির এক গোছা চুল ছিঁড়ে খসাল নিজেকে, তারপর ফের রান্না করতে বসল। সাথীরা ফিরে এল, কিন্তু ও তখনো রাঁধছে।

'রান্নায় এত দেরি হল যে?'

'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম একটু।'

খেয়ে দেয়ে ঘুমুল সবাই। পরের দিন ঘুম ভেঙে মটর-গড়গড়ি বলে:

'এবার ওক-উপড়ানো থাকুক আজ, আর আমরা তিনজন যাব শিকারে।'

শিকারে গেল ওরা। আর ওক-উপড়ানো সেদ্ধ-ভাজা, রান্নাবান্না করলে, তারপর শুলে একটু। শোনে, কে যেন টোকা দিচ্ছে দরজায়।

'দরজা খোল!'

'কে আমার মহারাজা, খুলতে হয় নিজে খোল!'

'চৌকাট পার করিয়ে দে আমায়!'

'কে আমার মহারাজা, পেরতে হয় নিজে পেরো!'

অমনি এসে দাঁড়াল এক বুড়ো-আঙুলে বুড়ো, তেরো হাত লম্বা তার দাড়ি। ওক-উপড়ানোর ঝুঁটি ধরে সে টাঙিয়ে রাখলে পেরেকে। আর সেদ্ধ-ভাজা যা ছিল সব নিজে সে খেলে, পান করলে, ওক-উপড়ানোর পিঠ থেকে এক চিলতে চামড়া তুলে নিয়ে চলে গেল।

ওক-উপড়ানো ছটফট করে কোনো রকমে পেরেক থেকে খসে তাড়াতাড়ি রান্নায় বসল।

ফিরে এল সব সঙ্গীরা।

'রান্নায় এত দেরি হল যে?'

বলে, 'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম একটু।'

পাহাড়-ঠেলিয়ে কিন্তু চুপ করে রইল: বুঝলে কী হয়েছিল।

তৃতীয় দিন রইল পাকানো-গোঁপ — তারও সেই দশা। মটর-গড়গড়ি বলে:

'তোমরা সবাই ভারি আলসে; রান্নায় মন থাকে না। বেশ, কাল আমি থাকব ঘরে, তোমরা যাবে শিকারে।'

সেদ্ধ-ভাজা করলে মটর-গড়গড়ি, তারপর শুলে। শোনে কি, দরজায় কে টোকা দিচ্ছে।

'দরজা খোল!'

'দাঁড়া, খুলছি,' বলে মটর-গড়গড়ি। দরজা খুলে দেখে কি — বুড়ো-আঙুলে বুড়ো, তেরো হাত লম্বা তার দাড়ি।

'চৌকাট পার করিয়ে দে!'

মটর-গড়গড়ি তাকে তুলে চৌকাট পার করিয়ে দিলে। বুড়ো কিন্তু লাফিয়ে লাফিয়ে ওর দিকে আসে।

মটর-গড়গড়ি জিজ্ঞেস করে, 'ব্যাপার কী তোর?'

'কী তা দেখাচ্ছি, দাঁড়া,' এই বলে বুড়ো লাফিয়ে তার ঝুঁটি ধরে আর কি! কিন্তু 'মতলব কী তোর? এই বলে মটর-গড়গড়ি খপ করে চেপে ধরলে তার দাড়ি।

তারপর কুড়ুল নিয়ে বুড়োকে একটা ওক গাছের কাছে টেনে এনে, গাছটা ফেড়ে তার মধ্যে বুড়োর দাড়ি আটকে দিলে।

বলে, 'আমার ঝুঁটি চেপে ধরার যখন তোর ইচ্ছে, তখন থাক এখানে যতক্ষণ না ফিরছি।'

ঘরে ফিরে দেখে সঙ্গীরা সব এসে গেছে।

'রান্না তৈরি?'

'বহুক্ষণ!'

খাওয়া দাওয়া হল। মটর-গড়গড়ি বলে:

'এসো আমার সঙ্গে। অদ্ভুত একটা জিনিস দেখাব।'

ওক গাছের কাছে যায়, কিন্তু বুড়োও নেই, ওক গাছও নেই। শেকড় শুদ্ধ ওক গাছ উপড়ে বুড়ো নিয়ে গেছে সঙ্গে করে। তখন মটর-গড়গড়ি বললে কী হয়েছিল, ওরাও সব কবুল করলে, বুড়ো তাদের ঝুঁটি ধরে ঝুলিয়ে রেখেছিল, পিঠ থেকে এক চিলতে চামড়া তুলে নিয়ে গেছে।

মটর-গড়গড়ি বলে, 'ছি ছি, এই যদি বুড়োর স্বরূপ তো চলো ওকে খুঁজে বার করব।'

বুড়ো যেদিকে গাছ টেনে নিয়ে গিয়েছিল তার দাগ ছিল। সেই দাগ ধরে চলে ওরা।

চলতে চলতে পৌঁছল এক গভীর গর্তের কাছে — এত গভীর যে তল দেখা যায় না। মটর-গড়গড়ি বলে:

'গর্তে নামো, পাহাড়-ঠেলিয়ে।'

'বয়ে গেছে নামতে!'

'তাহলে তুমি নামো, ওক-উপড়ানো!'

কিন্তু ওক-উপড়ানো, পাকানো-গোঁপ কেউ রাজী নয়।

মটর-গড়গড়ি বলে:

'এই যদি তোমাদের স্বরূপ তাহলে আমি নিজেই নামব। পাকাও দড়ি!'

দড়ি পাকানো হল। দড়ির একটা ডগা ধরে মটর-গড়গড়ি বলে:

'নামাও আমায়!'

ওরা নামাতে লাগল। নামাল অনেকখন ধরে, পৌঁছল গিয়ে একেবারে পাতালে — অন্য এক দুনিয়ায়।

মটর-গড়গড়ি হাঁটতে হাঁটতে দেখে কি — মস্ত এক প্রাসাদ। প্রাসাদে ঢুকে দেখে চারিদিকে সোনারুপো মণিমুক্তোয় ঝলক দিচ্ছে। মহলার পর মহলা পেরিয়ে দেখে: ওর দিকে ছুটে আসছে এক রাজকন্যে — কী তার রূপ, সে রূপ না যায় বর্ণন, না যায় লিখন!

বলে, 'এ কী! ভালো মানুষের পো, এখানে এলে কেন?'

'না, আমি মটর-গড়গড়ি, এলাম মস্ত দাড়িওয়ালা এক বুড়ো-আঙুলে বুড়োর সন্ধানে।'

রাজকন্যে বলে, 'ওক গাছ থেকে বুড়ো তার দাড়ি খালাস করছে। যেয়ো না ওর কাছে, সে তোমায় মেরে ফেলবে। অনেককে ও মেরেছে।'

মটর-গড়গড়ি বলে, 'মারতে পারবে না। দাড়ি ওর আমিই আটকে দিয়েছিলাম। কিন্তু কে তুমি, এখানে কেন?'

'আমি রাজকন্যে, আমায় বুড়ো হরণ করে এখানে বন্দী করে রেখেছে।'

'আমি তোমায় উদ্ধার করব। নিয়ে চলো আমায় বুড়োর কাছে!'

রাজকন্যে নিয়ে গেল তাকে। দেখে সত্যিই: বসে আছে বুড়ো, ওক গাছ থেকে দাড়ি খসিয়ে ফেলেছে সে। মটর-গড়গড়িকে দেখেই বুড়ো চেঁচিয়ে উঠল:

'এলি যে বড়ো এখানে? লড়বি ন্যাকি মিটিয়ে নিবি?'

মটর-গড়গড়ি বলে, 'মিটিয়ে নেব কেন, লড়তে চাই!'

অমনি শুরু হয়ে গেল লড়াই। তরোয়াল দিয়ে মটর-গড়গড়ি মারতে মারতে মেরে ফেললে বুড়োকে। তারপর সমস্ত সোনারুপো মণিমুক্তো জড়ো করে তিনটে বস্তায় বেঁধে রাজকন্যেকে নিয়ে রওনা দিল সেই গর্তটার দিকে, যেখান দিয়ে নেমে এসেছিল। গর্তের কাছে পৌঁছে মটর-গড়গড়ি হাঁক দেয়:

'ও-হো, ভাই সব, আছো তো সবাই?'

'আছি।'

মটর-গড়গড়ি তখন দড়ির সঙ্গে একটা বস্তা বেঁধে বললে টেনে তুলতে।

'এটা তোমাদের!'

ওরা টেনে তুলে ফের নামিয়ে দিলে দড়ি। দ্বিতীয় বস্তাটা বাঁধলে মটর-গড়গড়ি:

'এটাও তোমাদের!'

তৃতীয় বস্তাটাও সে দিয়ে দিলে। যা এনেছিল সব দিয়ে দিলে। তারপর দড়ির সঙ্গে বাঁধলে রাজকন্যেকে। হাঁক দিয়ে বলে:

'আর এটা কিন্তু আমার!'

রাজকন্যেকে টেনে তুললে ওরা তিনজন, এবার মটর-গড়গড়িকে টেনে তোলার পালা। ওরা কিন্তু পরামর্শ করলে:

'ওটাকে টেনে তুলে কী হবে? বরং রাজকন্যেও আমাদের হয়ে যাবে। ওকে ওপর দিকে টেনে তুলে ছেড়ে দেব। পড়ে মরুক গে।'

মটর-গড়গড়ি টের পেল যে ওরা ফন্দি এঁটেছে। দড়ির সঙ্গে সে এক মস্তো বড়ো পাথর বেঁধে হাঁক দিল:

'এবার টেনে তোলো আমায়!'

ওরা অনেক দূর পর্যন্ত টেনে তুলে ধুপ করে ছেড়ে দিল — পাথর চৌচির।

মটর-গড়গড়ি বলে, 'দ্যাখো কান্ড!'

চলে গেল সে ওই অপর জগতটায়। যায় যায়, হঠাৎ মেঘ করে জল নামল, শিলাবৃষ্টি শুরু হল। ও আশ্রয় নিলে ওক গাছের তলে। হঠাৎ শোনে পাখির বাসায় কাঁদছে ঈগলছানারা। মটর-গড়গড়ি তখন ওক গাছে উঠে নিজের কোর্তা দিয়ে ঢেকে রাখল তাদের। বৃষ্টি থামতেই উড়ে এল এক মস্ত ঈগল পাখি — ছানাদের বাপ। দেখে কি — ঈগলছানারা ঢাকা দেওয়া। বলে:

'কে তোদের ঢাকা দিয়েছে রে?'

ছানারা বলে:

'যদি না খেয়ে নাও, তাহলে বলব।'

'না, খাব না।'

'ওই যে লোকটা বসে আছে গাছের তলে, ওই আমাদের ঢাকা দিয়েছে।'

মটর-গড়গড়ির কাছে উড়ে এসে ঈগল বলে:

'বলো কী তোমার চাই — যা চাইবে, করব। আমার ছানারা এই প্রথম বেঁচে গেল। যেই উড়ে যাই অমনি বৃষ্টি নামে আর বাছারা ডুবে মরে।'



মটর-গড়গড়ি বলে, 'আমায় নিয়ে যাও ঐ দুনিয়ায়।'

'কঠিন কাজ! কিন্তু উপায় কী, বেশ নিয়ে যাব। সঙ্গে নেব ছয় পিপে মাংস আর ছয় পিপে জল। উড়তে উড়তে যখন ডান দিকে মুখ ফেরাব, তখন এক টুকরো মাংস দিও, যখন বাঁ দিকে মুখ ফেরাব, তখন একটুখানি জল। নইলে উড়ে পৌঁছতে পারব না, পড়ে যাব।'

ছয় পিপে মাংস নেওয়া হল, ছয় পিপে জল। ঈগলের পিঠে চাপল মটর-গড়গড়ি, উড়তে শুরু করল ওরা। ওড়ে, ওড়ে — ডান দিকে মুখ ফেরায় ঈগল, মটর-গড়গড়ি ওর মুখে গুঁজে দেয় মাংস, বাঁ দিকে মুখ ফেরায় — একটু করে জল। লম্বা পথ পাড়ি দিল ওরা — এ দুনিয়ায় পৌঁছতে আর একটু বাকি। ডান দিকে মুখ ফেরাল ঈগল — পিপেয় কিন্তু এক টুকরো মাংসও আর নেই। মটর-গড়গড়ি তখন নিজের পা থেকে এক টুকরো মাংস কেটে গুঁজে দিল ঈগলের মুখে। পৃথিবীর ওপরে উঠে এল ঈগল। জিজ্ঞেস করে:

'কী দিয়েছিলে আমায় খেতে, ভারি যে মিষ্টি!'

মটর-গড়গড়ি পা দেখিয়ে বলে:

'দেখো কী দিয়েছি।'

ঈগল তখন মাংসের টুকরোটা উগরে দিলে; উড়ে গিয়ে নিয়ে এল খানিকটা মায়া জল। মাংসটা বসিয়ে দিয়ে জল ছিটিয়ে দিতেই তা ফের জুড়ে গেল।

ঈগল তারপর ফিরে গেল নিজের ঘরে, আর মটর-গড়গড়ি গেল তার সঙ্গীদের খুঁজে বার করতে। তারা কিন্তু গিয়ে হাজির হয়েছে সেই রাজকন্যের বাপের কাছে, সেখানেই থাকে আর নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে: প্রত্যেকেই চায় সেই রাজকন্যেকে বিয়ে করবে, কিছুতেই আর মিটমাট হয় না।

হঠাৎ এসে হাজির হয় মটর-গড়গড়ি। ওরা ভয় পেয়ে ভাবলে, মটর-গড়গড়ি এবার ওদের মেরে ফেলবে। মটর-গড়গড়ি কিন্তু বললে:

'আমার সহোদর ভাইয়েরাই যখন আমায় ঠকিয়েছে তখন তোমাদের আর কী বলব। মাপ করতেই হয়।'

এই বলে মাপ করে দিলে।

নিজে বিয়ে করলে সেই রাজকন্যেকে, সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে লাগল।

ন্যায় অন্যায়

(উক্রাইনী কাহিনী)



দুই ভাই ছিল, তার একজন ধনী একজন গরিব। একদিন দুই ভাইয়ে দেখা, দু'জনে কথাবার্তা হল। গরিব বলে:

'যতই কষ্ট হোক, ন্যায় পথেই চলা ভালো।'

ধনী বলে:

'আজকাল ন্যায় কোথায় তুই দেখলি? জগতে আজ আর ন্যায় নেই। যেদিকে দেখো কেবল অন্যায়। অন্যায় পথেই চলা ভালো!'

গরিব কিন্তু নিজের মত ছাড়ে না:

'না ভাই, ন্যায়ই ভালো!'

তখন ধনী ভাই বললে:

'বেশ, বাজী রাখা যাক, লোকের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করব। যার সঙ্গে দেখা হবে

তাকেই জিজ্ঞেস করব — বার বার তিন বার। যদি তোর কথায় সায় দেয় তাহলে আমার সব ধন তোর। আর আমার কথায় সায় দিলে তোর সব ধন আমার।'

গরিব বলে:

'বেশ!'

তাই রাস্তা ধরে চলল ওরা। যেতে যেতে দেখা হল একটা লোকের সঙ্গে — কাজ করে ফিরছে। ওরা বলে:

'কুশল হোক, ভালো মানুষের পো!'

'কুশল হোক।'

'আমরা তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই...'

'বেশ তো, বলো!'

'জগতে কী পথে চলা উচিত — ন্যায় পথে নাকি অন্যায় পথে?'

লোকটা বলে, 'কী যে বলো ভালো মানুষের পো, আজকাল ন্যায় তোমরা পেলে কোথায়? এই দেখ না, আমি কত খাটলাম কিন্তু মজুরি মিলল না বললেই হয়, সেটুকু থেকেও আবার মালিক কেটে নিলে। ন্যায় পথটা তাহলে কোথায়! ন্যায়ের চেয়ে অন্যায় পথে চলাই ভালো।'

ধনী ভাই বলে, 'দেখলি তো ভাই, আমার কথাই ঠিক।'

দুঃখ হল গরিব ভাইয়ের। কিন্তু কী আর করে, এগিয়ে চলল। এবার দেখা হল এক সওদাগরের সঙ্গে।

'কুশল হোক তোমার, সাধু সওদাগর!'

'কুশল হোক!'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করব তোমায়...'

'বেশ তো, করো!'

'জগতে কী পথে চলা উচিত: ন্যায় পথে নাকি অন্যায় পথে?'

'কী যে বলো, ভালো মানুষের পো, ন্যায় পথে চলছে কে? একটা সওদা বেচতে গেলে শতেক বার ফাঁকি ঝুঁকি না দিয়ে বেচাই চলে না।'

এই বলে চলে গেল সে।

ধনী বলে, 'দেখলি তো, দ্বিতীয় লোকটাও আমার পক্ষে!'

আরো মন খারাপ হয়ে গেল গরিব ভাইয়ের। রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল ওরা। যায়, যায়, দেখা হল এক জমিদারের সঙ্গে।

'কুশল হোক, হুজুরের!'

'কুশল হোক!'

'একটা কথা ছিল আপনার কাছে...'

'বেশ তো, বলো!'

'জগতে কোন পথে চলা উচিত — ন্যায় পথে নাকি অন্যায় পথে?'

'শোন বলি, ভালো মানুষের পো, জগতে আজকাল ন্যায়টা কোথায়? ন্যায় পথে বাঁচা যায় না। ন্যায় পথে চললে কি আর আমি...'

এই বলে কথা শেষ না করেই চলে গেল সে।

ধনী বলে, 'তাহলে ভাই, চল বাড়ি ফিরি, তোর সব ধন আমায় দিয়ে দিবি।'

গরিব ভাই ঘরে ফেরে, দুঃখ তার আর মানে না। ধনী ভাই তার গরিবী সম্বল যা ছিল সব নিয়ে গেল। রইল কেবল কুটিরটি।

বলে, 'ওটায় কিছুদিন তুই নয় থাক, আমার দরকার নেই, তবে তাড়াতাড়ি করে অন্য একটা ঘর দেখিস।'

নিজের সংসারে বসে আছে গরিব। ঘরে এক টুকরো রুটি নেই, কোথাও গিয়ে মজুরি খাটারও উপায় নেই — আকালের বছর। সয়ে থাকে, সয়ে থাকে... কিন্তু কেঁদে ওঠে ছেলেমেয়েরা। তাই একটা কুনকে নিয়ে গেল ধনী ভাইয়ের কাছে গম চাইতে।

বলে, 'দে ভাই আমায় এক কুনকে যে কোনো রকমের ময়দা কি দানা। ঘরে খাবার নেই, ছেলেমেয়েরা খিদেয় কাঁদছে।'

ধনী বলে, 'আগে তোর একটা চোখ গেলে দেব, তারপর দেব এক কুনকে ময়দা।'

গরিব ভাবে, ভাবে, শেষপর্যন্ত রাজী হল।

বলে, 'নে, চোখই না হয় গেলে দে, ভগবান দেখবেন, কেবল খৃষ্টের দোহাই যা হোক কিছু খাবার দে।'

ধনী ভাই তার এক চোখ গেলে দিয়ে তাকে এক কুনকে পচা ময়দা দিলে; গরিব ভাই সেটি নিয়ে ঘরে এল। বৌ তাকে দেখেই হায় হায় করে উঠল:

'এ কী করেছে তোকে? চোখ কই তোর?'

বলে, 'কী আর বলি, ভাই এটি গেলে দিয়েছে।'

সব কথা শোনাল বউকে। কান্নাকাটি করলে ওরা, হায় হায় করলে, তারপর ঐ ময়দা খেয়েই দিন কাটাতে লাগল।

কাটল হপ্তা কি তার খানিক বেশি। ফের ফুরিয়ে গেল ময়দা। গরিব ভাই কুনকে নিয়ে ফের গেল ধনী ভাইয়ের কাছে:

বলে, 'লক্ষ্মী ভাইটি আমার, দে বাপু কিছু ময়দা, যা দিয়েছিলি ফুরিয়ে গেছে।'

'অন্য চোখটা গেলে দিই, তবে দেব।'

গরিব বলে, 'দুই চোখ অন্ধ হয়ে জগতে বাঁচব কী করে ভাই? একটা চোখ তো গেলে দিয়েছিস। কৃপা কর আমায়, অমনিতেই ময়দা চাট্টি দে!'

ধনী বলে, 'না, এমনি এমনি দেব না। অন্য চোখটা গেলে দিই, তবে দেব।'

সেই কথাই মেনে নিতে হল গরিবকে।

বলে, 'নে, চোখই গেলে দে, তোর ধর্ম তোর কাছে।'

ধনী ভাই ছুরি দিয়ে তার অন্য চোখটাও গেলে দিয়ে ময়দা ঢেলে দিলে কুনকেতে। ময়দা নিয়ে অন্ধ ভাই ঘরে ফিরল।

এ বেড়া সে বেড়ায় ধাক্কা খেয়ে, হোঁচট খেতে খেতে কোনো ক্রমে তো ঘরে এল। বৌ তাকে দেখেই আতঙ্কে শিটিয়ে গেল:

'ওগো আমার দীন দুঃখী, অন্ধ হয়ে জগতে বাঁচবি কী করে? অন্য কোনো জায়গা থেকেও তো ময়দা যোগাড় করা যেত, কিন্তু এখন...'

এমন বুক ফাটা কান্না কাঁদলে যে মুখ দিয়ে আর কথা ফুটল না। অন্ধ বলে:

'কাঁদিস নে বৌ, সংসারে এক আমিই তো আর অন্ধ নই: অনেক অন্ধ আছে, চোখ না থাকলেও তো বেঁচে থাকছে।'

এ ময়দাও শিগগিরই ফুরিয়ে গেল। কুনকে কি আর অনেক? একটা। পেট কি আর কম? সংসার!

অন্ধ বলে, 'এবার বৌ, ভাইয়ের কাছে আর যাব না। তুই আমায় গাঁ ছাড়িয়ে সড়কের বড়ো পপলার গাছটার কাছে দিয়ে আসবি, সারা দিনের পর সন্ধ্যায় এসে আমায় নিয়ে যাবি; সওয়ারী পথচারী সবাই হয়ত বা রুটির টুকরো ভিক্ষে দেবে।'

বৌ তাকে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিল পপলার গাছটার নিচে, নিজে ফিরে এল ঘরে।

লোকটা বসে থাকে। একটা কপর্দক সে ভিক্ষে পেয়েছিল কারো কাছ থেকে। এদিকে সন্ধে হয়ে আসছে, বৌ আসে না। লোকটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, ভাবল একা একাই বাড়ি ফিরবে, কিন্তু পথ ভুল করে অন্য দিকে চলে গেল। যায়, যায়, কিন্তু জানে না কোন দিকে যাচ্ছে। হঠাৎ শোনে মাথার ওপরে বনের শনশন। বোঝা গেল বনেই রাত কাটাতে হবে। বুনো জানোয়ারের ভয় ছিল, তাই কোনো রকমে একটা গাছে উঠে বসে রইল লোকটা।

ঠিক যখন রাত দুপুর তখন হঠাৎ ঠিক এই জায়গাটিতে ঠিক এই ওক গাছের নিচেই এসে জুটল যত ভূতপ্রেত আর তাদের সর্দার। সর্দার জিজ্ঞেস করে, কে কী করেছে? একটা ভূত বলে:

'দুই কুনকে ময়দার জন্যে ভাইকে দিয়ে ভাইয়ের চোখ গালিয়ে দিয়েছি আমি।'

সর্দার বলে:

'ভালোই করেছিস, তবে তেমন খাসা নয়।'

'সে কী?'

'সে অন্ধ যদি এই গাছের তলাকার শিশির চোখে বুলোয়, তবে দৃষ্টি ফিরে পাবে।'

'কিন্তু এ উপায়ের কথা কেই বা শুনেছে, কেই বা জানে?'

'আর তুই কী করলি?' অন্য একটা প্রেতকে জিজ্ঞেস করে সর্দার।

'আমি এক গাঁয়ে গিয়ে সব জল শুকিয়ে দিয়েছি, একটি বিন্দুও পড়ে নেই।

জল আনতে হবে এবার নয়-দশ ক্রোশ দূর থেকে। অনেক লোকেই মারা পড়বে।'

'ভালোই করেছিস, তবে খুব খাসা নয়।'

'সে কী?'

'কাছের শহরের যে পাথরটা আছে সেটা যদি কেউ সরিয়ে দেয় তাহলে সেখান থেকে জল বেরুবে, তাতে গোটা গাঁয়ের কুলিয়ে যাবে।'

'কিন্তু এ উপায়ের কথা কেই বা শুনেছে, কেই বা জানে?'

'আর তুই কী করলি?' জিজ্ঞেস করে তৃতীয় প্রেতকে।

'এক দেশের এক রাজার একটি কন্যে। কন্যেটিকে অন্ধ করে দিয়েছি আমি, কোনো ওষুধেই কিছু হবে না।'

'ভালোই করেছিস, তবে খুব খাসা নয়।'

'সে কী?'

'এই গাছের নিচেকার শিশির যদি ওর চোখে বুলিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সে দৃষ্টি ফিরে পাবে।'

'কিন্তু এ উপায়ের কথা কেই বা শুনেছে, কেই বা জানে?'

লোকটা ওদিকে গাছের ওপর বসে বসে সব কথা ওদের শুনলে। ভূতপ্রেতেরা চলে যেতেই ও গাছ থেকে নেমে সেই শিশির নিয়ে চোখে বুলাল। অমনি ফিরে পেল দৃষ্টি। ভাবলে, 'এবার গিয়ে সাহায্য করব লোকেদের।' তারপর একটা পানপাত্রে সেই গাছের শিশির যোগাড় করে রওনা দিলে।

গেল সেই গাঁয়ে যেখানে জল নেই। দেখে কি, বাঁকে করে বালতি নিয়ে চলেছে এক বুড়ি। তাকে নমস্কার করে বলে:

'বুড়ি মা, একটু জল দাও আমায়!'

'আরে বাছা, এ জল আমি আনছি দশ ক্রোশ দূর থেকে, বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতেই তার অর্ধেক ছলকে পড়বে। সংসার আমার তো ছোটো নয় — জলের তেষ্টায় মারা পড়বে।'

'তোমাদের গাঁয়ে যখন যাব তখন সবাইকে জল খাওয়াব।'

বুড়ি তাকে জল দিলে খেতে। এত তার আনন্দ হল যে অমনি সারা গাঁয়ে

ছুটোছুটি করে এই লোকের কথা বললে। কেউ বিশ্বাস করে, কেউ করে না, কিন্তু সবাই ছুটল তাকে দেখতে, নমস্কার করে বলে:

'ভালো মানুষের পো, মরণ থেকে আমাদের বাঁচাও!'

বলে, 'বেশ, তবে সাহায্য করো আমায়। নিয়ে চলো তোমাদের কাছাকাছি শহরটায়।'

নিয়ে গেল তারা ওকে। ও তখন খোঁজে খোঁজে, খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেল সেই পাথরটা। সবাই তখন দল বেঁধে লেগে গেল পাথর ওঠাতে, পাথর সরাতে। ...আর যেই না পাথর সরল অমনি তার তল থেকে কলকলিয়ে উঠল জল। সে স্রোত এগোয় আর এগোয় আর যত ঝর্ণা, যত পুকুর, যত নদী সব কানায় কানায় ভরে ওঠে। লোকের আনন্দ আর ধরে না, মানুষটাকে ধন্যবাদ দিয়ে তারা সব টাকাপয়সা উপহার উপঢৌকন দিলে তাকে।

ঘোড়ায় চেপে সে রওনা দিলে। সেই সে রাজ্যের পথ জিজ্ঞেস করে কেবল। গেল অনেক পথ ন্যাকি অল্প পথ কে জানে — শেষপর্যন্ত গিয়ে পেঁছিল।

রাজপ্রাসাদে গিয়ে নোকরদের জিজ্ঞেস করে:

'শুনেছি তোমাদের রাজকন্যের নাকি অসুখ? আমি হয়ত সারাতে পারব।'

'কী যে বলো, বাপু! রাজবদ্যির ওষুধে কিছু হল না, তুমি আর নাক ঢোকাতে এসো না।'

'তবু একবার রাজাকে বলে দ্যাখো!'

ওদের ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু লোকটা নাছোড়বান্দা — বলো গিয়ে বাপু রাজাকে। কী আর করে, রাজাকে গিয়ে বললে। রাজা তাকে ডেকে পাঠালে প্রাসাদে।

বলে, 'তুমি আমার কন্যেকে ভালো করে দিতে পারবে বলছ?'

'পারব,' জবাব দেয় লোকটা।

'যদি পারো তবে যা চাও তাই দেব।'

রাজকন্যে যে ঘরে শুয়েছিল সেখানে নিয়ে যাওয়া হল লোকটাকে। সে তার শিশির বুলিয়ে দিলে রাজকন্যের চোখে। অমনি দৃষ্টি পেল রাজকন্যে। রাজা তখন এমন খুশি হল বলার নয়। এত ধন সম্পদ দান করলে যে সারি সারি গাড়ি দিয়ে তা বইতে হল।

ওদিকে তার বৌ কিন্তু দুঃখে মরে, অভাবে অনটনে দিন কাটায়, জানে না কোথায় তার স্বামী। ভাবছে, বেঁচে আর নেই। হঠাৎ এসে হাজির সে, জানলায় টোকা দেয়:

'দোর খোল, বৌ!'

গলার স্বর শুনেই চিনলে। আনন্দ আর ধরে না। ছুটে গিয়ে দরজা খুলে ঘরে নিয়ে আসে, ভাবে বুঝি অন্ধ।

'আলো জ্বাল!' বলে লোকটা।

আলো জ্বাললে বৌ। তাকিয়ে দেখতেই অবাক হয়ে হাত দোলালে সে। এ যে দৃষ্টিমন্ত মানুষ!

'সে কী, জয় ভগবান! এমন কাণ্ড করলে কী করে, বলো তো!'

'দাঁড়া বৌ, ধনদৌলতগুলো আগে ঘরে তুলি।'

সম্পদ সে যা ঘরে তুলল, তার কাছে কোথায় লাগে তার ধনী ভাইয়ের ধন!

ধনী হয়ে তারা দিন কাটায়। সব খবর পেয়ে ধনী ভাই ছুটে এল:

'সে কী ভাই, তোর দৃষ্টি ফিরেছে, ধনী হয়ে উঠেছিস?'

ভাই কিছু না লুকিয়ে সব বললে: এই হয়েছিল, সেই হয়েছিল।

ধনী ভাইয়ের তখন লোভ হল আরো ধন হয় কীসে। রাত হতেই সে চুপিচুপি ছুটে গেল সেই বনে, চেপে বসে রইল সেই গাছে। মাঝরাত হতেই হঠাৎ উড়ে আসে ভূতপ্রেত আর তাদের সর্দার। বলাবলি করে:

'সে কী, কেউ শোনে নি, কেউ জানে না, অথচ অন্ধ ভাই দেখি দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে, পাথরের তল থেকে জল বেরিয়েছে, রাজকন্যে সেরে উঠেছে। নিশ্চয় কেউ আড়ি পেতে শুনেছে আমাদের কথা। আয় খুঁজে দেখি!'

খুঁজতে শুরু করলে সবাই। গাছে উঠে দেখে সেই ধনীটা। জাপটে ধরে তাকে কুচিকুচি করে ফেললে তারা।

নেকড়ে কুকুর আর বেড়াল

(উক্রাইনী কাহিনী)



এক যে ছিল চাষী, তার এক কুকুর। যতদিন জোয়ান ছিল ততদিন সে মনিবের সম্পত্তি পাহারা দিয়েছে। কিন্তু বুড়ো হতেই মনিব তাকে খেদিয়ে দিলে। স্তেপে ঘুরে ঘুরে সে ইঁদুরপাতি যা পেত ধরে ধরে খেত।

একদিন রাতে তার দেখা হল এক নেকড়ের সঙ্গে। নেকড়ে বলে:

'কুশল হোক, কুকুর ভায়া!'

কুকুরও কুশল মানল। নেকড়ে বলে:

'কোথায় চলেছ, কুকুর ভায়া?'

'যতদিন জোয়ান ছিলাম, মালিক ভালোবাসত, ঘরদোর পাহারা দিতাম আর কি। বুড়ো হতেই আমায় সে খেদিয়ে দিয়েছে।'

নেকড়ে বলে:

'তোমার নিশ্চয় খিদে পেয়েছে, কুকুর ভায়া!'

'তা পেয়েছে।'

নেকড়ে বলে:

'চলো আমি তোমায় খাওয়াব।'

চলল তারা। চলেছে স্তেপের মধ্য দিয়ে। নেকড়ে দেখে ভেড়ার পাল। কুকুরকে পাঠায়:

'যাও তো গিয়ে, দ্যাখো তো কী চরছে?'

কুকুর গিয়ে দেখে শুনে ফিরে এসে বলে:

'ভেড়া।'

'দূর ছাই, খেতে গেলেই লোমে দাঁত জড়িয়ে যাবে, খিদে মিটবে না। চলো কুকুর ভায়া, এগিয়ে দেখি।'

চলে ওরা। নেকড়ে দেখলে হাঁস।

বলে, 'যাও তো গিয়ে, দ্যাখো তো কী চরছে?'

কুকুর গিয়ে দেখে শুনে ফিরে এসে বলে:

'হাঁস।'

'দূর ছাই, খেতে গেলেই পালকে দাঁত জড়িয়ে যাবে, খিদে মিটবে না। চলো আরো এগিয়ে।'

এগিয়েই চলে। নেকড়ে তাকিয়ে দেখে ঘোড়া চরছে।

বলে, 'যাও তো কুকুর ভায়া, দেখে এসো কী ওটা চরছে?'

কুকুর ফিরে এসে বলে:

'ঘোড়া।'

'তা এটায় আমাদের চলবে,' বললে নেকড়ে।

নেকড়ে ছুটল ঘোড়ার দিকে। রাগ চড়াবার জন্যে মাটি আঁচড়ায় নেকড়ে, দাঁত কড়মড় করে। বলে:

'দ্যাখো তো কুকুর ভায়া, লেজ আমার তির তির করছে কি না?'

কুকুর দেখে বললে:

'করছে।'

নেকড়ে বলে, 'এবার দ্যাখো তো, আমার চোখ ঘোলাটে হয়ে এসেছে কি না?'

'এসেছে,' বললে কুকুর।

নেকড়ে তখন ঝাঁপিয়ে গিয়ে ঘোড়ার কেশর ধরে মাটিতে আছড়ে ফেলে ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেললে। তারপর দু'জনে মিলে খেতে শুরু করলে ঘোড়াকে। নেকড়েটা জোয়ান, চটপট খেয়ে নিলে সে, কুকুরটা বুড়ো — চিবোয় আর চিবোয়, পেটে কিছু আর গেল না। অন্য কুকুর এসে ওকে ভাগিয়ে দিলে।

রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে কুকুর, দেখা হল এক বেড়ালের সঙ্গে, ওরই মতো সে স্তেপে ঘুরে ঘুরে ইঁদুর ধরে।

'কুশল হোক বেড়াল ভায়া, চলেছ কোথায়?'

'চলেছি যেদিকে দু'চোখ যায়। যদ্দিন জোয়ান ছিলাম মনিবের কাজ করেছি, ইঁদুর ধরেছি, বুড়ো হতে নজর কমে গেছে, ইঁদুর চোখে পড়ে না, মনিব খাওয়ানো বন্ধ করলে। খেদিয়ে দিলে। তাই চলেছি পথে ঘাটে।'

কুকুর বলে:

'তাহলে চলো বেড়াল ভায়া, আমি তোমায় খাওয়াব।'

চলেছে দু'জনে।

কুকুর দেখলে ভেড়ার পাল, বেড়ালকে পাঠালে:

'গিয়ে দ্যাখো তো ভায়া, কী চরছে।'

বেড়াল ছুটে গিয়ে দেখে শুনে বললে:

'ভেড়া।'

'মরুক গে ছাই! লোমে দাঁত জড়িয়ে যাবে, খিদে মিটবে না। চলো এগিয়ে যাই।'

চলতে চলতে দেখে হাঁস।

বলে, 'যাও তো ভায়া, দেখে এসো কী চরছে।'

বেড়াল দেখে শুনে এসে বললে:

'হাঁস।'

'মরুক গে ছাই! পালকে দাঁত আটকে যাবে, খিদে মিটবে না।'

চলল ওরা আরো এগিয়ে।

চলতে চলতে দেখে কি, ঘোড়া।

কুকুর বলে, 'যাও তো ভায়া, দ্যাখো তো কী এটা চরছে।'

বেড়াল ছুটে গিয়ে দেখে শুনে এসে বললে:

'ঘোড়া।'

কুকুর বলে, 'তা এটা আমাদের চলবে। দু'জনে মিলে খাব।'

রাগ চড়াবার জন্যে মাটি কামড়াতে লাগল কুকুর। বললে:

'দ্যাখো তো বেড়াল ভায়া, লেজ আমার তির তির করছে কি না?'

'না তো,' বেড়াল বলে, 'তির তির করছে না।'

ফের রাগ চড়াবার জন্যে মাটি আঁচড়ায় কুকুর, ফের জিজ্ঞেস করে:

'এবার বেড়াল ভায়া? অন্তত বল বাপু যে করছে!'

বেড়াল বলে:

'বেশ, না হয় তির তির করছে।'

'হারামজাদা ঘোড়াটাকে গিয়ে খাব আমরা!' বললে কুকুর।

ফের মাটি তুলতে লাগল কুকুর। বেড়ালকে জিজ্ঞেস করে:

'দ্যাখো তো বেড়াল ভায়া, চোখ আমার ঘোলাটে হয়ে এসেছে কি না?'

'না তো।'

'বাজে কথা বলছিস, বল হয়েছে!'

'বেশ, না হয় ঘোলাটেই হয়েছে,' বলে বেড়াল।

কুকুর তখন ফুঁসে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘোড়ার ওপর। ঘোড়াটা তার চাঁট মারতেই মাথায় লাগল কুকুরটার। চোখ উলটে পড়ে গেল কুকুরটা। বেড়াল তখন ছুটে গিয়ে বললে:

'সত্যি ভায়া, চোখ তোমার এবার ঘোলাটে হয়েই এসেছে!'

বদরাগী জায়গীরদারের সঙ্গে চাষীর ভোজন

(উক্রাইনী কাহিনী)



এক সময় এক জায়গীরদার ছিল, যেমন ধনী তেমনি বদরাগী। কারো দিকে মুখ তুলে চাইত না। আর চাষীদের তো মানুষ বলেই ধরত না: তাদের গায়ে নাকি বিচ্ছিরি গন্ধ — মাটি মাটি গন্ধ। পাইক পেয়াদাদের বলে রেখেছিল চাষী দেখলেই যেন দূর করে দেয়।

একদিন চাষীরা সব জুটে জায়গীরদারের কথা নিয়ে আলাপ করছিল। একজন বলে:

'জায়গীরদারকে আমি কাছে থেকে দেখেছি, ক্ষেতে কাজ করার সময়।'

আর একজন বলে:

'আর কাল আমি বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখেছি, ঝুল বারান্দায় বসে কফি খাচ্ছিল জায়গীরদার।'

সেই সময় সবচেয়ে গরিব একজন চাষী এসে সব শুনেটুনে হাসতে শুরু করলে।

বললে, 'ভারি তো করেছিস! বেড়ার ফাঁক দিয়ে জায়গীরদারকে আমি দেখতে যাব না, ইচ্ছে হলে তার সঙ্গে একত্রে ভোজন করব!'

'জায়গীরদারের সঙ্গে একত্রে ভোজন! বললেই হল। তোকে দেখলেই ঘাড় ধরে বিদেয় করে দেবে, বাড়ির আশেপাশে আর ঘেঁষতে হচ্ছে না!'

চাষীরা সবাই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতে লাগল। চ্যাঁচাল, বাজি ধরল:

'যত সব বাজে কথা!'

'মোটেই বাজে কথা নয়!'

'বেশ, যদি জায়গীরদারের সঙ্গে ভোজন করতে পারিস তাহলে আমরা তোকে তিন বস্তা গম আর দুটো বলদ দেব। যদি না পারিস তাহলে আমরা যা হুকুম করব পালতে হবে।'

'বেশ রাজী,' জবাব দিলে চাষীটা।

চাষী তাই গেল জায়গীরদারের মহালে। পাইক পেয়াদারা ওকে দেখেই ছুটে এল তাড়িয়ে দেবার জন্যে।

চাষী বলে, 'দাঁড়াও বাপু খানিক, জায়গীরদারের জন্যে ভালো খবর এনেছি।'

'কী খবর?'

'জায়গীরদার ছাড়া কাউকে বলা চলবে না।'

পাইক পেয়াদারা জায়গীরদারের কাছে বললে কী ব্যাপার। জায়গীরদারের কৌতূহল হল: চাষীটা কিছু চাইতে আসে নি, কী একটা খবর এনেছে। হয়ত বা তা থেকে ফায়দা হবে কিছু একটা... পাইক পেয়াদাদের হুকুম দিলে:

'ছেড়ে দাও চাষীটাকে!'

পাইক পেয়াদারা পথ ছেড়ে দিলে চাষীর। জায়গীরদার তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করে:

'কী খবর এনেছিস তুই?'

চাষী পাইক পেয়াদাদের দিকে তাকিয়ে বলে:

'তোমার সঙ্গে আলাদা কথা বলতে হবে, জায়গীরদার।'

কৌতূহল হল জায়গীরদারের: ব্যাপারটা কী? পাইক পেয়াদাদের হুকুম দিলে চলে যেতে।

সবাই চলে যেতেই চাষী ফিসফিস করে বলে:

'বলো তো হুজুর, ঘোড়ার মাথার মতো এক খণ্ড সোনার দাম কত হবে?'

'সে খোঁজ তোর কেন বল তো?' জিজ্ঞেস করে জায়গীরদার।

'দরকার আছে, হুজুর...'

জায়গীরদারের চোখ জ্বলে উঠল, হাত নিসপিস করতে লাগল।

ভাবল, 'হুঁ হুঁ, খামোকাই কি আর জিজ্ঞেস করছে! বোঝা যাচ্ছে, কোনো একটা গুপ্তধন পেয়েছে চাষীটা...'

জেরা করতে শুরু করলে সে:

'বল তো চাষা, তা জেনে তোর হবে কী?'

নিঃশ্বাস ফেলে চাষী বলে:

'বেশ, না বলতে চাও হুজুর, সে তোমার ইচ্ছে। আমার আবার এখন খাবার সময় হয়েছে। যেতে হয়।'

নিজের মেজাজের কথা তখন ভুলে গেছে জায়গীরদার, লোভে কাঁপছে। 'চাষীটাকে ধোঁকা দিতেই হবে, সোনাটি ওর হাত করতে হবে কোনো রকমে।'

চাষীকে বললে:

'শোন বলি চাষা, বাড়ি ফেরার অত তাড়া কেন? খিদে পেলে আমার সঙ্গেই নয় খেয়ে নে!'

পাইক পেয়াদাদের ডেকে বললে:

'সাজিয়ে দে টেবিল, নিয়ে আয় মদ!'

পাইক পেয়াদারা সঙ্গে সঙ্গে টেবিল পেতে দিলে। খাবার দাবার, ভোজ্য পেয় এনে দিলে।

জায়গীরদার তোয়াজ করতে লাগল চাষীকে:

'পান কর চাষী, ভোজন কর, পেট পুরে খা, লজ্জা করিস না!'

চাষী ভোজন করে, পান করে, কিছুতেই না করে না। জায়গীরদার তার থালা ভরে খাবার দেয়, পাত্র ভরে মদ দেয়।

আকণ্ঠ পান ভোজন করিয়ে জায়গীরদার বলে:

'নে, এইবার যা, চট করে ঘোড়ার মাথার মতো সোনার তালটা নিয়ে আয়! ওটার বন্দোবস্ত আমি ভালোই করতে পারি। তোকেও পুরস্কার দেব — একটা রুপোর মোহর খেলাৎ করব তোকে!'

'না জায়গীরদার, ও সোনা আমার আনা হবে না!'

'আনবি না কেন, কী হয়েছে?'

'আনা হবে না কেননা ও সোনা আমার কাছে নেই।'

'নেই মানে? তাহলে জিজ্ঞেস করতে এসেছিস কেন কত দাম?'

'এমনি, জানতে ইচ্ছে হল।'

জায়গীরদার খেপে উঠে মুখ চোখ লাল করে পা ঠুকে চ্যাঁচাল:

'বেরো হতভাগা, আহাম্মক কোথাকার!'

চাষী জবাব দিলে:

'কী বলছ, হুজুরে জায়গীরদার। তুমি যা ভেবেছ তেমন বেহেড আহাম্মক আমি নই: তোমাকে নিয়ে আমি একটু মজা করলাম আর সেই সঙ্গে তিন বস্তা গম আর দুটি তাগড়াই বলদও বাজি জিতলাম। আহাম্মকের বুদ্ধিতে তা সম্ভব নয়!'

এই বলে সে চলে গেল।

মোহন বাঁশি

(বেলোরুশী কাহিনী)



এক যে ছিল বাঁশি বাজিয়ে। বাজাতে শুরু করে সে ছেলেবেলা থেকে। বলদ চরত, আর ও ততক্ষণে নলখাগড়া কেটে বাঁশি বানিয়ে যেই বাজাতে শুরু করত অমনি বলদেরা ঘাস ফেলে কান খাড়া করে শুনত। বনে বনে শান্ত হয়ে আসত পাখিদের কাকলী, জলায় ব্যাঙেরা পর্যন্ত ডাকত না।

রাতের বেলার চারণভূমি — ভারি হাসিখুশি চারিদিকে, এখানে ওখানে ছুটোছুটি, মেয়েদের গান, ছেলেদের হাসি মস্করা — যে বয়সের যা রীতি। রাতও বেশ গরম, যেন ভাপ উঠছে। ভারি সুন্দর চারিদিকটা।

অমনি সে তার বাঁশিটি নিয়ে ফুঁ দিত। চোখের পলকে হৈচৈ মেয়েদের গান সব যেন কার হুকুমে থেমে যেত। সকলেরই মনে হত বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা মাধুরী ঝরে পড়ছে, কোন এক অদৃশ্য শক্তি যেন তাদের উঠিয়ে নিয়ে

যাচ্ছে কোন উঁচুতে, ফুটফুটে নীল আকাশ আর ঝকঝকে তারাগুলোর কাছে।

চুপ করে বসেই থাকত রাতের রাখালেরা, সারা দিনের কাজের পর হাত পায়ের ব্যথা ভুলে যেত, পেটের খিদের কথা মনে পড়ত না।

বসে বসে শুনত সে বাঁশি।

ইচ্ছে হত যেন চিরকাল বসেই থাকে, বাঁশি শোনে।

চুপ করে যেত বাঁশি। কিন্তু কেউ জায়গা ছেড়ে নড়ত না; বনে বনে, কুঞ্জে কুঞ্জে ঝরে পড়া এই যে মায়া-সুর আকাশে উঠে যাচ্ছে, তা যেন ভয় না পায়।

ফের বাঁশি বাজে, কিন্তু এবার যেন কেমন বিষাদ ভরা। অমনি কেমন একটা বেদনা যেন চেপে ধরে সবাইকে। ...মনিবের ক্ষেতে কাজ সেরে রাত করে ফিরছে চাষী আর চাষী বৌ, সে সুর শুনে থেমে যায় তারা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতেই থাকে। চোখের সামনে ফুটে ওঠে তাদের সমস্ত জীবন — অভাব অনটন, শোক তাপ, হুজুরদের হাকিমদের যত হুকুম। আর এমন দুঃখ হয় সবার যে ইচ্ছে হয় মরা কান্না কেঁদে ওঠে, ঘরের ছেলেকে বুঝি সৈন্যদলে বিদায় দিচ্ছে।

তারপরই খুশির সুর বেজে ওঠে। চাষী আর চাষী গিন্নিরা কাস্তে আঁচড়া সব ফেলে দিয়ে হাত ধরাধরি করে লাগায় নাচ।

নাচতে শুরু করে লোকজন, গোরু ঘোড়া, গাছ পালা, মেঘ তারা — সবাই নাচে আর আনন্দ করে।

এমনি ছিল সেই মোহন বাঁশি-বাজিয়ে। মানুষের মনটা নিয়ে সে যা খুশি তাই করতে পারত।

বড়ো হয়ে উঠল ছেলেটি। একটি বেহালা বানিয়ে সে এবার জগত ভ্রমণে বেরল। যেখানে যায় বেহালা বাজায়, আদরের অতিথির মতো লোকে তাকে খাওয়ায় দাওয়ায়, পথের জন্যেও কিছু বেঁধে দেয়।

অনেক দিন ধরে ঘুরে বেড়াল বাদক, ভালো মানুষদের আনন্দ দিলে, বিনা ছুরিতেই বুক চিরে দিলে নিষ্ঠুর জায়গীরদারদের: যেখানেই যেত সেখানেই লোকেরা আর জায়গীরদারদের কথা শুনত না; তাদের পথের কাঁটা হয়ে উঠল সে, হাড়ের মতো গলায় ফুটত।

জায়গীরদাররা ঠিক করলে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে ওকে। একে

ধরে তাকে ধরে, বলে বাজনদারটিকে খুন করো, জলে ডুবিয়ে মারো। কিন্তু তেমন লোক পাওয়া গেল না: সাধারণ লোকেরা ভালোবাসত বাদককে, আর হাকিমেরা ভয় পেত, ভাবত লোকটা যাদুকর।

তখন পিশাচদের সঙ্গে কথা বললে জায়গীরদাররা। আর সবাই তো জানে, পিশাচ জায়গীরদার, এক বাঁশের ঝাড়।

বাদক চলেছে বনের মধ্য দিয়ে, পিশাচেরা তার কাছে পাঠাল বারোটি ভুখা নেকড়ে। বাদকের পথ ঘিরে তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁত কড়মড় করে, অঙ্গারের মতো ধক্‌ধক্‌ করে চোখ। বাদকের হাতে কিছু নেই, কেবল থলের মধ্যে বেহালাটি। ভাবলে, 'আমার অন্তিমকাল ঘনিয়েছে।'

থলে থেকে বেহালাটি বার করলে বাদক, মরার আগে একবার বাজাবে। একটি গাছে ঠেস দিয়ে, সে তারের ওপর ছড় টানলে।

বেহালা যেন কথা কয়ে উঠল জীবন্তের মতো, মূর্ছনা ঝরে পড়ল বনে বনে। নিথর হয়ে রইল গাছপালা — পাতাটিও নড়ে না। আর মুখ হাঁ করে যেমন ছিল নেকড়েগুলো তেমনি দাঁড়িয়ে রইল।

কান ভরে শোনে, খিদে ভুলে যায়।

সুর থেমে গেল, স্বপ্নের মতো একটা ঘোরে বনের ভেতর ফিরে গেল নেকড়েরা।

আরো এগিয়ে চলে বাদক। বনের পারে সূর্য পাটে বসেছে, রোদ পড়েছে কেবল গাছগুলোর মাথায়, যেন সোনা গলে গলে পড়ছে। সব চুপচাপ. কুটোটি পড়লেও শোনা যায়।

নদীর তীরে বসলে বাদক, থলে থেকে বেহালাটি বার করে বাজাতে লাগল। এমন সুন্দর করে বাজালে যে কান পেতে রইল মাটি, কান পাতলে আকাশ। তারপর যেই 'পোলকা' সুর বাজাতে লাগল অমনি সবাই শুরু করল নাচতে। শীতের বরফ ঝড়ের মতো ঘূর্ণি নাচে নেচে উঠল আকাশের তারারা, পাল তুলে দিলে মেঘ, আর এমন হুটোপুটি লাগাল মাছেরা যে ফুটন্ত জলের মতো ফুটতে লাগল নদী।

জলের রাজাও স্থির থাকতে পারলে না, নাচতে শুরু করে দিলে। এমন মেতে উঠল যে নদীর জল উঠল তীর ছাপিয়ে। পিশাচেরা ভয় পেয়ে নদীর গহ্বর

থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল। রাগে ফুঁসছে সবাই, দাঁত কড়মড় করছে, কিন্তু বাদকের কিছু করতে পারছে না।

বাদক দেখলে জলের রাজা লোকের সর্বনাশ ঘটাচ্ছে — ক্ষেত মাঠ সব ডুবিয়ে দিচ্ছে, তাই বাজনা থামিয়ে দিলে; বেহালাটি থলেতে পুরে এগিয়ে গেল।

যায় যায়, হঠাৎ তার কাছে ছুটে আসে দুই ছোকরা জায়গীরদার।

বলে, 'আমাদের খেলায় বাজনদার নেই, আমাদের জন্যে তুই বাজা, দেদার টাকা দেব।'

বাজনদার ভাবলে, 'রাত এসে পড়েছে, কোথায় রাত কাটাব, টাকাও নেই কিছু।'

বললে, 'বেশ, বাজাব।'

ছোকরা জায়গীরদাররা বাদককে নিয়ে এল প্রাসাদে। দেখে কি, ছোকরা ছুকরী জায়গীরদারে একাকার। টেবিলের ওপর মস্ত একটা বাটি। ছোকরা ছুকরী জায়গীরদাররা সব পালা করে গিয়ে তাতে আঙুল ডুবিয়ে চোখে বোলাচ্ছে।

বাদকও বাটির কাছে গেল। আঙুল ডুবিয়ে চোখের ওপর বোলাল। অমনি দেখে কি, ছোকরা ছুকরী জায়গীরদার কেউ নেই — সবই কেবল পিশাচ আর পিশাচিনী, জায়গাটাও প্রাসাদ নয়, পাতাল।

বাদক ভাবলে, 'বটে, এই খেলায় টেনে এনেছে দেখছি! বেশ, তোদের বাজিয়ে দেখাচ্ছি, দাঁড়া!'

বেহালা ঠিক করে নিয়ে সে তার জীবন্ত তারে এমন ছড় টানলে যে পাতালের সব কিছুই একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেল; যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল পিশাচ পিশাচিনীরা।

শেয়াল নেউল গর্তে থাকে কেন

(বেলোরুশী কাহিনী)





এক সময় নাকি বনের জন্তু ঘরের পশুর লেজ ছিল না। লেজ ছিল কেবল একজনের, পশুরাজ সিংহের।

বিনা লেজে বেশ কষ্ট হত জানোয়ারদের। শীতকালে তবু কোনোরকমে চলত, কিন্তু গরম কাল এলেই আর মশা মাছির হাত থেকে রেহাই ছিল না। তাড়াবে কী দিয়ে? ভীমরুলে বোলতায় কামড়ে কামড়ে মেরে ফেলেছে এমন ঘটনা কম হত না। বাঁচাও রে বাঁচাও রে বলে যতই ডাকো তাদের হাতে একবার পড়লে আর নিস্তার নেই।

এমনি ধারা কষ্ট দেখে পশুরাজ ফতোয়া দিলে, সব জানোয়ার যেন তার কাছে এসে লেজ নিয়ে যায়।

দিকে দিকে পশুরাজের দূত ছুটল জানোয়ারদের ডাকতে। উড়ে চলল সোঁ সোঁ, শিঙায় বাজে ভোঁ ভোঁ, ঢাকে দিল বাদ্যি, ঘুমোয় কার সাধ্যি। দেখা হল

নেকড়ের সঙ্গে, জানিয়ে দিলে রাজার আদেশ। দেখা হল মোষের সঙ্গে, নেউলের সঙ্গে — তাদেরও জানালে। শেয়াল, শশক, বনগোরু, বনশুয়োর সবাইকে বললে যা বলবার।

বাকি রইল কেবল ভালুক। বহু খুঁজলে তাকে দূতেরা, শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেলে তার গুহায়, ঘুমোচ্ছে। জাগিয়ে ধাক্কিয়ে পাঠাল তাকে — তাড়াতাড়ি গিয়ে লেজ নিক গে।

কিন্তু ভালুক আবার তাড়াতাড়ি করে কবে? চলল সে হেলে দুলে, থপথপিয়ে পা ফেলে, ইতিউতি চায়, মধুর গন্ধে লালায়। দেখে কি — লাইম গাছে মধুর চাক। ভাবলে, 'রাজবাড়ির পথ তো অনেকটা, একটু পেটে কিছু দিয়ে নিই।'

গাছে উঠলে ভালুক। মৌচাকে ভর ভরন্ত মধু। আনন্দে গরগরিয়ে উঠল ভালুক, শুরু করলে মধু নিঙড়ে নিতে, দুগাল পুরে খেতে। খেয়ে দেয়ে নিজের দিকে চেয়ে দেখে গায়ের লোম সব মধু আর মোমে মাখা। ভাবলে, 'রাজার চোখের সামনে এমন চেহারায় যাই কী করে?'

তাই নদীতে গেল ভালুক, গা ধুয়ে-টুয়ে একটু শুকিয়ে নেবার জন্যে টান হল পাহাড়তলিতে। আর এমন মিঠে রোদ্দুর যে ভালুক ভায়া টেরও পেলে না, দিব্যি নাক ডাকাতে লাগল।

ওদিকে তখন রাজার কাছে জড়ো হতে শুরু করেছে পশুরা। সবচেয়ে আগে ছুটে এল শেয়াল। চারিদিক চেয়ে দেখে রাজপ্রাসাদের সামনে লেজের স্তূপ — কোনোটা লম্বা কোনোটা বেঁড়ে, কোনোটা ন্যাড়া কোনোটা লোমে ভরা...

রাজাকে কুর্নিশ করে শেয়াল বলে:

'হুজুর মহারাজ! আপনার হুকুমে সাড়া দিয়ে আমিই আগে এসেছি। অনুমতি দিন, আমার পছন্দমতো লেজ আমি বেছে নিই।'

তা যে লেজই শেয়াল পাক, রাজার তাতে কী এসে যায়?

বললে, 'বেশ, খুশিমতো লেজ বেছে নে।'

ধূর্ত শেয়াল সব লেজ দেখে শুনে নিজের জন্যে বাছলে একটি সবচেয়ে সুন্দর লেজ — যেমন লম্বা তেমনি লোমে ভরা। পাছে রাজার মতি বদলে যায় এই ভয়ে চটপট লেজটি নিয়ে পালাল সে।

শেয়ালের পরে এল কাঠবেড়ালি: সেও একটি সুন্দর লেজ বেছে নিলে, তবে শেয়ালের চেয়ে এটি আকারে ছোটো। কাঠবেড়ালির পর এল মার্তেন, সেও একটা ফোলা ফোলা পশমের সুন্দর লেজ নিয়ে ভাগল।

এল্ক জাতের হরিণ বাছল সবচেয়ে লম্বা লেজটা — তার ডগায় ঘন এক গোছা লোম — ভীমরুল বোলতা যাতে সহজে তাড়ানো যায়। আর নেউল বাছলে একটা চওড়া মোটা গোছের পুচ্ছ।

ঘোড়া বাছলে যে লেজটা তাতে কেবলি চুল। গায়ের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে ডাইনে নড়ালে, বাঁয়ে নড়ালে — বেশ ঝাপট মারছে। 'এবার মাছি তোর মরণ!' এই বলে আনন্দে সে ফিরে গেল তার মাঠে। সবচেয়ে শেষে এল খরগোস।

রাজা বলে, 'কোথায় ছিলি এতক্ষণ? দেখছিস তো, বাকি আছে কেবল একটা ছোট্ট লেজ।'

খরগোস খুশি হয়ে বললে, 'আমার ওতেই চলবে। বরং এই ভালো, নেকড়ে কুকুরের হাত ছেড়ে পালাতে সুবিধা।'

ছোট্ট লেজটি যথাস্থানে লাগিয়ে কয়েকবার নাড়িয়ে দেখে খুশি মনে ঘরে ফিরল। আর সব লেজ বিলি করে দিয়ে পশুরাজ গেল শুতে।

ভালুকের ঘুম ভাঙল কেবল সন্ধ্যার মুখে। মনে পড়ল লেজের জন্যে রাজার কাছে যেতে হয় তাড়াতাড়ি। তাকিয়ে দেখে, সূর্য তো ওদিকে পাটে বসেছে। চারপায়ে একেবারে কদমে ছুটল সে। ছোটে ছোটে, গা দিয়ে ঘাম ঝরে দরদর করে। কিন্তু রাজপ্রাসাদের কাছে গিয়ে দেখে, লেজও নেই, পশুও কেউ নেই... ভাবলে, 'কী উপায় তাহলে? সবারই লেজ থাকবে কেবল ভালুকের থাকবে না...'

ফিরল ভালুক, রেগে মেগে দাপাদাপি করলে নিজের মনে। যাচ্ছে ভালুক, হঠাৎ দেখে কি, গাছের একটা গুঁড়ির ওপর ঘুরে ফিরে দেখছে নেউল, নিজের লেজের তারিফ করছে।

ভালুক বলে, 'শোন নেউল, তোর কী দরকার লেজের, আমায় দে!'

'এ কী বলছ, ভালুক খুড়ো!' অবাক হয়ে বলে নেউল, 'এমন বাহারে লেজ কি ছাড়া যায়?'

'ভালো কথায় না দিস জোর করে নেব,' এই বলে গর্জন করে ভালুক তার প্রকাণ্ড থাবা বসালে নেউলের গায়ে।

'কিছুতেই দেব না!..' চেঁচাল নেউল, গায়ের সব জোর দিয়ে থাবা ছাড়িয়ে পালাল।

ভালুক দেখে, তার থাবায় রয়ে গেছে শুধু এক চিলতে ছাল আর নেউলের লেজের ডগাটি। ছালটা ফেলে দিয়ে লেজের ডগাটি নিজের গায়ে এঁটে ভালুক চলে গেল বাকি মধুটা খেয়ে শেষ করতে।

নেউল ওদিকে আতঙ্কে কোথায় যে যাবে ভেবে পায় না। যেখানেই গিয়ে লুকোয়, মনে হয়, অই ভালুক এল, বাকি লেজটুকুও কেড়ে নেবে। তাই সে মাটির মধ্যে মস্ত এক গর্ত খুঁড়ে তার ভেতরে বাস করতে লাগল। পিঠের ঘা শুকিয়ে গেল, রইল শুধু একটা কালো মতো দাগ। সে দাগ আজ পর্যন্ত মিলায় নি।

একদিন শেয়াল যাচ্ছে, দেখে কি — গর্ত, আর তার মধ্যে কে যেন নাক ডাকাচ্ছে, বেদম বুঝি নেশা করেছে। গর্তের মধ্যে ঢুকে দেখে নেউল ঘুমোচ্ছে।

শেয়াল অবাক হয়ে বলে, 'এ কী পড়শী, মাটির ওপরে কি তোমার নড়ার জায়গা নেই যে মাটির তলে এসে ঢুকেছ?'

'সত্যি শেয়াল ভায়া,' নিঃশ্বাস ফেললে নেউল, 'ঠিকই বলেছ, নড়ার জায়গা নেই. খাবারের খোঁজে যেতে না হলে রাতেও বেরুতাম না এখান থেকে।'

নেউল তখন শেয়ালকে বললে মাটির ওপরে কেন তার নড়ার জায়গা নেই। শেয়াল ভাবলে, 'তাই তো. ভালুক যদি নেউলের লেজে থাবা দিয়ে থাকে তো আমার লেজ যে শতগুণ সুন্দর...'

ভালুকের কাছ থেকে পালিয়ে থাকার জায়গা খুঁজতে ছুটল সে। সারা রাত ধরে খুঁজে বেড়াল, কিন্তু কোথাও লুকিয়ে থাকার ঠাঁই নেই। শেষ পর্যন্ত ভোরের সময় ঠিক নেউলের মতোই একটি গর্ত খুঁড়ে নিজের ফোলা ফোলা পশমের লেজটি দিয়ে গা ঢেকে নিশ্চিন্তে নিদ্রা দিল।

সেই থেকে নেউল আর শেয়াল থাকে গর্তে। ভদ্রমতো লেজ আর ভালুকের জুটল না।

ভাসিলের নাগ বিজয়

(বেলোরুশী রূপকথা)



হয়েছিল কি হয় নি, সত্যি কি মিথ্যে — সে যাই হোক বরং কাহিনীটা শুনি।

তাই বলি: এক রাজ্যে একদিন উড়ে এল এক চন্ড-প্রচন্ড নাগ। বনের মধ্যে এক পাহাড়ে গভীর গর্ত খুঁড়ে শুল বিশ্রাম নিতে।

কতদিন ধরে বিশ্রাম নিয়েছিল সে কথা কারো মনে নেই, কিন্তু শয্যা ছেড়ে উঠেই এমন হুংকার দিল যে সবারই কানে গেল:

'ওহে লোকেরা, মরদ মেয়ে, বুড়ো ছোটো — রোজ আমায় ভেট এনে দেবে — কেউ ভেড়া, কেউ গোরু, কেউ শুয়োর। যে ভেট আনবে সে বেঁচে থাকবে, যে আনবে না তাকে গিলে খাব!'

লোকে ভয় পেয়ে যথারীতি ভেট দিতে লাগল নাগকে।

ভেট দেয়, দেয়, তারপর একদিন দেখে দেবার আর কিছু নেই। একেবারে

নিঃস্ব হয়ে গেছে সবাই। নাগ কিন্তু ভেট ছাড়া একটা দিনও কাটাতে পারে না। নিজেই তখন ও গাঁয়ে গাঁয়ে উড়ে এসে লোক ধরে নিয়ে যেতে লাগল নিজের গর্তে।

লোকে অসহায়ের মতো ঘুরে বেড়ায় কান্নাকাটি করে, উদ্ধারের উপায় খোঁজে, বুঝে পায় না এই নিষ্ঠুর নাগের হাত থেকে কী করে বাঁচবে।

সেই সময় সেই জায়গায় এল একটি লোক। নাম তার ভাসিল। ভাসিল দেখে লোকে অসহায় হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হাত মুচড়ে কাঁদছে।

জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে তোমাদের, কাঁদছ কেন?'

নিজেদের সর্বনাশের কথা লোকেরা শোনাল তাকে।

ভাসিল তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বললে, 'ভাবনা কোরো না, নিষ্ঠুর নাগের হাত থেকে আমি তোমাদের উদ্ধার করার চেষ্টা করব...'

মোটা মতো একটা ল্যাঠি নিয়ে সে গেল সেই বনে, যেখানে নাগের বাস।

ওকে দেখে সবুজ চোখে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে নাগ শুধোয়:

'ল্যাঠি নিয়ে তুই এখানে এলি যে বড়ো?'

'তোকে পিটতে!' বলে ভাসিল।

'খুব যে বাড় দেখছি!' অবাক ল্যাগল নাগের, 'সময় থাকতে বরং পালা এখান থেকে। যেই নিঃশ্বাস ফেলব, যেই শিস দেব, অমনি আর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না, তিন ক্রোশ দূরে গিয়ে পড়বি।'

হেসে উঠল ভাসিল। বলে:

'বড়াই রাখ বুড়ো বিটকেল, তোর মতো আমি ঢের দেখেছি। দেখা যাবে কে আমাদের মধ্যে জোরে শিস দিতে পারে। নে, শিস দে দেখি।'

শিস দিলে নাগ, দিলে এমন জোরে যে গাছ থেকে পাতা ঝরে পড়ল আর ভাসিল পড়ে গেল হাঁটু গেড়ে। গা ঝেড়ে উঠে ভাসিল বলে:

'দুয়ো, আহাম্মক! এই তোর শিস দেওয়া? মুরগী পর্যন্ত হেসে উঠবে! এবার আয়, আমি শিস দেব, তবে চোখদুটো তোর বরং বেঁধে রাখ, নইলে খামোকা সব উল্টে আসবে।'

রুমাল দিয়ে চোখ বাঁধলে নাগ, আর ভাসিল তার লাঠি দিয়ে এমন শনশনিয়ে

শিস তুলে মারলে তার মাথায় যে নাগের চোখ থেকে ফুলকি বেরিয়ে এল।

'সত্যিই আমার চেয়ে তোর জোর বেশি নাকি?' নাগ বলে, 'আয় আর একবার পরখ করে দেখি। কে আমাদের মধ্যে তাড়াতাড়ি পাথর গংড়িয়ে দিতে পারে?'

পাঁচমনী ওজনের একটা পাথর নিয়ে নাগ তার থাবার মধ্যে এমন জোরে চাপ দিলে যে ধংলোর মেঘ উঠল।

'এতে আবার অবাক হবার কী আছে,' হাসল ভাসিল, 'পাথর পিষে জল বার কর তো দেখি।'

তা শংনে ভয় পেয়ে গেল নাগ। ভাবলে সত্যিই তাহলে ভাসিলের জোর তার চেয়ে বেশি। ভাসিলের লাঠিটা দেখে বলে:

'বল তোর কী চাই, আমি সব দেব।'

ভাসিল বলে, 'আমার কিছং দরকার নেই, ঘরে আমার সবই আছে, তোর চেয়েও বেশি।'

'বটে!' বিশ্বাস হয় না নাগের।

'বিশ্বাস না হয় চল গিয়ে দেখবি।'

ঘোড়ায় টানা মালগাড়িতে চেপে ওরা রওনা দিলে।

যেতে যেতে খিদে পেল নাগের। দেখে কি — বনের ফাঁকায় এক পাল বলদ চরছে। ভাসিলকে বললে:

'যা গিয়ে, একটা বলদ ধরে আন, জলখাবার খাব।'

ভাসিল বনের মধ্যে গিয়ে লাইম গাছের বাকল ছাড়াতে বসল। নাগ হাপিত্যেশ ক'রে বসে আছে, ভাসিল আর ফেরে না, শেষ পর্যন্ত নিজেই গেল তার কাছে:

'কী করছিস তুই এতক্ষণ ধরে?'

'বাকল ছাড়াচ্ছি।'

'বাকল কী হবে?'

'দড়ি পাকাব, খাবার জন্যে পাঁচটা বলদ বেঁধে নিয়ে যেতে হবে তো।'

'পাঁচটা কেন, একটাতেই আমাদের খংব হয়ে যাবে।'

একটা বলদকে ঘাড়ে ধরে গাড়ির কাছে নিয়ে এল নাগ।

ভাসিলকে বলে, 'যা, তুই এবার কাঠ নিয়ে আয়, বলদটাকে ভাজা করব।'

বনের মধ্যে একটা ওক গাছের নিচে গিয়ে বসল ভাসিল, বসে বসে চুরুট ফুঁকতে লাগল।

নাগ আর কত অপেক্ষা করে! গেল ভাসিলের কাছে:

'কী করছিস তুই এতক্ষণ?'

'ভাবছি গোটা দশেক ওক গাছ নিয়ে যাব। তাই বেছে দেখছি, কোনগুলো বেশি মোটা।'

'দশটা ওক গাছ আমাদের কী দরকার? একটাতেই হয়ে যাবে,' এই বলে নাগ এক টানে সবচেয়ে মোটা ওক গাছটাকে উপড়ে নিলে।

তারপর বলদটাকে ভাজা করে খেতে ডাকলে ভাসিলকে।

ভাসিল বলে, 'তুই নিজেই খা, আমি বাড়ি গিয়েই খাব; একটা বলদ নিয়ে আমার কী হবে, ও তো আমার এক গ্রাসেই শেষ।'

বলদটাকে খেয়ে দেয়ে ঠোঁট চাটল নাগ। তারপর চলল আরো এগিয়ে। ভাসিলের বাড়ির কাছাকাছি পেঁাছেছে। ভাসিলের ছেলেমেয়েরা দেখে বাবা আসছে তাই আনন্দে চেঁচামেচি শুরু করে দিলে:

'বাবা আসছে, বাবা আসছে!'

নাগ ঠিক বুঝতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করে:

'ছেলেরা কী বলছে?'

'মানে, তোকে নিয়ে যাচ্ছি বলে ফুর্তি হয়েছে ওদের, অনেকখন থেকে না খেয়ে আছে কিনা...'

এই না শুনে বেদম ভয়ে নাগ গাড়ি থেকে লাফিয়ে ছুটল যে দিকে পারে। কিন্তু পথ ভুল করে গিয়ে পড়ল এক জলার মধ্যে। সে জলার আবার তল মেলা ভার। জলার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে ডুবে মরল নাগ।

পিলিপ্‌কা-খোকন

(বেলোরুশী রূপকথা)



এক মরদ আর বৌ। ছেলেমেয়ে নেই তাদের। বৌ দুঃখু করে: কাকে দোল দেবে, কাকে ঘাট ঘাট করবে...

মরদ একদিন গেল বনে, অ্যালডার গাছের এক টুকরো কাঠ কেটে এনে বউকে বলে:

'নে, দোল দে একে।'

দোলনায় কাঠটি শুইয়ে দোল দিতে লাগল বৌ, গান গাইতে লাগল:

'ঘুমায় আমার খোকন, আহা রে শ্বেত বরণ, তার কালো কালো নয়ন...'

এক দিন দোল দেয়, দুই দিন দোল দেয়, আর তিন দিনের দিন দেখে কি — দোলনায় শুয়ে আছে এক খোকা!

বৌ মরদের খুশি আর ধরে না, নাম দিলে তার পিলিপ্‌কা, যত্ন আত্তি করতে লাগল তার।

পিলিপ্কা বড়ো হয়ে বাপকে বলে:

'আমায় একটা সোনার ডিঙি রূপোর দাঁড় গড়ে দাও বাবা। মাছ ধরতে যাব।'

সোনার ডিঙি রূপোর দাঁড় গড়ে দিয়ে বাপ তাকে সরোবরে পাঠাল মাছ ধরতে।

ছেলে ওদিকে মাছ ধরে আর ধরে — দিন ভোর ধরে, রাত পুইয়ে ধরে। বাড়িতেও ফেরে না: কেবলি টোপ গেলে মাছ। মা নিজেই তার খাবার নিয়ে এল। সরোবরের কাছে এসে ডাকে:

'পিলিপ্কা-খোকন, নৌকো আন তীরে, পিঠে খা পেট পুরে!'

পিলিপ্কা ডিঙি ভেড়ায় তীরে, মাছগুলো সব ঢেলে দেয় আর নিজে পিঠে খেয়ে ফের চলে যায় সরোবরে।

এখন হয়েছে কি, খ্যাংড়াকেঠো পা, হাড় জিরজিরে গা, বাবা-ইয়াগা ডাইনীর কানে গেল মা ডাকছে পিলিপ্কাকে; ঠিক করলে ছেলেটির প্রাণ নেবে।

একটা বস্তা আর বেলচা নিয়ে সে সরোবরে গিয়ে ডাকলে:

'পিলিপ্কা-খোকন, নৌকো আন তীরে, পিঠে খা পেট পুরে!'

মা ডাকছে ভেবে নৌকা বেয়ে এল পিলিপ্কা। আর বাবা-ইয়াগা বেলচা দিয়ে ডিঙি ধরে ডাঙায় তুলে পিলিপ্কাকে পুরে ফেলল বস্তায়।

বলে, 'মাছ তোকে আর ধরতে হবে না!'

বস্তাটি ঘাড়ে করে ঢুকল সে গহন বনের মধ্যে।

অনেকক্ষণ বইতে বইতে সে হাঁপিয়ে গেল। জিরিয়ে নেবার জন্যে বসল একটু, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। পিলিপ্কা তখন বস্তা থেকে বেরিয়ে তার মধ্যে ভারি ভারি পাথর পুরে দিয়ে নিজে ফিরে এল সরোবরে।

ঘুম ভেঙে বাবা-ইয়াগা পাথর ভরা বস্তাটি নিয়ে ক'কাতে ক'কাতে বাড়ি পেঁছিল।

বাড়ি এসে নিজের মেয়েকে বলে:

'এই জেলেটাকে আজ রান্না করে দে, খাব।'

মেঝের ওপর বস্তা ঝাড়তেই বেরিয়ে এল কেবল পাথর।...

কী রাগ তখন বাবা-ইয়াগার! সারা ঘর ফাটিয়ে চেঁচায়:

'দাঁড়া, আমায় ঠকানোর প্রতিফল পাবি!'

ফের সে সরোবরের তীরে ছুটে এল। পিলিপ্‌কাকে ডাকতে লাগল:

'পিলিপ্‌কা-খোকন, নৌকো আন তীরে, পিঠে খা পেট পুরে!'

পিলিপ্‌কা শুনে বলে:

'না, তুই আমার মা নোস, বাবা-ইয়াগা ডাইনী, তোকে আমি চিনি। আমার মায়ের গলার স্বর আরো মিহি।'

বাবা-ইয়াগা যতই ডাকে, পিলিপ্‌কা আর শোনে না।

বাবা-ইয়াগা ভাবলে, 'বেশ, গলার স্বর মিহি করেই নেব।'

কামারের কাছে গিয়ে সে বলে:

'কামার, কামার, জিভটা আমার টেনেটুনে পাতলা করে দে তো।'

কামার বলে, 'বেশ, পাতলা করে দিচ্ছি। নেহাইয়ের ওপর জিভটা পাত।'

নেহাইয়ের ওপর জিভ পাতল বাবা-ইয়াগা।

হাতুড়ি নিয়ে জিভ পিটতে শুরু করলে কামার। এমন পিটলে যে একেবারে পাতলা হয়ে গেল।

সরোবরের তীরে গিয়ে বাবা-ইয়াগা এবার মিহি গলায় ডাকলে:

'পিলিপ্‌কা-খোকন, নৌকো আন তীরে, পিঠে খা পেট পুরে!'

পিলিপ্‌কা শুনে ভাবলে মা ডাকছে। তীরে নৌকা ভেড়াতেই বাবা-ইয়াগা খপ করে ওকে একেবারে বস্তায়।

'এবার আর আমায় ঠকাতে হচ্ছে না!' বাবা-ইয়াগার খুশি আর ধরে না।

পথের মধ্যে না জিরিয়ে সরাসরি ওকে নিয়ে এল বাড়িতে। বস্তা ঝেড়ে বার করে মেয়েকে বলে:

'এই এনেছি পাজিটাকে! উনুনে আঁচ দে, রান্না কর। খেতে বসার সময় যেন তৈরি হয়ে যায়।'

এই বলে কোথায় সে আবার চলে গেল। মেয়ে আঁচ দিলে উনুনে, তারপর একটা কোদাল নিয়ে এসে বলে:

'এই কোদালে ওঠ, আমি তোকে উনুনে চড়াব।'

কোদালে শুয়ে পিলিপ্‌কা তার পাদুটো খাড়া করে রাখলে।

'ওরকম নয়, ওরকম ভাবে শুলে তোকে উনুনে চাপান যাবে না!'



পিলিপ্‌কা তখন নিচে ঝুলিয়ে দিলে পাদুটো।

'ওরকম নয়!' ফের চেঁচিয়ে ওঠে ডাইনীর মেয়ে।

পিলিপ্‌কা বলে, 'তবে আবার কী রকম? নিজে শুয়ে দেখা।'

'মুখ্যু কোথাকার!' ডাইনীর মেয়ে বকুনি দিলে পিলিপ্‌কাকে, 'এই দ্যাখ, কী ভাবে শুবি।'

ডাইনীর মেয়ে নিজেই কোদালে শুয়ে দেখালে টান টান হয়ে। পিলিপ্‌কাও অমনি কোদালটি নিয়ে একেবারে উনুনে। তারপর ভালো করে উনুন বন্ধ করে ডাইনির বেলচা চাপা দিয়ে রাখল, যাতে জ্বলন্ত চুল্লি থেকে বেরুতে না পারে।

তারপর কুঁড়ে থেকে বেরুতেই দেখে, ডাইনী আসছে।

মস্ত ঝাঁকড়া এক গাছে উঠে সে লুকিয়ে রইল ডালপালার মধ্যে।

ঘরে ঢুকে গন্ধ শুঁকল বাবা-ইয়াগা — বেশ ভাজা ভাজা গন্ধ। উনুন থেকে ভাজা মাংস বার করে খেয়ে দেয়ে হাড়গোড় সব উঠানে ছড়িয়ে তার ওপর গড়াগড়ি দিয়ে বলে:

'ছড়াছড়ি হাড়ে গড়াগড়ি যাই, পিলিপ্‌কার মাংস খেয়েছি, রক্ত গিলেছি।'

গাছের ওপর থেকে পিলিপ্‌কা জবাব দেয়:

'ছড়াছড়ি হাড়ে গড়াগড়ি যাও, নিজের মেয়ের মাংস খেয়েছ, নিজের মেয়ের রক্ত গিলেছ।'

এই কথা শুনে রাগে ডাইনীর মুখ একেবারে কালি হয়ে গেল। গাছের কাছে গিয়ে দাঁত দিয়ে কামড়াতে লাগল। কামড়ে কামড়ে দাঁত ভেঙে গেল, গাছ যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল।

বাবা-ইয়াগা তখন ছুটে গেল কামারের কাছে:

'কামার, কামার, লোহার কুড়ুল গড়ে দে আমায়, নইলে তোর ছেলেমেয়েদের খাব।'

কামার ভয় পেয়ে লোহার কুড়ুল গড়ে দিলে।

গাছের কাছে ছুটে এসে কোপ মারতে লাগল বাবা-ইয়াগা। আর পিলিপ্‌কা বলে:

'গাছে নয় কোপ, পাথরে!'

ডাইনী বলে:

'পাথরে নয় কোপ, গাছে!'

পিলিপ্‌কো ফের বলে:

'গাছে নয় কোপ, পাথরে!'

কুড়ুল তখন পাথরে লেগে ভোঁতা হয়ে গেল।

রাগে গর্জন করে ডাইনী কুড়ুল নিয়ে ছুটে গেল কামারের কাছে ধার করিয়ে নিতে।

পিলিপ্‌কো দেখে, গাছটা টলছে। ডাইনী কুপিয়ে গেছে অনেকটা। সময় থাকতেই প্রাণ বাঁচাতে হয়।

উড়ে যাচ্ছিল হাঁসের ঝাঁক। পিলিপ্‌কো বলে:

'হাঁস, হাঁস, একটি করে পালক দিয়ো! মা-বাপের কাছে উড়ে যাব, সেখানে তোমাদের দাম মেটাব।'

হাঁসেরা একটি করে পালক ফেলে দিলে ওকে।

সে পালক দিয়ে কেবল পাখার আধখানা গড়লে পিলিপ্‌কো।

উড়ে আসে আরেক ঝাঁক হাঁস। পিলিপ্‌কো বলে:

'হাঁস, হাঁস, একটি করে পালক দিয়ো! মা-বাপের কাছে উড়ে যাব...'

দ্বিতীয় ঝাঁকের হাঁসেরাও একটি করে পালক দিলে।

তারপর উড়ে গেল তৃতীয় ঝাঁক, চতুর্থ ঝাঁক। সবাই একটি করে পালক ফেলে দিলে পিলিপ্‌কোর জন্যে।

তাই দিয়ে পাখা বানিয়ে পিলিপ্‌কো উড়ে গেল হাঁসেদের পেছন পেছন।

কামারের কাছ থেকে ফিরে এসে ডাইনী ঝপাঝপ এমন কোপ বসাতে লাগল গাছে, যে কাঠের ছিলকে উড়তে শুরু করল।

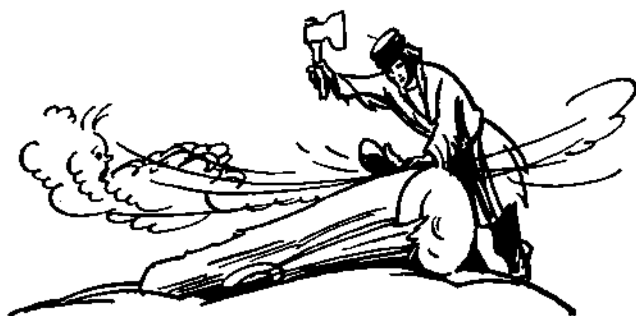
কোপের পর কোপ, কোপের পর কোপ — তারপর ঝপাং! গাছ উল্টে পড়ল ডাইনীর ওপর, প্রাণ গেল তারই।

আর হাঁসেদের সঙ্গে উড়ে উড়ে পিলিপ্‌কো এল ঘরে। মা-বাপের আনন্দ ধরে না, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছে, টেবিল পেতে এটা ওটা খেতে দিলে।

আর হাঁসেরা পেলে দানাপানি, ফুরুল কথা কাহিনী।

বুড়ো শীত আর জোয়ান শীত

(লিথুয়ানীয় কাহিনী)



এক যে ছিল বুড়ো শীত, তার এক ছেলে — জোয়ান শীত। ছেলেটি এমন বড়াই করে বেড়ায় যে কী বলব! কথা শুনে মনে হবে, ওর মতো বুদ্ধি আর তেজ দুনিয়ায় কারো নেই। একদিন এই জোয়ান শীত মনে মনে ভাবছে:

'বাপ আমার বুড়ো হয়েছে, নিজের কাজ করতে পারে না। আমি জোয়ান, গায়ের জোর বেশি —.বাপের চেয়ে অনেক ভালো করে আমি শীত জাঁকাতে পারি। আমার কাছ থেকে কেউ রেহাই পাবে না, কেউ পারবে না আমার সঙ্গে: সবাইকে হারিয়ে দেব!'

জোয়ান শীত পথ ধরে এগিয়ে চলল, খোঁজে, কাকে শীতে জমাবে। পথ ছাড়িয়ে সড়কে গিয়ে দেখে, পুরুষ্টু ঘোড়ায় টানা গাড়ির মধ্যে বসে আছে জমিদার। জমিদারটি মোটা সোটা, ওভারকোটটি ফার দেওয়া, গালিচায় পা ঢাকা।

জমিদারকে দেখে জোয়ান শীত হাসল। ভাবলে:

'ঢেকে ঢুকে যতই বসো, আমার কাছ থেকে রেহাই নেই! আমার বুড়ো বাপ তোকে পারে নি, কিন্তু আমি তোকে দেখাব! কোট আর গালিচা — কিছুতেই পার পাবে না!'

জমিদারের কাছে উড়ে গিয়ে পেছনে লাগলে শীত: গালিচার নিচে গিয়ে ঢোকে, আস্তিনের মধ্যে সেঁধোয়, কলারের মধ্যে ঢোকে, নাকে গিয়ে কনকনায়।

সহিসকে জমিদার হুকুম দেয় জোরে ঘোড়া হাঁকাতে।

চ্যাঁচায়, 'শীতে মরলাম যে রে!'

জোয়ান শীত আরো জ্বালাতন শুরু করে, আরো জোরে নাক কনকনায়, হাতে পায়ের আঙুল জমিয়ে দেয়, নিঃশ্বাস নিতে দেয় না।

জমিদার এদিক ফেরে ওদিক ফেরে, কুঁকড়ে বসে মুকড়ে বসে, হিহি করে কাঁপে।

বলে, 'জলদি! জলদি করে ঘোড়া ছোটা!'

তারপর আর চেঁচানিও নেই: শীতে গলা আর ওঠে না।

নিজের বাড়িতে ফিরে এল জমিদার; প্রায় আধমরা অবস্থায় ঘরে তোলা হল তাকে।

জোয়ান শীত উড়ে এল বুড়ো শীতের কাছে। বড়াই করতে লাগল বাপের সামনে:

'দেখেছ আমি কেমন, দেখেছ আমার তেজ! আমার কাছে তুমি কোথায় লাগো! দ্যাখো, কী রকম একটা জমিদারকে আমি শীতে জমিয়ে দিলাম! দ্যাখো, কী রকম গরম ওভারকোটের তলে গিয়ে সেঁধিয়েছিলাম! অমন কোটের তলে ঢোকার সাধ্যি তোমার নেই! অমন জাঁদরেল জমিদারকে শীতে কাবু করার ক্ষমতাই তোমার নেই!'

বুড়ো শীত হেসে বলে:

'বড্ডো যে বড়াই দেখছি, একটু সবুর করে বড়াই করিস। মুটকো জমিদারকে শীতে জমিয়েছিস বটে, গরম ওভারকোটের তলে গিয়েও ঢুকেছিস। কিন্তু সে আর এমন কী! ওই দ্যাখ — মরখুটে ঘোড়ায় ছেঁড়া কোটে যাচ্ছে এক রোগা চাষী। দেখছিস তো?'

'দেখছি।'

'চাষী যাচ্ছে বনে কাঠ কাটতে। ওকে একবার শীতে জমাবার চেষ্টা করে দ্যাখ দেখি। যদি পারিস তবে বুঝব, সত্যিই তোর তেজ আছে।'

জোয়ান শীত বলে, 'আর লোক পেলে না, ওকে তো আমি এক পলকেই জমিয়ে দেব!'

জোয়ান শীত ঘুরপাক খেয়ে উড়তে উড়তে ছুটল চাষীর নাগাল ধরতে। নাগাল ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ে শুরু করলে জ্বালাতন: এদিক থেকে আসে, ওদিকে থেকে আসে, চাষী কিন্তু যেমন চলল চলছে। জোয়ান শীত চেষ্টা করল তার পায়ে কামড় দিতে। চাষী কিন্তু স্লেজ থেকে নেমে ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুটল।

জোয়ান শীত ভাবে, 'দাঁড়া না, বনের মধ্যে দেখাব তোকে!'

বনের মধ্যে এল চাষী, কুড়ুল নিয়ে শুরু করলে ফার আর বার্চ গাছ কোপাতে — চারিদিকে ছুটতে লাগল কাঠের টুকরো।

আর জোয়ান শীত ওদিকে চাষীকে ছাড়ে না: হাতে ভর করে, পায়ে ভর করে, কলারের মধ্যে গিয়ে ঢোকে...

আর যত জ্বালাতন করতে চায় জোয়ান শীত ততই জোরে কুড়ুল চালায় চাষী, ততই কাঠ ফাড়ে। এমন গরম হয়ে উঠল শরীর যে দস্তানা পর্যন্ত খুলে ফেললে।

অনেকক্ষণ চাষীর পেছনে লেগে শেষ পর্যন্ত হয়রান হয়ে গেল জোয়ান শীত।

ভাবে, 'আচ্ছা, দাঁড়া, যাই করুক শেষ পর্যন্ত তোকে কাবু করবই! ঘরে ফেরার সময় তোর হাড় পর্যন্ত কনকনিয়ে দেব!'

এই ভেবে গিয়ে হাজির হল স্লেজ গাড়িটায়, তারপর দস্তানাটার মধ্যে ঢুকে বসে রইল। বসে বসে হাসে:

'দেখব বেটা চাষী তার দস্তানা পরে কেমন করে: এমন করে জমিয়েছি যে আঙুল ঢুকবে না!'

জোয়ান শীত তো বসে রইল চাষীর দস্তানায়, আর চাষী ওদিকে কোপের পর কোপ মেরে চলেছে।

কাঠ ফাড়া সে থামাল যখন স্লেজ একেবারে উঁচু হয়ে ভরে উঠেছে।

বলে, 'এবার বাড়ি ফেরা যেতে পারে।'

দস্তানাটা নিয়ে চাষী পরতে যাবে, দেখে একেবারে লোহার মতো শক্ত।

'এবার বাছাধন?' আপন মনে হাসে জোয়ান শীত।

চাষী কিন্তু যেই দেখল দস্তানাটা পরা সম্ভব নয়, অমনি তার কুড়ুলটা নিয়ে পিটতে লাগল তার ওপর।

দস্তানার ওপর চাষী বাড়ি মারে ঠকাঠক আর দস্তানার ভেতরে জোয়ান শীত তখন গেলুমরে মলুমরে!

জোয়ান শীতকে এমন ধোলাই দিলে চাষী যে কোনোক্রমে প্রাণটি নিয়ে সে পালাল।

ঘরে ফেরে চাষী কাঠ বয়ে, ঘোড়া হাঁকিয়ে। আর জোয়ান শীত ফেরে বাপের কাছে উহু আহা করতে করতে। বুড়ো শীত তাকে দেখে হাসতে শুরু করল:

'কী হল রে ছেলে, অমন কুঁথিয়ে কুঁথিয়ে হাঁটছিস?'

'চাষীকে শীতে জমাতে গিয়ে নিজের দফা শেষ।'

'অমন করুণ সুরে আহা উহু করছিস কেন রে বাছা, জোয়ান শীত?'

'বেদম পিটুনি দিয়েছে চাষীটা!'

'এবার বাছা, জোয়ান শীত, শিক্ষা হল তোর: আলসে জমিদারকে সহজেই ঘায়েল করা যায়, কিন্তু চাষীকে কেউ কখনো কাবু করতে পারে না। ভুলিস না কথাটা!'

মনিব হল ঘোড়া

(লাতভীয় কাহিনী)



সাবেক কালে ছিল এক নিষ্ঠুর মনিব। নিজের চাষী মজুরদের ওপর তার এতটুকু মায়া ছিল না — খাটিয়ে খাটিয়ে আধমরা করে তুলত। পরবের দিনেও ছুটি দিত না তাদের।

খুব একটা বড়ো পরবের সকালবেলায় যখন অন্য সবাই খাটাখাটুনির পর আয়েস করছে, তখন মনিব তার মজুরদের পাঠাল ঝাড়াই মাড়াই করতে।

মজুরেরা কিন্তু তার আগে সারা দিন সারা রাত ধরে খেটেছে, পায়ের ওপর দাঁড়াতেও কষ্ট হচ্ছিল তাদের।

কোনো রকমে কাজে নামতেই মনিব নিজেই লাঠি হাতে এসে হাজির হল সেখানে: মজুরেরা নাকি ঠিক মতো কাজ করছে না: গালাগালি চোটপাট করতে থাকে মনিব, লাঠি উঁচিয়ে হাঁক দেয়:

'যত সব অকম্মার দল! যত রাই আছে সব ঝাড়াই না করা পর্যন্ত কাউকে ছাড়ছি না!'

মজুরেরা মনিবকে বললে একটা ঘোড়া জুতে দেওয়া হোক মাড়ায়ের কাজে, তাহলে চটপট কাজ হবে।

মনিব ফুঁসে উঠল, 'কী বললি? তোদের আবার একটা ঘোড়া দিতে হবে?.. আলসের দল, এমন কথা যদি ফের মনে আনার স্পর্ধা করিস তবে নিজের হাতে গলা টিপে মারব তোদের! দেব না ঘোড়া, ঘোড়া এখন জিরুবে, কাজ করবি তোরা!'

চোটপাট করে চলে গেল মনিব: ঝাড়াই মাড়াইয়ের ধুলো খেতে কারই বা সাধ হবে!

মনিব চলে যেতেই মজুরদের কানে এল — কে যেন বলছে:

'হেই — হেই — খামোশ!..'

তারপর শোনা গেল ঘোড়ার ডাক, কড়ার শব্দ। বোঝা যায় কেউ ঘোড়া সাজাচ্ছে। কে লোকটা?

এমন সময় সেখানে এল এক থুত্থুড়ে বুড়ো — লম্বা সাদা দাড়ি, আর চোখে যেন বিদ্যুতের ঝলক।

একটা তেজী বাদামী ঘোড়াকে বুড়ো টেনে আনে লাগাম ধরে।

মজুরদের কুশল মেনে বলে:

'এই নাও তোমাদের ঘোড়া। মাড়াই কলে জুতে দাও। সবচেয়ে মেহনতের কাজে লাগাবে ওকে। বনে যখন যাবে তখন কাঠগুলো গাড়ির ওপর চাপাবে না। গাছ কেটেই তার মাথার সঙ্গে ঘোড়াটাকে জুতে দেবে, ডালপালা সমেত যেন সে গাছ টেনে নিয়ে আসে মনিবের আঙিনায়। যদি গোঁয়ার্তুমি করে, টানতে না চায়, তাহলে খুব করে কষবে, মায়া করবে না। চাবুক কষবে পিঠে পাঁজরায়, কিন্তু মাথায় নয়। খেতে দেবে না কিছু। সন্ধ্যায় আস্তাবলে নিয়ে আসার পর ওকে ছাতের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখবে। নিজের কাজের পর সারা রাত যেন ঝুলে থাকে। এতে ওর উপকারই হবে।'

এই বলে অন্তর্ধান করলে বুড়ো।

আর জোরে ডাক ছাড়ল ঘোড়াটা, সে ডাক শুনে মনিবের গলার স্বরই মনে পড়ে যায়।

মজুররা তখন টের পেলে ঘোড়াটি কেমন ধারা।

'বজ্র বিদ্যুতের দেবতা পের্‌কুন পিতাই তাহলে ঘোড়াটি দিয়ে গেল আমাদের!' বলাবলি করে মজুরেরা, 'তার যখন আদেশ তখন অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করতে হয়। যা বলেছে, তাই করব ঘোড়াটাকে।'

ঘোড়াটাকে মাড়াইয়ে জুতে কাজ শুরু করলে তারা। ঘোড়াটা কিন্তু গোঁ ধরে, ডাক ছাড়ে, চাঁট মারে, মাথা নাড়ে — কাজ করতে চায় না। উচিত মতো চাবুক কষা হত তখন — গোঁয়ার্তুমি ঘুচে যেত।

এইভাবেই চলল সেদিন থেকে। সবচেয়ে মেহনতের কাজ পড়লেই অমনি জোতা হত ঘোড়াটাকে। কাজ করতে না চাইলে এতটুকু মায়া না করে চালানো হত লাঠি, চাবুক।

সারাদিন ঘোড়াটা কাজ করত না জিরিয়ে, আর রাত্রে আস্তাবলে নিয়ে গিয়ে তাকে ঝুলিয়ে রাখা হত:

'ঝুলে থাক সকাল অব্দি!'

খাবার দেওয়া হত না কিছুই। সারা শীতকাল ধরে জুটত কেবল গাড়ি থেকে চুপি চুপি টেনে নেওয়া দুই এক গোছা খড়, আর গরম কালে, বেড়ার নিচে থেকে খুঁটে নেওয়া দুই এক গোছা বিছুটি, বাস্।

আর ঠিক যে দিনটি থেকে ঘোড়াটার উদয় হল সেই দিন থেকেই কিন্তু নির্দয় মনিবটির আর পাত্তা মিলল না। মনিব-গিন্নি খুবই খোঁজাখুঁজি করলে তার, কিন্তু সন্ধান আর নেই।

পুরো একটি বছর কাটল। ঘোড়াটা ছিল বেশ শক্ত, সমর্থ, সুঠাম — কিন্তু এক বছরের মধ্যেই রোগা হয়ে গেল একেবারে — কোটরে ঢুকল চোখ, ঠোঁট ঝুলে পড়ল, ফুটে উঠল পাঁজরার হাড়, বেঁকে গেল পিঠ, কদর্য হয়ে উঠল গায়ের লোম।

মনিব-গিন্নি একদিন আঙিনায় ঘোড়াটা দেখে গোমস্তাকে বলে:

'এই লক্ষ্মীছাড়াটাকে বনে নিয়ে গিয়ে শেষ করে দিতে হয়। এটা আর কোনো কাজে লাগবে না, দেখলেও পিত্তি জ্বলে যায়!'

7*

কিন্তু গোমস্তাও বোধহয় আন্দাজ করেছিল ঘোড়াটি কে, তাই তাকে মারলে না।

একদিন এক মহা পরবের দিন সবাই যখন আরাম করছে তখন ঘোড়াটা চুপি চুপি বেরল আস্তাবল থেকে। মনিবের সব্জি খেতের মধ্যে ঢুকে শুরু করলে বাঁধাকপি খেতে।

বেড়াতে বেরিয়েছিল মনিব-গিন্নি; সব্জি খেতের কাছে এসে দেখে: হতচ্ছাড়া ঘোড়াটা গোগ্রাসে বাঁধাকপি গিলছে।

ভয়ানক চটে উঠল মনিব-গিন্নি।

বলে, 'আরে, হতচ্ছাড়া জানোয়ার! দাঁড়া তোকে আমি দেখাচ্ছি!'

মোটা একটা লাঠি নিয়ে গদাম করে মারলে ঘোড়াটার মাথায়। যেই না মারা, অমনি তার সামনে হাজির স্বয়ং মনিব।

মিনমিনে করুণ গলায় সে বলে:

'আমায় মারছ কেন গো গিন্নি? বাঁধাকপির পাতাও কি বাপু প্রাণে ধরে দিতে পারো না? গোটা বছর ধরে উপোস দেওয়ার পর ঐ বাঁধাকপির পাতাও যে আজ আমার কাছে আমার আগেকার ষোড়শোপচার অন্নের চেয়েও মিষ্টি।'

মনিব-গিন্নি তাকে চিনতে পেরে কেবলি হায় হায় করে। মনিব আর সে মানুষটি নেই: রোগা হয়ে গেছে, কালো হয়েছে, বেড়ে উঠেছে দাড়ি, হাতে পায়ে লম্বা লম্বা নখ, গা ভর্তি কাটা ছেঁড়ার দাগ, পোশাক বলতে গায়ে ঝুলছে কিছু ন্যাতাকানি।

মনিবের হাত ধরে মনিব-গিন্নি তাকে ঘরে নিয়ে এল চুপি চুপি, কেউ যেন দেখতে না পায়।

সেই থেকে শান্ত শিষ্ট হয়ে উঠল মনিব।

যার যা পাওনা

(এস্তোনীয় কাহিনী)





রাস্তা দিয়ে একদিন চলেছে এক বুড়ো গরিব পথিক। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, আঁধার ঘনিয়েছে।

ভাবলে সামনের বাড়িটায় গিয়ে রাতের জন্যে আশ্রয় চাইবে। মস্ত একটা বাড়ির জানলায় গিয়ে টোকা দিলে:

'রাতের জন্যে আশ্রয় দিন গো!'

ঘর থেকে বেরিয়ে এল ধনী গিন্নি, গালমন্দ করতে লাগল পথিককে, চোটপাট করতে লাগল।

বলে, 'দাঁড়া, কুকুর লেলিয়ে দিচ্ছি, বুঝবি কেমন রাত কাটে এখানে! ভাগ বলছি!'

আরো এগিয়ে চলল পথিক। দেখে এক ছোটোখাটো গরিব কুঁড়ে। জানলায় টোকা দিয়ে বললে:

‘এক রাতের জন্যে আশ্রয় দাও গো, গেরস্থ!’

অমায়িক সুরে গিন্নি বললে, ‘এসো না, এসো ভেতরে! রাত কাটাবে কাটাও — তবে, অপরাধ নিও না, ভারি ঘেঁষাঘেঁষি এবাড়িতে, বড়ো গোলমাল।’

ঘরে ঢুকে পথিক দেখে: গরিব সংসার, একপাল ছেলেমেয়ে, ছেঁড়া খোঁড়া পোশাক।

পথিক বলে, ‘তোমার ছেলেমেয়েরা অমন ন্যাতাকানি জড়িয়ে যে? নতুন পোশাক সেলাই করে দাও না কেন?’

গিন্নি বলে, ‘পাব কোথায়? বিধবা মেয়ে, ছেলেদের মানুষ করতে হচ্ছে আমায় একা। নতুন পোশাক জোটাব কোত্থেকে!.. খাবারই পয়সা জোটে না।’

পথিক সব শুনলে, কিন্তু জবাবে একটি কথাও বললে না। গিন্নি রাতের খাবারের জন্যে টেবিল পেতে পথিককে ডাকলে:

‘বসো, আমাদের সঙ্গেই খেয়ে নাও!’

পথিক বলে, ‘না, খিদে নেই, কিছু আগেই খেয়েছি, পেট ভরা।’

নিজের ঝুলিটি খুলে সে খাবার মতো যা কিছু ছিল বার করে ছেলেমেয়েদের দিলে। তারপর শুয়েই সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোর ভোর উঠল বুড়ো, রাতের আশ্রয়ের জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিয়ে বললে:

‘সকাল থেকে যা শুরু করবে, সন্ধ্যে পর্যন্ত সেটা চলবে!’

পথিকের কথাটা কিছু বুঝলে না মেয়েটা, কোনো মন দিলে না সেদিকে। বেড়া পর্যন্ত পথিককে এগিয়ে দিয়ে সে বাড়ি ফিরে ভাবলে:

‘এই গরিব লোকটিই যখন বলে যে আমার ছেলেরা ন্যাতাকানি পরে আছে, তখন না জানি কী বলবে অন্য লোকে!’

ওর কাছে বাকি ছিল কেবল খানিকটা কাপড়। ভাবলে তাই দিয়েই অন্তত একটা জামাও সেলাই করে দেবে। এই ভেবে সে গেল তার ধনী প্রতিবেশীর কাছে। তার কাছ থেকে মাপ চেয়ে নিলে সে: কাপড়ের টুকরোটা মেপে দেখবে, একটা জামার মতো হবে কিনা।

পড়শীর কাছ থেকে ফিরে এসেই গরিব মেয়েটি তার ভাঁড়ারে গেল।

কাপড়ের টুকরোটি বার করে মাপতে বসল। যত মাপে, টুকরোটা ততই লম্বা হয়ে যায়, শেষ যেন আর নেই... সারা দিন ধরে সে মেপে চলল, মেপে শেষ করল কেবল রাত ঘনিয়ে আসার পর।

হ্যাঁ, এবার তার নিজের আর তার সবকটি ছেলেমেয়ের সারা জীবনের জন্যে জামার কাপড় বেশ কুলিয়ে যাবে!

'সকালে পথিকটি তাহলে এই কথাই বলেছিল!' বুঝতে পারল গরিব মেয়েটি।

ধনী পড়শীকে মাপটা ফেরত দিতে গেল সে; কিছু না লুকিয়ে বললে, কেমন করে সে পথিকের কথায় পেয়ে গেছে ঘরভরা কাপড়।

'কী আফসোস, রাত কাটাবার জন্যে পথিকটাকে কেন যে ঢুকতে দিই নি বাড়িতে।' এই ভেবে ধনী পড়শী হাঁক পড়ল:

'ওরে চাকর! শিগগির ঘোড়া জুতে ছোট ওই গরিবটার পেছনে! যেখানেই থাকুক, তাকে নিয়ে আসবি এখানে! গরিব দেখলে সাহায্য করতে হয় বৈকি, কৃপণতা করা উচিত নয়। চিরকালই আমি তাই বলি।'

চাকর সঙ্গে সঙ্গে ছুটল সেই গরিব পথিকের সন্ধানে। তার নাগাল পেল কেবল পরের দিন। বুড়ো কিন্তু ফিরতে চাইল না।

খুব মুষড়ে পড়ল চাকর। বলে:

'কী আর করি, আমার কপাল খারাপ: তোমায় নিয়ে যেতে না পারলে আমায় তাড়িয়ে তো দেবেই, মজুরিও দেবে না...'

বুড়ো তখন বলে, 'নে, মন খারাপ করিস না বাপু, তাই হোক, তোর সঙ্গেই যাব!'

গাড়িতে উঠে রওনা দিল ওরা।

ধনী গিন্নি ওদিকে ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, তর আর সয় না।

বুড়োকে সে একগাল হেসে, কুর্নিশ করে আমন্ত্রণ করলে, খাওয়ালে দাওয়ালে, নরম বিছানায় শোয়ালে।

'শোও বুড়োদাদু, আরাম করো গো!'

ধনীর বাড়িতে একদিন কাটায় বুড়ো পথিক, দু'দিন কাটায়, তিন দিন কাটায়।

খায় দায়, ঘুমোয়, পাইপ টানে। গিন্নি তাকে আপ্যায়ন করে, মিঠে মিঠে কথা বলে, আর মনে মনে চটে, ভাবে:

'কবে যে যাবে এই মুখপোড়া বুড়োটা!..'

আবার তাড়িয়ে দিতেও ভরসা হয় না। ভয় পায়: তাড়িয়ে দিলে যে এত যত্ন আত্তি সব বৃথা যাবে।

কিন্তু গিন্নিকে খুশি করে চার দিনের দিন ভোর সকালে যাত্রার আয়োজন করলে বুড়ো। ধনী গিন্নি এগিয়ে দিতে গেল ওকে। ফটক পর্যন্ত যায় বুড়ো, কিছুই বলে না। ফটক পেরিয়ে রাস্তায় উঠল, তবু মুখে কথাটি নেই। ধনী গিন্নির আর সহ্য হয় না।

বলে, 'বলো না, আজ আমার কী করার কথা?'

পথিক তার দিকে চেয়ে বললে:

'সকাল থেকে যা শুরু করবে, সন্ধ্যে পর্যন্ত তাই চলবে!'

ধনী গিন্নি ঘরে ছুটে এসে মাপকাঠি নিয়ে কাপড় মাপতে বসল।

ঠিক তক্ষুণি কিন্তু এমন জোরে সে হেঁচে উঠল যে আঙিনার মুরগীগুলো ভয় পেয়ে দিগ্বিদিকে ছুটে গেল।

আর সেই যে হাঁচি শুরু হল, তার আর থামা নেই, চলল সারা দিন ধরে।

'হ্যাঁচ্চো! হ্যাঁচ্চো! হ্যাঁচ্চো!'

খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, জিজ্ঞেস করলে কোনো জবাব নেই। শোনা যায় কেবল:

'হ্যাঁচ্চো! হ্যাঁচ্চো! হ্যাঁচ্চো!'

সে হাঁচি থামল কেবল সূর্য যখন ডুবে গিয়ে একেবারে অন্ধকার হয়ে এল চারিদিক।

হিইসি'র যাঁতা

(কারেলীয় কাহিনী)



দুই ভাই, এক ভাই গরিব, এক ভাই ধনী। পাড়াপ্রতিবেশীর সঙ্গে ধনী ভাইটির গলায় গলায় ভাব, আর নিজের ভাইটিকে যেন চেনেই না। ভয় পায়, পাছে এসে আবার কিছু না চেয়ে বসে।

গরিব কিন্তু ধনী ভাইটির কাছে কখনো কিছু চায় নি। একদিন পরবের দিন, অথচ ঘরে তার কিছু নেই। বউ বলে:

'পরব পালন করব কী করে? ভাইয়ের কাছে গিয়ে খানিকটা মাংস ধার করে আনো। কাল ও একটা গোরু জবাই করেছে, আমি দেখেছি।'

বউকে অনেক বুঝিয়ে নিরস্ত করার চেষ্টা করলে গরিব ভাই, কিন্তু আর কোনো উপায়ও ছিল না।

ধনী ভাইয়ের কাছে এসে তাই সে বলে:

'কিছু মাংস ধার দে ভাই, পরব পালনের মতো কিছু নেই ঘরে।'

ধনী ভাই তাকে একটা গোরুর খুর ছুড়ে দিয়ে বললে:

'এই নে, নিয়ে বনে চলে যা খোদ হিইসির কাছে!'

গরিব ভাই ধনীর বাড়ি থেকে ফিরে ভাবে:

'কী করি, খুরটা যখন সে আমায় দেয় নি, হিইসিকে দিয়েছে, তখন তাকেই গিয়ে দেব!'

এই ভেবে চলে গেল বনে।

বনে বনে সে ঘুরল অনেকক্ষণ নাকি অল্পক্ষণ কে জানে — দেখা হল কাঠুরিয়াদের সঙ্গে। তারা জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে:

'কোথায় চলেছ তুমি?'

গরিব বলে, 'চলেছি হিইসির কাছে, গোরুর খুর নিয়ে যাচ্ছি তার জন্যে, জানো তোমরা কোথায় তার ঘর?'

কাঠুরিয়ারা বলে:

'বনে ধরে চলে যাও একেবারে সোজা, কোথাও ঘুরো না। তাহলেই পৌঁছবে হিইসির কাছে। কেবল আমরা যা বলছি সেটা শুনে রাখো। হিইসি যদি এই খুরের জন্যে রুপো দিতে চায় নিয়ো না। সোনা দিতে চাইবে — তাও নিয়ো না। ওর কাছ থেকে কেবল যাঁতাটি চেয়ে নিয়ো।'

সদুপদেশের জন্যে কাঠুরিয়াদের ধন্যবাদ দিয়ে গরিব ভাই বিদায় নিয়ে চলে গেল।

গেল অনেক পথ নাকি অল্প পথ কে জানে, দেখে কাঠের ঘর। ঘরের ভেতর ঢুকে দেখে — বসে আছে খোদ হিইসি।

গরিব ভাইয়ের দিকে চেয়ে হিইসি বললে:

'লোকে কত কথা দেয়, কিন্তু ভেট আনে কেবল কালেভদ্রে। কী তুই এনেছিস আমার জন্যে?'

'গোরুর খুর।'

খুশি হয়ে উঠল হিইসি:

'তিরিশ বছর আমি মাংস খাই নি! দে তোর খুর!'



গোরুর খুরটি নিয়ে সে খেয়ে বললে:

'এবার তোকে দাম মেটাতে হয়। এই খুরের জন্যে কী রকম দাম নিবি তুই? এই নে, দুমুঠো রুপো দিলাম তোকে!'

গরিব বলে:

'রুপো আমার চাই না।'

সোনা নিয়ে হিইসি দুমুঠো সোনা দিলে গরিব ভাইকে। গরিব কিন্তু বলে:

'সোনাও চাই না আমি।'

'তাহলে কী চাই তোর?'

'তোমার যাঁতাটি আমায় দাও!'

হিইসি বলে, 'উহুঁ, এ যাঁতা তোকে আমি দিতে পারি না। বরং যত ইচ্ছে টাকা নে।'

গরিব ভাই কিন্তু রাজি হয় না, যাঁতাটিই তার চাই।

হিইসি বলে, 'গোরুর খুর যখন খেয়েছি, তখন দাম মেটাতেই হবে। বেশ তাই সই, আমার যাঁতাটাই নে, কিন্তু জানিস কী করতে হয় ওটা দিয়ে?'

গরিব বলে:

'উহুঁ, জানি না। দেখিয়ে দাও।'

হিইসি বলে, 'এ যাঁতা সাধারণ যাঁতা নয়। যা হুকুম করবি, তাই করবে যাঁতা। কেবল বলিস: 'পেষ তো, আমার যাঁতা!' আর যেই বলবি, 'বাস্ হয়েছে!' অমনি যাঁতা থেমে যাবে। এবার যা, পালা!'

হিইসিকে ধন্যবাদ দিয়ে ফিরতি পথ ধরলে গরিব ভাই।

বহুক্ষণ ধরে বন পাড়ি দিল সে। অন্ধকার হয়ে এল, বৃষ্টি নামল, শনশনিয়ে উঠল বাতাস, ডালপালার ঝাপটা লাগল মুখে চোখে। ঘরে পৌঁছল কেবল ভোর নাগাদ।

বউ বলে:

'সারা দিন সারা রাত কোথায় ঘুরে এলে? আমি তো ভেবে মরি, আর বুঝি দেখতেই পাব না!'

গরিব বলে:

'গিয়েছিলাম একেবারে হিইসির কাছে। দ্যাখ তার কাছ থেকে কী এনেছি!'

বস্তা থেকে সে যাঁতাটি বার করে হুকুম করে:

'পেষ তো, আমার যাঁতা! পিষে দে পরবের জন্যে যা দরকার!'

আপনা থেকেই ঘুরতে শুরু করল যাঁতা, যাঁতা থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল কত যে ময়দা, কত যে সুজি চিনি, কত মাছ মাংস। যা দরকার সব। বৌ তার বস্তা ভরে তোলে, গামলা ভরে সাজায়। গরিব তখন যাঁতার ওপরে আঙুলে টোকা দিয়ে বলে:

'বাস্ হয়েছে!'

অমনি থেমে গেল যাঁতা।

পরব উদ্‌যাপন করলে গরিব অন্যের চেয়ে খারাপ নয়। তখন থেকে দিনও তার কাটতে লাগল ভালোই। সুখের মুখ দেখল তারা, বৌ ছেলেমেয়েদের পরনে পোশাক, পায়ে জুতো, অভাব কিছু নেই।

ঘোড়াটির জন্যে গরিব একদিন বেশ কিছুটা ওট পিষে দিতে বললে যাঁতাকে। বাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াটি, ওট খাচ্ছে। ধনী ভাইয়ের হুকুমে সে সময় তার চাকর ধনীর ঘোড়াদের জল খাওয়ার জন্যে নিয়ে যাচ্ছিল সরোবরে। চাকর তাড়া দিচ্ছিল তাদের, ঘোড়াগুলো কিন্তু গরিব ভাইয়ের বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় থেমে গিয়ে একসঙ্গে ওট খেতে শুরু করলে।

নিজের বাড়ি থেকে তা দেখতে পেয়ে ধনী ভাই অলিন্দে এসে হাঁকে:

'শিগগির ফেরা ঘোড়াগুলোকে, পরের বাড়ির কী সব আবর্জনা খেতে শুরু করেছে!'

ঘোড়াগুলোকে ফিরিয়ে চাকর বলে:

'না হুজুর, আবর্জনা খাচ্ছিল না ঘোড়াগুলো, সরেস ওট খাচ্ছিল। তোমার ভাইয়ের বাড়িতে এত ওট, তাছাড়া আরও কত কিছু যে কী বলব!'

ধনী ভাইয়ের কৌতূহল হল।

বলে, 'যাই গিয়ে দেখে আসি: আমার ভাইয়ের ঘরে এত ধন এমন অবাক কাণ্ড ঘটল কী করে।'

গরিব ভাইয়ের কাছে গিয়ে শুধোয়:

'হঠাৎ তুই এমন ধনী হয়ে উঠলি কী করে বল তো? সব রকমের ধন তোর এত এল কোথা থেকে?'

গরিব ভাই কিছু লুকাল না। বলে, 'হিইসির কৃপায়।'

'সে কী?'

'ব্যাপার এই। পরবের আগে তুই যে আমায় গোরুর খুর দিয়ে বলেছিলি হিইসির কাছে যেতে, তা আমি তাকে গিয়ে খুরটা দিই। সেই খুরের বদলে হিইসি আমায় দেয় এই পয়মন্ত যাঁতা। আমি যা চাই তা এই যাঁতা আমায় দেয়।'

'দেখা তো আমায়!'

'বেশ, তোর যখন ইচ্ছে।'

যাঁতাকে হুকুম করলে গরিব ভাই নানা রকমের সুখাদ্য এনে দিতে। প্যাক দিল যাঁতা, ঘুরণ দিল — এক টেবল ভরে ঢেলে দিলে পিঠে আর মাংস ভাজা।

অবাক হয়ে, লোভে চোখ বড়ো বড়ো করে ধনী ভাই।

'যাঁতাটা আমায় বিক্রি কর!'

'উহু, বেচব না, আমার নিজেরই দরকার!'

ধনী ভাই কিন্তু নাছোড়বান্দা:

'যত টাকা চাই নে, ওটা আমায় বেচে দে!'

'না, বেচব না!'

ধনী দেখে, কিছুতেই সুবিধা হচ্ছে না, তাই অন্য দিক থেকে এগল।

বলে, 'ছি-ছি, তোর এতটুকু কৃতজ্ঞতা নেই! মনে আছে কে তোকে ঐ গোরুর খুর দিয়েছিল?'

'তুই।'

'তবেই দ্যাখ! আর যাঁতাটা দিতে তোর মায়া হচ্ছে! বেশ যদি বেচতে না চাস তো কিছু দিনের জন্যে দে।'

গরিব ভেবেচিন্তে বলে:

'বেশ তাই হোক, অল্প কয়েক দিনের জন্যে নে!'

খুশি হয়ে ধনী ভাই যাঁতাটি নিয়ে ঘরে এলে। জিজ্ঞেসও করলে না, থামাবার দরকার হলে কী ভাবে থামাতে হবে।

পরদিন সকালেই সে যাঁতাটি নিয়ে জাহাজ করে চলে গেল সমুদ্রে।

ভাবে: লোকে এখন নোনা মাছ তৈরি করছে, কিন্তু নুনের দাম আছে, আমি ঐ নুনের কারবার করব।'

সমুদ্রে গিয়ে যাঁতাকে হুকুম দেয়:

'পেষ তো, আমার যাঁতা! নুন দে আমায় বেশ অনেকখানি!'

ঘুরণ দেয় যাঁতা, পাক দেয় — নুন দিতে শুরু করে, ঝকঝকে সাদা পরিষ্কার নুন।

দেখে আর আনন্দ ধরে না ধনী ভাইয়ের, কত লাভ হবে তার হিসেব করে। অনেক আগেই যাঁতাকে থামানো উচিত ছিল, কিন্তু ধনী ভাই সব ভুলে কেবলি হাঁকে:

'পেষ, পিষে যা, থামিস না!'

জাহাজ ওদিকে নুনের ভারে তখন নামতে থাকে। ধনী কিন্তু সব জ্ঞান হারিয়ে কেবলি বলে:

'পেষ, পিষে যা!'

জল এদিকে গিয়ে উপচে পড়ছে, জাহাজ ডোবে ডোবে... হঠাৎ চৈতন্য হল ধনী ভাইয়ের, চেঁচাতে লাগল:

'থাম, পেষা থামা!'

যাঁতা কিন্তু পিষেই চলে। ধনী চ্যাঁচায়:

'থাম বলছি!'

যাঁতা কেবল পিষেই চলে, পিষেই চলে। ধনী ভাই ভাবলে যাঁতাটাকে তুলে ফেলে দেবে সমুদ্রে, কিন্তু ধরে ওঠাতে পারলে না: যাঁতা যেন পাটাতনের সঙ্গে একেবারে জুড়ে গেছে।

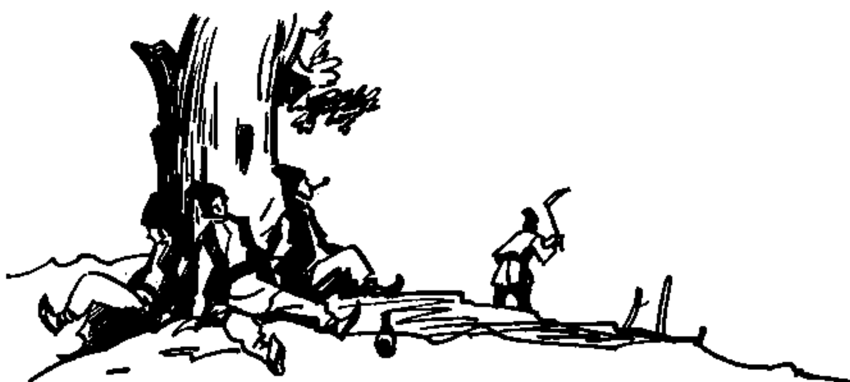
ধনী চ্যাঁচায়, 'বাঁচাও! বাঁচাও!' কিন্তু কে ওকে বাঁচাবে, কে সাহায্য করবে ওকে?

জাহাজ তার লোভী ধনীটিকে নিয়ে তলিয়ে গেল একেবারে সমুদ্রের অতলে। মারা গেল ধনী ভাই — সমাধি হল তার সাগরেই।

আর লোকে বলে, যাঁতাটা নাকি সাগরের তলেও থামে নি: কেবলি নুন পিষে চলেছে; তাই থেকেই নাকি সাগরের জল লোনা।

ছেলেদের পৈতৃক ধন লাভ

(মলদাভীয় কাহিনী)



এক লোক, তার তিন ছেলে। লোকটা ছিল উদ্যোগী, পরিশ্রমী, কখনো আলসেমি করে বসে থাকত না। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি খাটত, ক্লান্তি জানত না। সবই চলত ঠিকঠাক।

ছেলেরা তার বেশ বড়ো সড়ো, শক্ত সমর্থ, রূপবান, কিন্তু কাজে মন নেই।

মাঠে খাটে বাপ, বাগানে খাটে, ঘরে খাটে আর ছেলেরা ওদিকে গাছের ছায়ায় বসে বসে আড্ডা মারে নয়ত নিস্টার নদীতে চলে যায় মাছ ধরতে।

পড়শীরা জিজ্ঞেস করে, 'তোরা কখনো কাজ করিস না কেন বল তো, বাপকে কখনো সাহায্য করিস না?'

ছেলেরা বলে, 'খেটে কী হবে? বাবা আমাদের দেখছে, যা করবার বাবাই করছে।'

এইভাবেই বছরের পর বছর কাটল।

৮-৪০৬

ছেলেরা বড়ো হয়ে উঠল, বাপ হয়ে গেল বুড়ো, দেহ দুর্বল, আগের মতো আর খাটতে পারে না। বাড়ির বাগানটা পড়ে রইল, খেত ভরে গেল আগাছায়।

ছেলেরা দেখে কিন্তু কাজে নামে না।

বাপ বলে, 'অমন নিষ্কর্মার মতো বসে থাকিস কেন বল তো? যতদিন জোয়ান ছিলাম ততদিন খেটেছি, এবার তোদের পালা।'

ছেলেরা বলে, 'খাটবার সময় পরেও পাব।'

ছেলেরা এমন অলস দেখে দুঃখ হল বুড়োর। শোকে দুঃখে অসুখ হয়ে শয্যা নিল সে।

সংসার তখন একেবারে গরিব হয়ে পড়ল। ছিরিছাঁদ সবই গেল বাগানের। বিছুটি আর কাঁটা গাছ এমন গজিয়ে উঠল যে বাড়িখানাও ঢাকা পড়ে আর কি।

বুড়ো একদিন ছেলেদের ডেকে বললে:

'আমার তো কাল ঘনিয়ে এল, ছেলেরা। আমি না থাকলে চলবে কী করে তোদের? খাটতে চাস না, পারিসও না।'

ছেলেদের মনে ঘা লাগল, কাঁদলে তারা।

বড়ো ছেলে বললে, 'আমাদের কিছু একটা বলে যাও বাবা, তোমার শেষ উপদেশ দিয়ে যাও।'

বাপ বললে, 'তবে শোন! একটা গোপন কথা তোদের বলি। তোরা তো সবাই জানিস, আমি আর তোদের মা কখনো হাত গুটিয়ে বসে থাকি নি, দিন রাত খেটেছি। বহুদিন খেটেখুটে কিছু ধন সঞ্চয় করেছি তোদের জন্যে, এক কলসি সোনা। বাড়ির আশেপাশেই কোথাও সেটা পুঁতে রেখেছিলাম কিন্তু ঠিক কোথায় মনে পড়ছে না। আমার ওই গুপ্তধনটা খুঁজে বার করিস, তাহলে আর অভাব অনটন থাকবে না।'

ছেলেদের কাছে বিদায় নিয়ে মারা গেল বাপ।

ছেলেরা বাপের সৎকার করলে, শোক করলে। তারপর বড়ো ভাই বললে:

'বলছিলাম কি, খুবই তো দৈন্যদশায় পড়েছি, রুটি কেনারও পয়সা নেই। মরবার আগে বাবা কী বলেছিল মনে আছে? আয়, সেই সোনার কলসিটা খুঁজে দেখা যাক!'

কোদাল নিয়ে বাড়ির কাছেই একটা অল্পস্বল্প গর্ত খঁড়তে লাগল তারা। খোঁড়ে, খোঁড়ে কিন্তু সোনা-ভরা কলসি আর মেলে না।

মেজো ভাই তখন বলে:

'শোন বলি, এরকম করে খঁড়লে পৈতৃক ধন কখনো মিলবে না। বরং বাড়ির চারপাশের সমস্ত জমিটা খঁড়ে দেখি।'

ভাইয়েরা সায় দিল। ফের কোদাল ধরে তারা গোটা জমিটা খঁড়ে ফেললে কিন্তু সোনার কলস আর মেলে না।

ছোটো ভাই বলে, 'শোন, আর একবার সবটা খঁড়ে দেখি, কিন্তু আরো গভীর করে। বাপ হয়ত বেশ গভীরেই ওটা পঁতে রেখেছে।'

রাজী হয়ে গেল ভাইয়েরা। পৈতৃক ধন পাবার জন্যে খবেই তাদের গরজ।

ফের আবার কাজে লাগল তারা।

বড়ো ভাই খোঁড়ে খোঁড়ে, হঠাৎ তার কোদাল ঠেকল বড়ো সড়ো কঠিন কী একটা জিনিসে। বকে ঢিপ ঢিপ করে উঠল তার, আনন্দ আর ধরে না, ডাক দিল সব ভাইদের:

'শিগগির আয় তোরা, বাপের ধন পেয়েছি!'

মেজো ভাই ছোটো ভাই ছটে এসে সাহায্যে লাগল বড়ো ভাইয়ের।

খেটে খেটে মাটি থেকে তোলা হল সোনা ভরা কলসি নয়, ভারি মতো একটা পাথর।

ভারি ক্ষোভ হল তাদের। বলে:

'কী করা যায় এই পাথরটা নিয়ে? এখানে রেখে দেওয়া তো যায় না! চল, দরে গিয়ে কোথাও ফেলে আসি!'

তাই করা হল। পাথরটা ফেলে দিয়ে এসে ফের লাগল তারা মাটি খঁড়তে। খঁড়ল তারা সারা দিন ধরে, খাওয়া ভুলল, দাওয়া ভুলল, জিরোবার কথা মনে এল না। সারা জমিটা ফের খোঁড়াখঁড়ি করে দেখলে। মাটি হয়ে উঠল ভুরভুরে, নরম। সোনা ভরা কলসিটা কিন্তু পাওয়া গেল না।

বড়ো ভাই বলে, 'তা যখন জমিটা খঁড়েই ফেলেছি, তখন ওটাকে ফেলে রাখা তো চলে না। বলি কি, এ জমিতে আঙর গাছ পোঁতা যাক।'

৮·

ভাইয়েরা বলে, 'ঠিক বলেছ! খাটুনিটা অন্তত একেবারে জলে যাবে না।'

তাই আঙুর গাছ পুঁতে তারা সেগুলোর যত্ন আত্তি করতে লাগল।

কিছু দিন যায়। বেড়ে উঠল এক বড়ো সড়ো সুন্দর আঙুর বাগিচা। মিষ্টি মিষ্টি রসালো আঙুর ধরল তাতে।

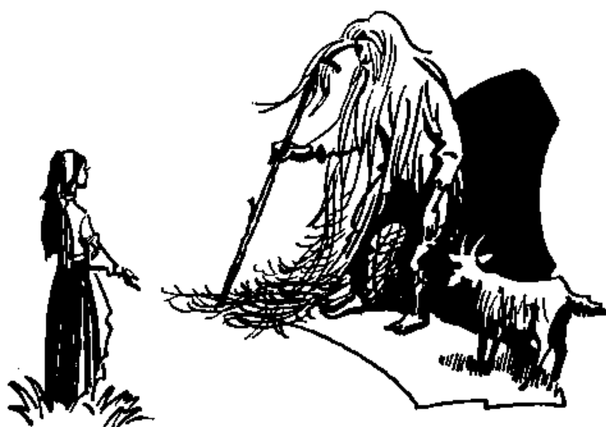
অঢেল ফসল তুললে ভাইয়েরা। নিজেদের যা দরকার রেখে বাকিটা বেচে দিলে, টাকা পেলে অনেক।

বড়ো ভাই তখন বললে:

'আমাদের গোটা জমিটা আমরা খামোকা খুঁড়ি নি, সত্যিই তা থেকে আমরা মহামূল্য ধন পেয়েছি, মরার আগে বাপ এই কথাই বলেছিল।'

বাসিলিক ফেৎ-ফ্রুমোস আর সূর্যের বোন ইলিয়ানা কসিনজ্যানা

(মলদাভীয় রূপকথা)



কাহিনী সেটা কাহিনী,
ঘটে নি যা, তা ঘটে নি;
তবু, কথা যখন রটে
তখন কিছু বটে।

এক যে ছিল চাষী আর চাষী-বউ, তাদের এক কন্যে, অরুণবরণ তার রূপ, সব গুণে গুণবতী, নিপুণ দুখানি হাত, বাসন্তী হাওয়ার মতো সে মেয়ে লীলাময়ী। কেমন করে কাজ করে তার দুখানি হাত, কেমন ঝলক তার চোখে, কেমন জ্বলে তার গাল দুখানি এ যেই দেখেছে, তারই মনে সারা জীবনের মতো গেঁথে গেছে তার ছবি। আর যাদের বয়স কম, তাদের বুক তো উথাল পাথাল।

একদিন ভারি সুন্দর দিন। দুটি কলসি নিয়ে সে গেল কুয়োয় জল আনতে। জল ভরে তার ইচ্ছে হল কুয়োর পারে খানিক বসে। কুয়োর মধ্যে তাকিয়ে দেখে

বাসিলিকের একটা ডাঁটি। কিছু না ভেবেই মেয়েটি সে ডাঁটি ছিঁড়ে গন্ধ শুঁকলে, বাসিলিকের সেই গন্ধ থেকেই অন্তঃসত্ত্বা হল মেয়েটি।

মা-বাপে মেয়েটিকে এমন লাঞ্ছনা গঞ্জনা দিলে যে সংসার তার কাছে বিষ হয়ে উঠল; ঠিক করলে চলে যাবে যেদিকে দুচোখ যায়। চুপি চুপি সে ঘর ছেড়ে চলে গেল: সেই যে গেল আর কোনো সন্ধান মিলল না।

ভয়ে, অভিমানে, মনের জ্বালায় মেয়েটি এতটুকু না জিরিয়ে যেতে যেতে পৌঁছল এক গহন বনে, এক গুহার সামনে। গুহায় একটু বিশ্রাম নেবে এই ভেবে যেই ঢুকতে যাবে অমনি গুহা থেকে কাশতে কাশতে বেরিয়ে এল এক থুত্থুড়ে বুড়ো, কুঁজ ভরা পিঠ, বাঁকা বাঁকা পা, হাঁটু পর্যন্ত দাড়ি, কাঁধ পর্যন্ত মোচ, গোড়ালি পর্যন্ত চুল।

চোখের ওপর ঝুলন্ত ভুরুটা যষ্টি দিয়ে তুলে ধরে বুড়ো শুধোয়, 'কে বট তুমি, হেথায় এলে কেমন করে?'

কাঁদলে মেয়েটি, ফোঁপালে, তারপর বললে কী হয়েছিল, কেন সে তার গুহায় এসে পৌঁছেছে।

তার কাহিনী শুনলে বুড়ো, করুণায় হৃদয় তার গলে গেল। মেয়েটিকে বসালে পাথরের আসনে, ভালোমন্দ কথায় সান্ত্বনা দিলে; রোদ পোড়া মাটি শীতল হয় বৃষ্টি জলে, আর বুড়ো মানুষের কথায় দুঃখের দিনে শান্ত হয় তরুণদের বুক: খুবই দরদ দেখিয়ে বুড়ো শান্ত করলে তাকে, রাজী করালে, কিছুদিন তার গুহায় থাকুক মেয়েটি।

এইভাবেই রইল তারা, মেয়েটি ভুলল তার দুঃখু — বুড়ো পেল তার বুড়ো-বয়সের অবলম্বন। রোজ সকালে গুহায় আসত তিনটে ছাগল। বুড়ো তাদের দুধ দুইত, তাতেই খাওয়া চলত ওদের।

কাল পূর্ণ হতেই একটি খোকা হল মেয়েটির, এমন গোলগাল সুন্দর যে তাকে দেখে সূর্যের মুখেও হাসি ফুটল। আর বুড়ো বেচারির যা আনন্দ সে কী বলি! পা তার নেচে নেচে ওঠে, বুক হয়ে উঠল জোয়ান কালের মতো তাজা। জন্মের পরেই ছেলেটিকে তারা সকালবেলার শিশিরে ধুইয়ে দিলে, যাতে কোনো কু তার মধ্যে বাসা না বাঁধতে পারে, আগুন আর লোহা দেখালে, যাতে সবকিছু বাধা

বিঘ্নের মধ্যে দিয়ে সে পেরিয়ে যায়, আর চিরকাল যেন থাকে লাল সূর্যের মতই নির্মল আর উজ্জ্বল। মা তারপর মন্ত্র পড়লে, যেন নির্ভীক হয় ছেলেটি, আর গুহার কোনা কানাচ থেকে বুড়ো খুঁজে বার করলে তার জোয়ান কালের খড়্গ আর মুষল — সেগুলি সে দান করলে ছেলেটিকে, যেন তার শুভ কাজে লাগে। নামদীক্ষায় খাওয়া দাওয়া খুব হল না বটে, কিন্তু হাসিখুশি হল অনেক, ছেলেটির সুখশান্তি দীর্ঘায়ু কামনা করলে তারা। বাসিলিক ডাঁটা থেকে হয়েছিল বলে বুড়ো তার নাম রাখলে বাসিলিক — আর মা তার সঙ্গে জুড়ে দিলে ফেত্-ফ্রুমোস — তার অমূল্য ছেলেটি তার চোখে ছিল অতি সুন্দর।

সময় যায়, বুড়ো যাত্রা করলে পরপারে, আর বড়ো হয়ে উঠল ছেলেটি, শিকারে যায়, মায়ের যা কিছু ইচ্ছে হয় সব পূরণ করার চেষ্টা করে। যত বড়ো হয় ছেলেটি, ততই সুখে ভরে ওঠে মায়ের জীবন, কথা দিয়ে কাজ দিয়ে সে মাকে খুশি করে, শান্ত করে।

যখন বেশ বড়ো হয়ে উঠল বাসিলিক, তখন সে শিকারে যেতে লাগল আরো দূরে দূরে, দেওদার বনে, ঘন অরণ্যে, ঘুরে বেড়াত যেদিকে চোখ যায়।

একদিন বাসিলিক গিয়ে পেঁৗছেছে এক উপত্যকার মুখে, দূরে তাকিয়ে দেখে যেন এক অঢেল সবুজ সরোবর, তাতে স্নান করছে সূর্য। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখল এক প্রাসাদ, খাঁটি সোনা আর মণিমুক্তা দিয়ে তৈরি, অপার এক ঘন সবুজ বনের মধ্যে খোঁচা খোঁচা খাড়া হয়ে আছে, ঝকমক করছে। এমন সুন্দর দৃশ্য জীবনে সে এই প্রথম দেখল। কোমরবন্ধের খড়্গ আর মুষল ঠিক করে নিয়ে সে এগুলো সোজা প্রাসাদের দিকে। প্রাসাদের দরজা জানলা খোলা, কিন্তু কাউকে দেখা যায় না, আশেপাশে একটি জনপ্রাণী নেই। মহলের পর মহল পেরিয়ে গেল সে, পেঁৗছুল আঙিনায়, ফের তাকিয়ে দেখল চারিদিকে — কেউ নেই। হঠাৎ শোনে বাসিলিক: গুরুগুরু করে উঠল বন, দুরুদুরু করে উঠল গাছপালা। বন থেকে বেরুল সাতটি মহাভয়ংকর ড্রাগন!

তাদের
ছাগমুণ্ড,
গাধার খুর,
নেকড়ের চোয়াল,
ঘোলাটে চোখ।

আসছে তারা থপথপিয়ে, কাঁধের ওপর হাত পা বাঁধা তিনটে মানুষ। হুড়মুড় করে সবাই ঢুকল প্রাসাদে, মস্ত এক কড়াইয়ের নিচে আগুন দিলে, তারপর জল ফুটতেই যে মানুষগুলোকে এনেছিল তাদের একটাকে ছেড়ে দিলে তার মধ্যে। সেদ্ধ করে তাকে নিমেষের মধ্যে খেয়ে শেষ করলে, হাড়টা গোড়টা পর্যন্ত পড়ে রইল না। বাকি দু'জনকেও ওরা তাই করলে, এমন গোগ্রাসে খেলে যে চিবুনোর শব্দ উঠতে লাগল।

বাসিলিক ফেত্-ফ্রুমোস দরজার ওপাশে লুকিয়ে থেকে উঁকি দিয়ে দেখে অবাক। হাপুস হুপুস করে খাচ্ছিল ড্রাগনগুলো, হঠাৎ ওদের একজনের নজর গেল বাসিলিকের ওপর। লাফিয়ে উঠে সে চ্যাঁচাল:

'চল রে সবাই, আঙিনায় চল! কড়াইয়ে পড়বে বলে আরো একজন জুটেছে সেখানে!'

ড্রাগনেরা সবাই লাফিয়ে উঠে ছুটল দরজার দিকে। বাসিলিক কিন্তু বাগিয়ে ধরে রাখল খড়্গ — যেই ওদের এক একজন চৌকাট পেরতে যায়, অমনি ঝপাং। মুণ্ডু খসে পড়ল ঘাড় থেকে। মেঝের ওপর ওপড়ানো বাঁধাকপির মতো গড়াগড়ি যেতে লাগল মাথা। একের পর এক ছ'টা ড্রাগনের মাথা নিলে সে। কিন্তু সাত নম্বরের ড্রাগনটার বেলায় খড়্গ তার চলল না। খড়্গের ধারাল দিকটা দিয়ে কোপ দিলে তার গলায়, খড়্গের পিঠ দিয়ে বাড়ি মারলে তার খুলিতে, খোঁচা মারলে একেবারে বুকের মধ্যে, কিন্তু কিছুই হল না। বাসিলিক ফেত্-ফ্রুমোস তখন চকিতে ভেবে নিয়ে তার মুষলটা ঘুরিয়ে এমন এক ঘা মারলে ড্রাগনের মাথায় যে তার চোখ অন্ধকার হয়ে এল। টলতে টলতে, দেয়ালে মাথা ঠুকতে ঠুকতে পিছোল ড্রাগন, প্রাসাদের একেবারে শেষ ঘরটায় গিয়ে মেঝের চোরকুঠরির দরজাটা খুললে,

তারপর শ্যাওলা আর মাকড়সার জালে ভরা একটা সিঁড়ি দিয়ে কেবলি নামতে লাগল নিচের দিকে। বাসিলিক কিন্তু তাকে থামতে দেয় না, ছোটে তার পিছু পিছু। বারোটা লোহার দরজা পেরিয়ে পৌঁছুল একেবারে তলের কুঠরিতে। ড্রাগন তখন একেবারে সেঁধিয়ে গিয়ে ঠেস দিয়ে রইল দেয়ালের সঙ্গে, দু'চোখ বেরিয়ে আসে আর কি, হাঁ হয়ে আছে সব দাঁত, ভয়ের ঠেলায় এই বুঝি বুকই ফাটে। বাসিলিক তাকে রেহাই দিয়ে দরজা বন্ধ করে, ভারি ভারি হুড়কো তুলে দিয়ে ওপরে উঠে গেল। যাবার পথে বারোটি দরজার সবকটিকে সে বন্ধ করলে, আর শেষ দরজাটিতে দিলে কুলুপ। কুলুপ এঁটে চাবিটি কোর্তার ভেতর ঢুকিয়ে বাড়ি ফিরল হৃষ্টমনে — যাক, একটা ভালো কাজ হয়েছে।

খুবই আনন্দ করে সে গুহায় ফিরে মাকে বললে:

'চলো মা, এ গুহা ছেড়ে অন্য জায়গায় গিয়ে থাকব। বড়ো সড়ো চমৎকার একটি প্রাসাদ পেয়েছি।'

খুশি হয়ে বাসিলিকের সঙ্গে মা এল সেই সোনা দানায় তৈরি পুরীতে, বসলে সেখানে মালিক হয়ে।

বাসিলিক ফেত্-ফ্রুমোস বলে, 'এ সবই এবার আমাদের। কিন্তু দেখো, কোনোক্রমেই যেন শেষ ঘরখানার দরজা খুলো না। সেখানে একটা ড্রাগন আছে এখনো।'

'ভাবনা নেই রে! তোকে যখন ওটা খেতে এসেছিল, তখন ও দরজা তালাবন্ধই রাখব আমি।'

চাবিটি নিয়ে মা রুমালে জড়িয়ে দশ গিঁট বাধলে, তারপর এমন করে লুকিয়ে রাখলে যে সারা জীবনেও তা খুঁজে পাবে না।

প্রাচুর্যের শিঙা থেকে যেন এবার ধনধান্যে ভরে উঠল তাদের জীবন। পুরীখানাও তাদের অপরূপ, শিকারও মেলে প্রচুর, চারিদিকের দৃশ্যও ভারি সুন্দর।

একবছর নয়, দুইবছর নয়, এইভাবেই দিন কাটল তাদের। কিন্তু বসন্ত যেমন না বলতে না কইতে হঠাৎ নিয়ে আসে সোহাগী গরম, তেমনি আবার আচমকাই দুনিয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ঝড়, সবকিছু ভেঙে চুরে তছনছ করতে চায়।

সাত ড্রাগন এসেছিল আরেক রাজ্য থেকে। তাদের পুষেছিল বুড়ি ডাইনী ক্রোয়ান্‌ৎসা — দেহ তার অঙারের মতো কালো, মনে তার এমন বিষ যে চোখের দৃষ্টিতে পৃথিবী পুড়ে যায়। ডাইনী অপেক্ষার পর অপেক্ষা করে, ড্রাগনেরা ফিরে আসবে। কিন্তু যখন দেখলে, সময় পেরিয়ে গেল, ড্রাগনেরা ফিরল না, তখন দুর্ভাবনায় বুক তার পোড়া পোড়া। আগুনে পোড়া সাপের মতো আকুলি বিকুলি করতে লাগল ক্রোয়ান্‌ৎসা, ভয়ঙ্করী পাগলীর মতো ছুটে গেল তাদের পুরীতে — দেখবে কী হয়েছে।

এসে টের পেলে কী ঘটেছে ড্রাগনদের। দুই হাতে মাথা চেপে বসে রইল সে।

তারপর খেপে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে বাসিলিকের মায়ের ওপর, চাবিটি কেড়ে নিলে তার কাছ থেকে, তারপর গায়ের সব জোর দিয়ে তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে সেই তলকুঠরিতে, আর ড্রাগনকে বার করে এনে একের পর এক বন্ধ করে দিলে বারোটি দরজা।

ড্রাগনের সঙ্গে তখন পরামর্শ করতে বসল ডাইনী: কেমন করে প্রতিশোধ নেবে, বাসিলিকের জীবন ঘুচিয়ে দেবে।

'লড়তে ডাক ওকে!'

ড্রাগন বলে, 'উহু, ভয় করে। ওর ঘা আমার চেয়ে অনেক জোরালো। বরং বলি কি: ভালোয় ভালোয় পালিয়ে যাই চলো; ওর চোখে পড়লে আর নিস্তার নেই — তোমারও নয় আমারও নয়।'

'তবে আমার ওপরেই ভার ছেড়ে দে। এমন ঘোরান ওকে ঘোরাব যে সাপের গর্তে গিয়ে ঢুকবে, নিজে থেকে মরণ ডাকবে।'

এই বলে সে ড্রাগনকে লুকিয়ে রাখল আর নিজে বনবন করে ঘুরতে ঘুরতে বাসিলিক ফেত্‌-ফ্রুমোসের মায়ের রূপ ধারণ করলে। তারপর ভান করলে যেন ভারি অসুখ, ভয়ানক কষ্ট আর পথ চেয়ে রইল বাসিলিকের।

একদিন যায়, দুইদিন যায়, বাসিলিক ফিরল শিকার থেকে। দুয়োরে পা দিতেই ডাইনী কোঁথায় কোঁকায়।

'কপালে আমার মরণ বাছা, সেই যে গেলি আর কোনো পাত্তা নেই। তাড়াতাড়ি

বাড়ি ফেরার কথাও মনে থাকে না তোর। এদিকে আমার যে ভারি ব্যামো, কেউ নেই একটু দেখে শোনে। অন্তত একটি ফোঁটাও যদি পাখির দুধ পেতাম তাহলে ব্যামো দূরে যেত, উঠে হেঁটে বেড়াতে পারতাম।'

মায়ের গুরুতর অসুখের কথা শুনে মন খারাপ হয়ে গেল বাসিলিক ফেত্-ফ্রুমোসের। একটি কলসি নিয়ে সে মাকে বললে শিগগিরই ফিরবে, এই বলে বেরিয়ে গেল পাখির দুধের খোঁজে।

চলল সে, চলল পাহাড় পেরিয়ে, উপত্যকা পেরিয়ে, শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছল এক পুরীতে। তোরণে ধাক্কা দিলে, ভেতর থেকে শোনা গেল একটি মেয়ের গলা:

'যদি সুজন হও — এসো, যদি কুলোক হও তাহলে চলে যাও, আমার কুকুরেরা তোমায় টুকরো টুকরো করে ফেলবে।'

'তোরণে তোমার সুজনেই করাঘাত করছে, দেবী,' বললে বাসিলিক ফেত্-ফ্রুমোস।

তোরণ খুলে গেল। বাসিলিক দেখলে দরজা জানলা খোলা একটি সুন্দর ভবন। ভেতরে ঢুকল সে।

'কুশল হোক।'

'কুশল হোক,' বললে মেয়েটি। সে কী কন্যে — চন্দ্র, সূর্য, ঊষা সবই ম্লান হয়ে যায় তার রূপের কাছে।

মাথা নুইয়ে বাসিলিক ফেত্-ফ্রুমোস বললে:

'যদি অনুমতি দাও তবে রাতটা এখানে কাটাই। অনেক পথ হেঁটে এসেছি, অনেক পথ এখনো বাকি।'

মেয়েটি বললে, 'সানন্দে।' নক্সী গালিচার ওপর তাকে বসিয়ে অতিথিবৎসল গৃহিণীর মতো নানা রকম ভালোমন্দ খাবার দিয়ে তার আপ্যায়ন করলে।

খাবার টেবিলে কথার পিঠে কথা দিয়ে আলাপ চলল। বাসিলিক ফেত্-ফ্রুমোস তাকে বললে পথে নেমেছে সে কীসের জন্যে। জিজ্ঞেস করলে:

'আচ্ছা, বলতে পারো, পাখির দুধ পাওয়া যাবে কোথায়?'

'যদ্দিন বেঁচে আছি তার মধ্যে এমন খাদ্যের কথাও শুনি নি, এমন ওষুধের

কথাও শুনি নি। কিন্তু তুমি যখন সুলোক, তখন তোমার উপকার করব। জেনে নেব। কিছুক্ষণ পরে আমি যাব আমার ভাই লাল সূর্যের কাছে। পৃথিবীর কোথায় কী আছে সে সব জানে।'

এই করেই তো বাসিলিক ফেত্-ফ্রুমোসের দেখা হয় সূর্যের বোন ইলিয়ানা কসিনজ্যানার সঙ্গে।

পথিক যখন ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল তখন ইলিয়ানা কসিনজ্যানা গেল তার ভাইয়ের কাছে, জিজ্ঞেস করলে:

'বল তো ভাই, পৃথিবীর কোথায় আছে পাখির দুধ?'

'অনেক দূরে বোন, পাখির দুধ এখান থেকে অনেক দূরে। যেতে লাগবে অনেক হপ্তা — সোজাসুজি পূব মুখে তামা পাহাড় পেরিয়ে। সে দুধ মেলা অসম্ভব, কেননা সে পাখি এক অদেখা দানব — এক একটা ডানা তার মেঘের মতো। আশেপাশে কাউকে পেলেই ধরে নিয়ে যায় তার বাসায়, ছানারা তাকে ঠোঁটে কেটে কুটিকুটি করে।'

পথিক নিশ্চিত মরণের মুখে চলেছে এই ভেবে সূর্যের বোনটির যেমন ভয় হল তেমনি মায়া হল। ঠিক করলে সাহায্য করবে ওকে। সকালে সে আস্তাবল থেকে বারোটি পাখাওয়ালা একটা ঘোড়া এনে দিলে বাসিলিককে।

'এই ঘোড়াটি নাও সুজন, তোমার কাজে লাগবে, বিপদ থেকে বাঁচাবে। আর কাজ হাসিল হোক না হোক, ফেরার পথে দেখা করে যেয়ো।'

এই অমায়িক অপরূপা মেয়েটির পায়ে হৃদয় তুলে দেবার ইচ্ছে হয়েছিল বাসিলিক ফেত্-ফ্রুমোসের। আবেগ ভরে সে ধন্যবাদ জানালে তাকে, তারপর ঘোড়ায় চেপে যাত্রা করলে।

পথ তার
পেরিয়ে গিরি
কান্তার,
ঘেসো পথের গোপনে
অপার বনের গহীনে।

চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত দেখে দূরে যেন একটা তামার দেয়াল। যত কাছে আসে সে দেয়াল ততই বড়ো হতে হতে হল পাহাড়, পাহাড় থেকে এক মস্ত পর্বত। তামার পাহাড়ের নিচে এসে যখন সে তাকাল, দেখে শিখর তার আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে। তেমন পর্বত হামেশা দেখা যায় না। পাহাড়টার দিকে চাইলে বাসিলিক, তল থেকে শিখর পর্যন্ত নজর করে দেখলে, কেবল তখনই চোখে পড়ল আকাশের একেবারে উঁচুতে এক মস্ত পাখি, ডানা তার কালো মেঘের মতো। পাক খেয়ে খেয়ে উড়ে পাখিটা একপাশে সরে গিয়ে দৃষ্টির ওপারে চলে গেল।

বাসিলিক ফেত্-ফ্রুমোস তখন লাগাম টেনে ঘোড়া ছোটালে পাহাড়ের ওপর। খটাং খট্! খটাং খট্! ঘোড়া ছুটল শিখর থেকে শিখরে লাফিয়ে, নিয়ে গেল ওকে একেবারে ডগায়; তাকিয়ে দেখে এক আশ্চর্য কান্ড: তামার বাসায় বসে আছে ছানারা, এখনো ডানা গজায় নি, দেখতে এক একটা ষাঁড়ের মতো, ক্ষিদেয় প্রাণপণে চ্যাঁচাচ্ছে। চারিদিকে চেয়ে বাসিলিক দেখলে তামার গায়ে একটা খাদ, সেখানে ঘোড়া সমেত লুকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ যেতেই উড়ে এল পাখিটা, বাসা থেকে বাসায় উড়ে উড়ে দুধ খাওয়াতে লাগল ছানাদের। যে বাসাটার কাছে লুকিয়ে ছিল বাসিলিক সেখানে পাখিটা উড়ে আসতেই, বাসিলিক সাহস করে তার কলসিটা বার করে ধরলে, পাখির দুধও এসে পড়ল তাতে। দুধ নিয়েই সে ঘোড়ায় লাফিয়ে উঠে প্রাণপণে হাঁকালে। ক্ষিদেয় ছানাটা ফের কঁকিয়ে উঠতেই পাখিটা চেয়ে দেখে — বাসিলিক। প্রেতের মতো পাখিটা পিছু ধাওয়া করলে তার, কিন্তু নাগাল ধরতে পারলে না, কেননা পাখির কেবল এক জোড়া ডানা, আর বাসিলিকের ঘোড়ার ডানা ছয় জোড়া। ঘোড়া তাই উড়ে গেল অনেক তাড়াতাড়ি।

ফেরবার সময় ফের সেই

পথ তার
পেরিয়ে গিরি
কান্তার,
ঘেসো পথের গোপনে
অপার বনের গহীনে।

চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত পৌঁছল ইলিয়ানা কসিনজ্যানার কাছে। মেয়েটি তাকে আনন্দ করে অভ্যর্থনা করলে, বললে একটু বিশ্রাম করে যাক। বাসিলিক ফেত্-ফ্রুমোস খেল দেল, বিছানায় শুল। আর কসিনজ্যানা জানত ব্যাপার কী, তাই পাখির দুধটা লুকিয়ে রেখে কলসির মধ্যে ঢেলে দিলে গরুর দুধ।

ঘুম থেকে উঠে, কলসিটি নিয়ে ফেত্-ফ্রুমোস বলে:

'আমার ওপর তোমার মায়ার শেষ নেই বোন, এ বাড়িতে রাত কাটালে ভালোই হত, কিন্তু এবার যাত্রা করতে হয়, মা আমার অসুখে পড়ে, পথ চেয়ে আছে।'

কসিনজ্যানা ওকে বলল:

'কী আর বলব বীর, যাত্রা শুভ হোক, তবে পরের বার আমার এখানে আসতে ভুলো না।'

বাসিলিক ফেত্-ফ্রুমোস তাকে অভিবাদন করে বিদায় জানিয়ে চলে গেল। এসে পৌঁছল পুরীতে। ডাইনী টের পেলে, বন্‌বন্ করে ঘুরতে লাগল সে — আগুনে যেন জ্বলে পুড়ে যেতে লাগল। ছুটে গিয়ে বিছানায় পড়ে কোঁকাতে লাগল, কোঁথাতে লাগল, যেন এই মরে সেই মরে:

'উঃ মা গো! উঃ মা গো!'

বাসিলিক চৌকাট পেরতেই তাকে জিজ্ঞেস করে:

'বাছা আমার, ফিরেছিস ভালোই হয়েছে। কতদিন যে পথ চেয়ে আছি। ওষুধ আনলি আমার?'

'এনেছি,' বলে বাসিলিক ফেত্-ফ্রুমোস এগিয়ে দিল তার কলস।

ডাইনী সে কলস মুখে তুলে সবখানি দুধ খেয়ে নিলে।

'ধন্যি বাছা, এবার একটু ভালো বোধ হচ্ছে।'

তারপর ঘুমুতে গেল। কিন্তু চোখ আর বোজে না, কেবলি ভাবে: এমন কোথায় ওকে পাঠানো যায় যে তার স্মৃতিটা পর্যন্ত লোপ পাবে। ভাবে, ভাবে, তারপর হঠাৎ ছটফট করতে শুরু করে, যেন আরো জবর একটা ব্যামোয় ধরেছে, ছটফট করে আর কোঁকায়:

'উঃ মা গো, আমায় ফের ব্যামো ধরেছে, বাছা। স্বপ্নে দেখলাম, বনশুয়োরের বাচ্চার মাংস খেলে যেন ভালো হয়ে উঠব।'

'বলো কী, আমি তাহলে চললাম সে মাংস আনতে। তুমি কেবল ভালো হয়ে ওঠো।'

ঘোড়ায় চেপে ও ফের যাত্রা করলে। যায়, যায়, যেতে যেতে গিয়ে পেঁছল ইলিয়ানা কসিনজ্যানার কাছে।

'অতিথ এসেছি, বরণ করবে কি?'

'এসো এসো, সানন্দে বরণ করছি।'

বিশ্রাম নিতে বসল বাসিলিক, কসিনজ্যানাকে বললে, ফের কী বিপদে পড়েছে সে।

'বলতে পারো, কোথায় পাব বনশুয়োরের বাচ্চা? ফের ব্যামো ধরেছে মা'র, বলে, কেবল নাকি বনশুয়োরের বাচ্চার মাংসেই সে বাঁচবে।'

'আমি তো জানি না, এখন তুমি জিরিয়ে নাও, সন্ধ্যায় আমি জেনে নেব আমার ভাই সূর্যের কাছে, সে নিশ্চয় জানে, অত উঁচু থেকে সে সব দেখতে পায়, সব জানে।'

বাসিলিক ফেত্-ফ্রুমোস রাত কাটাবার জন্যে রয়ে গেল সেখানে। আর সন্ধ্যার দিকে সমস্ত কিরণ গুটিয়ে রেখে বিশ্রাম নিতে এল ইলিয়ানার ভাই।

'বনশুয়োরের কথা শুনেছিলাম একটা। বলতে পারো ভাই, পৃথিবীর কোন এলাকায় থাকে তারা?'

'দূরে বোন, এখান থেকে অনেক দূরে। সোজাসুজি একেবারে উত্তরে, ফুটফুটে ফুলভরা মাঠ পেরিয়ে, মস্ত এক দেওদার বনে।'

'ঝলসানোর জন্যে তার একটা বাচ্চা ধরা যায় কী করে?'

'সে ধরা অসম্ভব, বোন। যে দেওদার বনে তারা থাকে সেখানে আমার কিরণ পর্যন্ত পেঁছতে পারে না, মানুষের পা পেঁছবে কী করে? আমি ওদের যা দেখি সে কেবল ভর দুপুরে, যখন ওরা ফাঁকায় বেরিয়ে এসে জলায় গড়াগড়ি দেয়। ভয়ানক ধারালো ওদের দাঁত, যেই আসুক ছিঁড়ে কুটিকুটি করবে।'

কথাগুলো ইলিয়ানা কসিনজ্যানা জানিয়ে দিলে বাসিলিককে: কোন পথে

যেতে হবে, কী আছে কপালে জেনে বাসিলিক ঘোড়ায় উঠে যাত্রা করলে। চলল সে, চলল গিরি ডিঙিয়ে, কান্তার পেরিয়ে, নদী পেরিয়ে, খাদ পেরিয়ে, ফুটফুটে মাঠ পার হয়ে পেঁছিল দেওদার বনে। বনের মধ্যে ঢুকল সে, ঘুটঘুটে অন্ধকার সেখানে পাতাল পুরীর মতো। ঘোড়া তখন সবচেয়ে উঁচু উঁচু গাছেরও মাথা ছাড়িয়ে উড়তে লাগল। হঠাৎ বাসিলিকের চোখে পড়ল সেই জলাটা — যার কথা তাকে বলেছিল কাসিনজ্যানা। সূর্য যেই দুপুরে এসে পেঁছেছে অমনি প্রচণ্ড ঘোঁৎ ঘোঁৎ শোনা গেল, কাদায় গড়াগড়ি দেবার জন্যে বেরিয়ে এল শুয়োরের পাল। একটা চমৎকার শুয়োরের বাচ্চা দেখেশুনে বাসিলিক তাকে খপ করে ধরে ঘোড়ায় চেপে, দে চম্পট। শুয়োরের পাল দেখতে পেয়েই পিছু ধাওয়া করে তার, নাক বাগিয়ে ধরতে চায়, রাগে মাটি খায়। বাসিলিক ফেত্-ফ্রুমোসের ঘোড়াটি যদি অমন ত্বরিৎ না হত, তাহলে ওইখানেই নিজের হাড় ক'টি রেখে আসতে হত তাকে। বনশুয়োরের ধারালো দাঁত থেকে বাঁচালে তাকে ঘোড়ার ছুট। তারপর দুলকি চালে চলল ঘোড়া, বাসিলিক ফেত্-ফ্রুমোসও গান ধরলে, আনন্দ তার ধরে না, নির্বিঘ্নে কাজ হাসিল হয়েছে।

ফেরার পথে ও আবার এল ইলিয়ানা কসিনজ্যানার কাছে। আগের মতই জিরিয়ে নেবার জন্যে থাকলে। ও যতক্ষণ খাচ্ছে দাচ্ছে, মধুর স্বপ্ন দেখছে, সূর্যের বোন ততক্ষণে বনশুয়োরের বাচ্চাটি বদলিয়ে সে জায়গায় রেখে দিলে একটা মামুলী, ঘরোয়া শুয়োর, তারপর কোনো কথা ফাঁস না করে অমায়িকভাবে বিদায় দিলে।

ঘরে ফিরল বাসিলিক ফেত্-ফ্রুমোস। তাকে দেখতে পেয়ে এমন দাঁত কড়মড় করলে ডাইনী যে আগুনের ফুলকি বেরুতে লাগল; যাই হোক নিজেকে সংযত করে সে বাসিলিকের কাছে ভান করলে যেন মরণ ব্যাধিতে ধরেছে।

'আহা রে বাছা, আবার তোকে দেখতে পেলাম, ধন্যি তোকে। আর কিছু দেরি হলে আমায় আর জ্যান্ত দেখতে পেতিস না। শিগগির করে শুয়োরছানাটাকে মার, মাংস খেতে দে আমায়।'

বাসিলিক ফেত্-ফ্রুমোস শুয়োরছানাটিকে শূলে বিঁধিয়ে, আগুনে পুড়িয়ে বেশ ভালো রকম ভাজা ভাজা করে এনে দিলে মাকে।

'এই তো, এখন যেন একটু ভালো বোধ হচ্ছে, চোখে দৃষ্টি ফুটছে,' ডাইনী ভান করলে যেন চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। তারপর সবখানি খাওয়া শেষ হলে ফের আহা উহু করতে লাগল, আগের চেয়েও বেশি করে:

'উহু রে, বাছা আমার, বেচারা আমার, দূর দেশের পথে ঘাটে, পাহাড় পর্বতে ঘুরে এলি তুই, কিন্তু যদি চাস ব্যামো থেকে সেরে উঠি, তাহলে আর একবার যা বাছা, জীয়ন জল মরণ জল যদি না আনতে পারিস তাহলে আর বাঁচব না।'

'তাই চললাম মা,' এই বলে বার্সিলিক ফেত্-ফ্রমোস ফের যাত্রা করলে।

যায়, যায় আর মনের মধ্যে জ্বালা পোড়া করে — মা যা চেয়েছে তা পাওয়া যাবে কোথায়? মুখ ভার করে এসে পৌঁছল ইলিয়ানা কসিনজ্যানার কাছে, সখেদে বিলাপ করতে লাগল:

'আদরের বোনটি আমার, দ্যাখো আবার অগম পথে নামতে হয়েছে। কোনো ওষুধেই মা'র ব্যামো সারছে না, আমায় এবার পাঠিয়েছে জীয়ন জল মরণ জল আনতে। বলতে পারো, এ জল পাওয়া যাবে কোথায়, কী উপায়ে তা মিলবে?'

'বসো একটু, জিরিয়ে নাও। এবারেও হয়ত সাহায্য করব তোমায়।'

সন্ধ্যার দিকে সে গেল তার ভাইয়ের কাছে, ভাই তখন সবেমাত্র ফিরেছে।

'সূর্য ভাই, আকাশ থেকে সারা পৃথিবীই তো তোমার চোখে পড়ে। বলতে পারো, কোথায় আছে জীয়ন জল মরণ জল?'

'দূরে বোন, এখান থেকে অনেক দূরে, তিনগুণো নয় দেশ পেরিয়ে, তিনগুণো নয় সাগর পেরিয়ে প্রান্তরিকা দেবীর রাজ্যে। কিন্তু সে জলের জন্যে যত লোক গেছে কেউ বেঁচে ফিরে আসে নি, কেননা এক ভয়ঙ্কর ড্রাগন আছে সে রাজ্যের সীমানায়, ঢুকতে দেয়, বেরতে দেয় না। জল খায় সে নিজে, আর প্রাণ নেয় যত সাহসীদের। তাদের হাড়গোড় আজ কদ্দিন ধরে সেখানে পড়ে পড়ে শুকচ্ছে।'

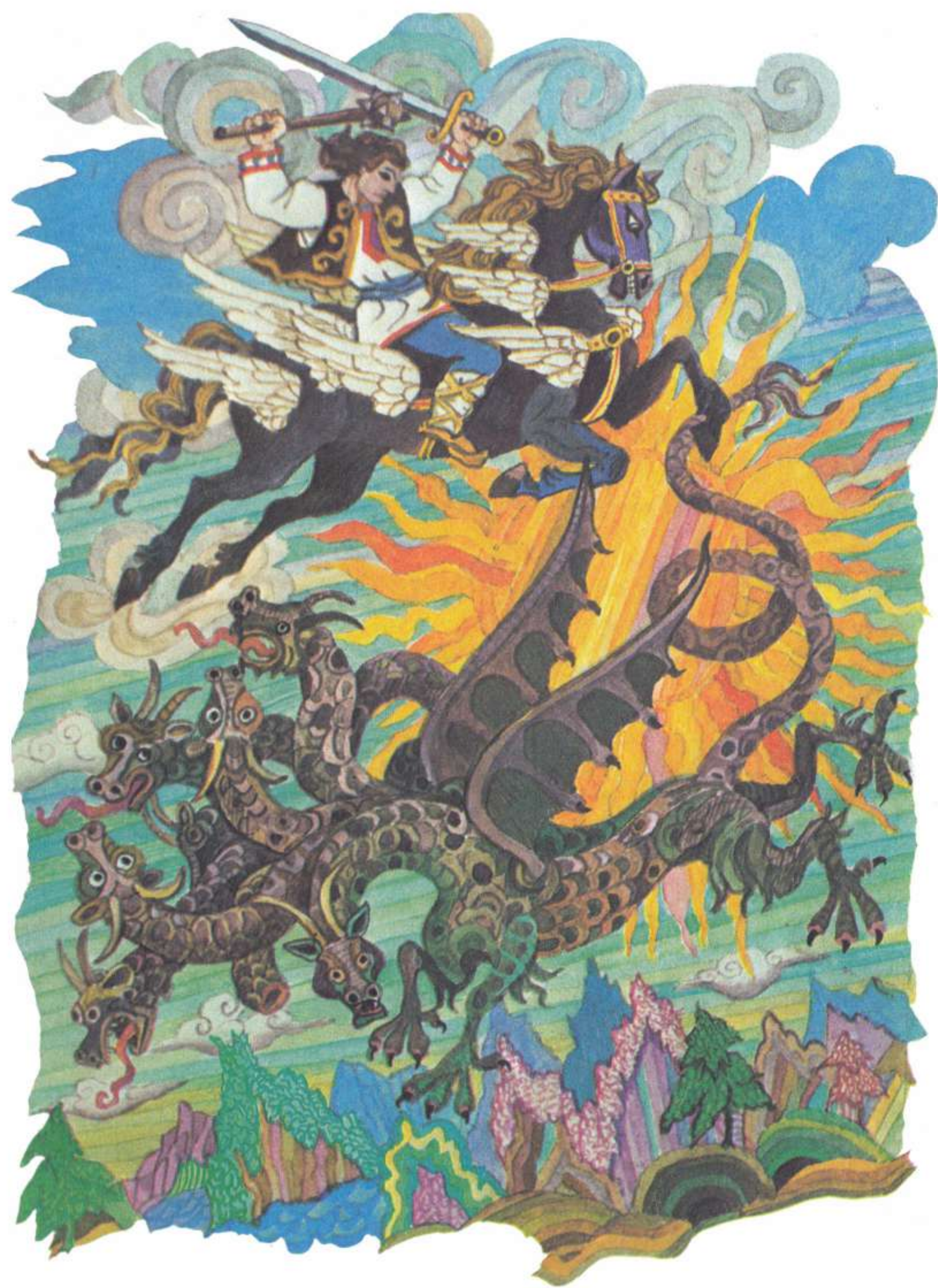
কোন দিকে যেতে হবে, কী আছে তার কপালে সব শুনলে বার্সিলিক কিন্তু ভয়ে পেছল না, কেবল কোমরবন্ধের খড়্গ আর মুষল ঠিক করে নিয়ে বিদায় নিলে

কন্যের কাছে, তারপর ঘোড়ায় উঠে যাত্রা করলে। লম্বা পথ, একবারও না থেমে সে হাঁকিয়ে চলল, সাগর পড়লে ঘুরে যেত, কত রাজ্যের সীমানা পেরল গুনত। এমনি করে সে পেরিয়ে এল তিনগুণো নয় সাগর তিনগুণো নয় দেশ তারপর পৌঁছল এক আশ্চর্য রাজ্যে — তিনগুণো সুন্দর সে দেশ। একটি শুকনো ডাল নেই কোথাও, একটি মরা ঘাস নেই। বাড়বাড়ন্ত গাছ, ফুটফুটন্ত ফুল, অঢেল ফল। রাজ্যময় ঘুরে বেড়ায় সে, যা দেখে তাতেই আনন্দে ভরে ওঠে মন; ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পৌঁছল দুই শিলার কাছে, দুটি ঝর্ণা উঠছে সেখান থেকে। 'এই তো সেই ঝর্ণা যার খোঁজে এসেছি।' এই ভেবে সে পরখ করার জন্যে একটা ফড়িং ধরে তাকে টুকরো টুকরো করে একটা ঝরনায় ডোবাল, ফড়িং অমনি আগের মতো জোড়া লেগে গেল, তারপর তাকে অন্য ঝরনাটায় ডোবাল, ফড়িং অমনি বেঁচে উঠল। খুশি হয়ে উঠল বীর, ঝরনা থেকে দুই ভিস্তি জল নিয়ে সে চলল ফিরতি পথে। কিন্তু রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত যেই পৌঁছেছে, অমনি আশেপাশের গাছপালা যেন ঝড়ে দুলে উঠল, অন্ধকার হয়ে এল আকাশ, প্রচণ্ড রাগে লেজ ঝটপট করে তার সামনে এসে দাঁড়াল এক দশমুণ্ডু ড্রাগন।

বাসিলিক ফেত্-ফ্রুমোস এক হাতে মুষল অন্য হাতে খড়্গ চেপে ধরে দাঁড়াল। ড্রাগন তার দিকে একটা মাথা এগিয়ে আসতেই মুষল দিয়ে বাড়ি মারল বাসিলিক, খড়্গ দিয়ে কেটে ফেলল। দ্বিতীয় মাথাটার বেলাতেও তাই করলে, তৃতীয় মাথাটাও... ড্রাগন দেখে তার মৃত্যু ঘনিয়েছে, তাই উড়ে পালাল আকাশে। কিন্তু বীরের ঘোড়া উড়ল তার চেয়েও উঁচুতে। ড্রাগনের দশমুণ্ডু সব কেটে দিয়ে বাসিলিক তাকে মাটিতে আছড়ে ফেলল।

তারপর অবাধে সে চলল এগিয়ে, গিয়ে পৌঁছল ইলিয়ানা কসিনজ্যানার কাছে। জবর লড়াই আর লম্বা পাড়ির পর বিশ্রাম নেবার জন্যে শুল বাসিলিক, আর ইলিয়ানা কসিনজ্যানা ভিস্তিদুটো নিয়ে জল বদলিয়ে আগের মতোই রেখে দিল।

ইলিয়ানা কসিনজ্যানা বাসিলিককে অত সব সাহায্য করেছে, তাই তাকে সন্দেহ করার কোনো কারণই ছিল না বাসিলিকের। ভালো করে জিরিয়ে নিয়ে ঘোড়ায় চেপে রওনা দিলে বাসিলিক।



বাসিলিককে ফিরতে দেখে মুখ কালো হয়ে উঠল ডাইনীর। রাগের জ্বালায় বুক ভরে উঠল বিষে। একটু জল খেয়ে ধাতস্থ হয়ে সে ফের ভেবে দেখতে লাগল, কী উপায়ে ধরা থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় বাসিলিককে।

যাত্রার পর কিছুটা জিরিয়ে নিতে দিলে বাসিলিককে, তারপর তাকে ডেকে সোহাগ করে বললে ডাইনী:

'আদরের বাছা আমার, কত পথঘাট ঘুরে এলি তুই, শক্তি তোর অনেক ক্ষয়ে গেছে নিশ্চয়। দেখি তো, এই রেশমী দড়িটা তুই ছিঁড়তে পারিস কিনা।'

এই বলে রেশমী দড়ি দিয়ে ডাইনী তাকে বাঁধলে।

'নে, এবার দম লাগা, খোলা দুনিয়া অগম পথে ঘুরে ঘুরে শক্তি তোর ক্ষয়েছে কিনা দেখি।'

বাসিলিক ফেত্-ফ্রুমোস টান দিতেই কুটিকুটি হয়ে ছিঁড়ে গেল দড়ি।

'আয় দেখি, দুটো দড়ি ছিঁড়তে পারিস কিনা?' ফের দড়ি বাঁধতে বসল ডাইনী।

কিন্তু দুই দড়িও ছিঁড়ে ফেললে বাসিলিক।

'জোর আছে কিছু, সাবাস জোর আছে বটে। আয় দেখি, যেমন জোর ছিল তেমনি আছে কিনা।'

এই বলে ডাইনী বাসিলিককে বাঁধলে তিনগাছা রেশমী দড়ি দিয়ে।

দম নিল বাসিলিক, টান দিল — কিন্তু কিছুই হল না। ফের টান মারল সে, মাংসের মধ্যে চেপে বসল দড়ি। তিনবারের বার গায়ের সব জোর দিয়ে টান লাগাতেই রেশমী দড়ি কেটে বসল তার হাড় পর্যন্ত, কিন্তু ছিঁড়ল না।

আনন্দে আটখানা বুড়ি ক্লোয়ান্ৎসা এক ঠ্যাঙে লাফিয়ে উঠে বন্‌বন্ করে ঘুরে ডাক দিলে:

'ওরে ড্রাগন, কোথায় আছিস, শিগগির ছুটে এসে টুকরো কর বাসিলিক ফেত্-ফ্রুমোসকে।'

ড্রাগন আনন্দে ঘড়ঘড় করে বেরিয়ে এল গুপ্তজায়গাটা ছেড়ে, তারপর খড়্গ দিয়ে বাঁধাকপি কাটার মতো কাটলে বাসিলিককে। তারপর টুকরোগুলোকে জড়ো করে ছেঁড়াখোঁড়া জিনের থলিতে পুরে জিনের ওপর দিয়ে ঝুলিয়ে দিলে থলিগুলো, তারপর চাবুক মেরে উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল:

'যা ভাগ, হারামজাদা ঘোড়া, যে চুলোয় গিয়েছিলি জ্যান্তকে নিয়ে, সে চুলোয় যা মরা-কে বয়ে।'

ছুটল ঘোড়া ভূতের মতো, ওর খুরের দাপে গুড়গুড়িয়ে উঠল মাটি, ছুটল সেই দিকে যেখানে ও বেড়ে উঠেছে, দানাপানি আদর যত্ন পেয়েছে — ছুটে গিয়ে দাঁড়াল একেবারে ইলিয়ানা কসিনজ্যানার পুরীর সামনে।

দরজায় এসে দাঁড়াল কসিনজ্যানা, কিন্তু পথের ক্লান্তি জিরিয়ে নিতে আসা পথিককে দেখলে না, দেখলে নিজের ঘোড়াটিকে, ফেনা উঠছে গা দিয়ে, রক্ত ঝরছে। শোকে আকুল হয়ে সে ঘোড়ার পিঠ থেকে থলেগুলোকে নামিয়ে দেখলে তার মধ্যে বাসিলিক ফেত্-ফ্রুমোসের খণ্ড খণ্ড দেহ।

'হায়, হায় গো — কী দশা করেছে তোমার!' কেঁদে কেটে সে, তারপর খণ্ডের পর খণ্ড সাজাতে লাগল, বাসিলিক আগে যেমন ছিল তেমনি আকারে।

তারপর সে ছুটে গেল ভাঁড়ারে, নিয়ে এল জীয়ন জল মরণ জল, বনশুয়োরের বাচ্চা আর পাখির দুধ। বাসিলিকের দেহের যে সব টুকরো কমতি পড়েছিল সেখানে সেখানে সে শুয়োরের মাংসের টুকরো দিয়ে ভরে দিলে; তারপর মরণ জল ছিটিয়ে দিলে — অমনি সব টুকরো জুড়ে গেল, জীয়ন জল দিয়ে ধুইয়ে দিলে, অমনি বেঁচে উঠল বীর। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল বাসিলিক ফেত্-ফ্রুমোস:

'ওহ্, কতক্ষণ ধরে ঘুমিয়েছি।'

'ওগো, সে ঘুম তোমার হত চিরকালের মতো, যদি আমি না থাকতাম এখানে।' এই বলে ইলিয়ানা কসিনজ্যানা পাখির দুধের কলস তুলে ধরল তার মুখে।

দুধ খেতে শুরু করলে বাসিলিক, প্রতি ঢোকে নতুন করে বল বেড়ে ওঠে তার। সব দুধটা খাওয়ার পরে এমন বলবান হয়ে উঠল যে তেমন শক্তি আগে কখনো তার ছিল না। মুষলের এক আঘাতেই সে এখন একটা শিলাকে গুঁড়ো করে দিতে পারে।

মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে, গা ঝাড়া দিয়ে সব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেললে: মনে পড়ল ড্রাগন তার কী করেছিল, তাই মুষলটি নিয়ে রওনা দিলে পুরীর দিকে।

আকাশ থেকে যখন মুষলধারে বৃষ্টি নামে, তখন তাকে কেউ রোধ করতে পারে

না। তেমনি প্রতিহিংসার যে তৃষ্ণা জাগল ব্যাসিলিকের বুকের মধ্যে তাকেও কেউ থামাতে পারল না। চলল সে, চলল, পা চালাল প্রাণপণে, এসে পৌঁছল পুরীতে। দেখে কি, ড্রাগনের সঙ্গে টেবিল পেতে খেতে বসেছে ডাইনী, ভোজ চলেছে সমারোহ করে, আর একপাশে তোয়ালে হাতে দাঁড়িয়ে আছে তার মা, পরিচর্যা করছে। খাবার ঘরে ব্যাসিলিক ফেত্-ফ্রুমোস ঢুকতেই পাষণ্ডদুটোর পায়ের তলের মেঝে যেন ধ্বসে গেল। কিন্তু উচিত মতো আতঙ্ক বোধ করারও ফুরসুত দিলে না ব্যাসিলিক। একটাকে এক হাত দিয়ে, অন্যটাকে অন্যহাত দিয়ে ধরে হিড়হিড় করে উঠোনে টেনে এনে কেটে কুটিকুটি করলে। তারপর এক তামার চুল্লি ধরিয়ে তাদের পুড়িয়ে নিঃশেষ করলে; মাটিতে না, জলে না, কালো মেঘের তলে না, পাহাড়গিরির ঢালে না — কোথাও এতটুকু চিহ্ন রইল না তাদের।

মাকে আলিঙ্গন করলে ব্যাসিলিক, সোহাগ করে তার বুক জুড়ালে।

কিছুদিন পরে আরো বড়ো একটি সুখের ঘটনা ঘটল তাদের। ব্যাসিলিক ফেত্-ফ্রুমোস পাণিপ্রার্থনা করলে ইলিয়ানা কসিনজ্যানার। চেনা অচেনা, রাজ্যের লোক জড়ো হল, ধুমধাম করে বিয়ে হল। আর টেবিলে শিরোমণি হয়ে বসল স্বয়ং সূর্যভাই — পান করলে পাত্র ভরে, সুখ চাইলে সবার তরে, মাতিয়ে তুললে সবাকারে, হাসিখুশি নেশায় চুর, বসন্ত দিন ভরপুর।

বিয়ের পর দুঁহু দোঁহা ভালোবেসে, মিলেমিশে দিন কাটাতে লাগল, আর মারা না গিয়ে থাকলে সম্ভবত এখনো দিন কাটাচ্ছে।

বুদ্ধিমতী জার্নিয়ার

(আজারবাইজানী কাহিনী)



কার কাহিনী বলব তোমাদের? বলব এক সওদাগরের কথা, নাম মামেদ। বাস করত মিসর শহরে, নানা দেশে ঘুরে বেড়াত, নানা জিনিসের বাণিজ্য করত।

একদিন ঠিক করলে দূর দেশে যাত্রা করবে।

নানা রকম মাল কিনলে সে, লোকজন ভাড়া করলে, তারপর বাড়ির লোকেদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা করলে তার কারাভান নিয়ে।

এখানে যায়, সেখানে যায়, শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল এক অদেখা শহরে। মামেদ ঠিক করলে অনেক সফর করা হয়েছে, এখানে একটু বিশ্রাম নেবে। লোকজন সমেত সে উঠল এক সরাইখানায়।

বসে আছে মামেদ, খাচ্ছে দাচ্ছে; কে একটা লোক এসে ওকে বলে:

‘ছিঃ সওদাগর, এখানকার প্রথা যখন জানো না, তখন বোঝাই যাচ্ছে দূর দেশ থেকে এসেছ।’

‘কী রকম প্রথা এখানকার?’ জিজ্ঞেস করে মামেদ।

‘প্রথাটা হল, এ শহরে যে সওদাগরই আসুক, তাকে আগে যথাযোগ্য ভেট দিতে হবে শাহকে। শাহ তার জন্যে সন্ধ্যায় সওদাগরকে নেমন্তন্ন করবে নিজের বাড়িতে, তার সঙ্গে পাশা খেলবে।’

‘কী আর করে সওদাগর! ইচ্ছে থাক না থাক যেতেই হবে। একটি সোনার রেকাবের ওপর নিজের সওদার মধ্যে থেকে সবচেয়ে দামী একটা কাপড় নিয়ে সে চলল শাহের কাছে।

ভেট নিয়ে শাহ জিজ্ঞাসাবাদ করলে: কোন শহর থেকে আসছে, কী সওদা বেচছে, কোথায় কোথায় গেছে? মামেদ তাকে সব জানালে। শুনেটুনে শাহ বললে:

‘সন্ধ্যেয় এসো আমার কাছে, পাশা খেলা যাবে।’

সন্ধ্যেয় মামেদ এল শাহের কাছে। দেখে শাহ ওর অপেক্ষায় বসে আছে, সামনে তার পাশা।

শাহ বলে, ‘আমার শর্ত বলি শোনো সওদাগর। আমার একটি জ্ঞানী বেড়াল আছে। তার লেজের ওপর সাতটা বাতি সে সন্ধ্যে থেকে সকাল পর্যন্ত ধরে রাখতে পারে। যতক্ষণ খেলা চলবে বেড়ালটা যদি ততক্ষণ না নড়ে তা ধরে রাখে, তাহলে তোমার সব ধনসম্পদ, সব মালপত্তর হবে আমার, আর তোমায় আমি বন্দী করে অন্ধকূপে নিয়ে যাবার হুকুম দেব। আর বেড়ালটা যদি জায়গা ছেড়ে নড়ে, তাহলে আমার কোষাগার হবে তোমার, আমাকে নিয়েও যা খুশি করতে পার!’

সওদাগর আর কী করে। পালানো যায় না, আপত্তি করাও যায় না। শাহের শর্তই মেনে নিতে হল।

বসে বসে সে নিজেকে ধিক্কার দেয়, কেন যে এসেছিল এই শহরে।

ভাবে, ‘একেবারেই প্রাণ হারাতে দেরি হবে না এখানে!’

শাহ তার জ্ঞানী বেড়ালটিকে ডাকলে।

বেড়ালটি তার লেজ দুলিয়ে গিয়ে বসল শাহের সামনে।

শাহ হুকুম করলে, 'বাতিগুলো নিয়ে আয়!'

শাহের হুকুমে নোকরেরা সাতটা বাতি এনে বসিয়ে দিলে বেড়ালের লেজের ওপর।

পাশা নিয়ে খেলা শুরু করলে শাহ।

সওদাগর গুটি এগোয় কিন্তু নিজে কেবল তাকিয়ে দেখে বেড়ালটার দিকে। বেড়াল কিন্তু যেন পাথর হয়ে উঠেছে, নড়ে না, উশখুশ করে না।

এমনি করেই দিন গেল, রাত গেল, গেল আরো দুই দিন, দুই রাত। শাহের সঙ্গে খেলে মামেদ আর যেমন ছিল ঠায় তেমনি বসে থাকে বেড়াল।

শেষ পর্যন্ত মামেদ আর সইতে পারলে না, বললে:

'আর খেলার শক্তি আমার নেই, হার মানছি!'

শাহও তাই চায়। নোকরদের ডেকে সে হুকুম দিলে:

'এই সওদাগরের সমস্ত মাল, সব সোনা দানা নিয়ে এসো আমার কাছে; আর বেশ শক্ত করে হাত বেঁধে সওদাগরকে নিয়ে যাও অন্ধকূপে!'

মামেদকে চেপে ধরলে শাহের নোকরেরা, শাহের হুকুম সবই পালন করলে।

অন্ধকূপে বসে থাকে মামেদ, নিজেকে অভিশাপ দেয়, শহরটা এড়িয়ে যায় নি বলে নিজের মনে মনে গাল দেয় শাহকে আর শাহের জ্ঞানী বেড়ালটাকে...

এবার মামেদকে এখানেই রেখে তার বৌ জার্নিয়ারের কথা বলি শোনো।

বৌ ঘরে বসে স্বামীর পথ চেয়ে থাকে কিন্তু স্বামীর আর দেখা নেই।

ভাবে, 'কোনো বিপদ হয় নি তো?'

এমনি আশংকা নিয়ে অনেক দিন সে কাটালে। শেষ পর্যন্ত ঘরে এসে পৌঁছুল মামেদের এক চাকর, ছেঁড়াখোঁড়া কামিজ, ধুলো কাদা মাখা দেহ। বলে:

'কী বলব মনিব বৌ, কোন এক শাহ খোদ আমাদের মালিককে, তার সমস্ত মালপত্তর, সমস্ত সোনা দানা দখল করে নিয়েছে। একলা আমি কেবল কোনো মতে পালিয়ে এসেছি। কী করা যায় এখন?'

কী হয়েছিল কী ব্যাপার, সব বৃত্তান্ত নোকরের কাছ থেকে জেনে নিলে জার্নিয়ার।

তারপর হুকুম দিলে ইঁদুর ধরে ধরে মস্ত এক সিন্দুক বোঝাই করতে। নিজে

সে তারপর সঙ্গে নিলে বহু সোনা রুপো, পুরুষের বেশ ধারণ করলে, লম্বা চুল গুটিয়ে লুকিয়ে রাখলে টুপির তলে, তারপর চলল তার স্বামীকে উদ্ধার করতে।

নিজের কারাভান নিয়ে সে চলল তো চললই, কোথাও থামলে না, কোথাও দেরি করলে না, শেষ পর্যন্ত পৌঁছল সেই শহরে যেখানে অন্ধকূপে দিন কাটাচ্ছে তার স্বামী।

নোকরদের কয়েক জনকে সে বললে, সরাইখানায় তার জন্যে যেন অপেক্ষা করে, আর বাকি লোকদের হুকুম দিলে তার সঙ্গে তারা যাবে শাহের কাছে।

মস্ত এক নক্সা কাটা রেকাব নিয়ে তার ওপর রাখলে দামী দামী ভেট। তাই নিয়ে গেল শাহের কাছে; আর চাকরবাকরেরা তার পেছন পেছন নিয়ে চলল ইঁদুর ভরা সিন্দুক।

রাজপুরীতে এসে জার্নিয়ার তার নোকরদের বললে:

'শাহের সঙ্গে আমি যখন পাশা খেলব তখন তোরা দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে এক একটা করে ইঁদুর ছেড়ে দিবি।'

সিন্দুক নিয়ে দরজার কাছে রইল চাকরেরা, আর জার্নিয়ার গেল শাহের কাছে। ঘরে ঢুকে সে বললে:

'জাঁহাপনার জয় হোক! আপনাদের রাজ্যের প্রথামত আমি এই দামী দামী ভেট এনেছি!'

ভয়ানক আপ্যায়ন করে শাহ জার্নিয়ারকে আমন্ত্রণ করলে, ভালো ভালো খাবার দিলে তাকে, তারপর পাশা খেলতে ডাকলে।

'খেলব যে তার শর্ত কী থাকবে, জাঁহাপনা?' জিজ্ঞেস করলে জার্নিয়ার।

শাহ বলে:

'আমার জ্ঞানী বেড়াল জায়গা ছেড়ে না নড়া পর্যন্ত খেলা চলবে আমাদের!'

'আর আপনার বেড়াল যদি জায়গা ছেড়ে নড়ে?' জিজ্ঞেস করে জার্নিয়ার।

'তাহলে আমি হার মানব। যা ইচ্ছে করতে পারো আমায় নিয়ে!'

জার্নিয়ার বলে, 'বেশ, আপনার শর্তই রইল!'

নিজের জ্ঞানী বেড়ালকে ডাকলে শাহ। বেড়াল এসে ভারিক্কি চালে গালিচার ওপর বসলে শাহের সামনে। নোকরেরা এসে সাতটা বাতি বসিয়ে দিল তার লেজে।

জার্নিয়ারের সঙ্গে পাশা খেলা শুরু করলে শাহ। খেলে আর মনে মনে হাসে। অপেক্ষা করে এই ছোকরা সওদাগরটি কখন হার মানবে।

জার্নিয়ারের চাকরেরা ওদিকে সিন্দুক খুলে একটি ইঁদুর ছেড়ে দিলে ঘরের মধ্যে।

ইঁদুর দেখেই বেড়ালের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল, কিন্তু জায়গা ছেড়ে নড়বার উপক্রম করতেই শাহ এমন ভয়ংকর চোখে চাইল তার দিকে যে পলকের মধ্যে বেড়াল স্থির হয়ে যেন পাথর হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে আরো কিছু ইঁদুর ছেড়ে দিলে জার্নিয়ারের চাকরেরা। ঘরের মধ্যে ছোটাছুটি করতে লাগল ইঁদুরেরা, খেলা করতে লাগল দেয়ালের কাছে। আর সহ্য করতে পারলে না জ্ঞানী বেড়াল। মিউ মিউ করে লাফিয়ে উঠে সাতটা বাতিকেই উল্টে ফেলে ছুটল বেড়াল ইঁদুর ধরতে।

জ্ঞানী বেড়ালকে শাহ যতই ধমক দেয়, বেড়াল আর শোনে না।

জার্নিয়ার তখন ডাক দিলে তার চাকরদের। ঘরের মধ্যে ছুটে এসে তারা শাহকে বেশ কষে মষে বাঁধলে, তারপর শুরু করলে বেত মারতে। মাফ না চাওয়া পর্যন্ত বেত মারা তাদের থামল না।

বলে, 'যত লোককে বন্দী করেছি সবাইকে ছেড়ে দিচ্ছি, ধনদৌলৎ যা নিয়েছি সব ফেরৎ দিচ্ছি, কেবল রেহাই দাও আমায়!'

জার্নিয়ারের চাকরেরা পিটুনি দেয় শাহকে, গলা ফাটিয়ে শাহ চেঁচায়, সব লোক শোনে, কিন্তু সাহায্যের জন্যে কেউ এগিয়ে আসে না, তার লোভ আর নিষ্ঠুরতা দেখে দেখে লোকেদের ঘেন্না ধরে গিয়েছিল।

অন্ধকূপ থেকে তার স্বামীকে আর অন্য সবাই যারা ছিল তাদের খালাস করার হুকুম দিলে জার্নিয়ার আর শাহকে ঢোকানো হল অন্ধকূপে।

তারপর তারা ফিরে এল নিজেদের শহর মিসরে, সেখানে তারা ভালোমন্দ খায় দায়, সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটায়; তোমরাও খাওদাও, পান ভোজনে দিন কাটাও।

আপেল পড়ল আকাশ থেকে, একটা আপেল কার? না — আমার, আরেক আপেল নিল সে এ কাহিনী বলল যে; বাকি আপেলটা পেল কে? এ কাহিনী শুনল যে।

নিষ্কর্মা শেইদুল্লা

(আজারবাইজানী কাহিনী)



একালে নয়, অনেক আগের কালে ছিল একটি লোক। নাম তার শেইদুল্লা, যেমন আলসে তেমনি নিষ্কর্মা।

বৌ ছেলেমেয়েরা তার প্রায় অনশনে দিন কাটায়, নতুন পোশাক আশাকের কথা তো ভাবতেই পারে না।

কাজ করতে চায় না বলে বৌ শেইদুল্লাকে অনুযোগ করে আর শেইদুল্লা বলে:

'কিছু ভাবিস না বৌ, মন খারাপ করিস না। এখন গরিব হয়ে আছি, শিগগিরই দেখিস বড়োলোক হয়ে যাব!'

বৌ বলে, 'বড়োলোক হব কোত্থেকে, তুই তো সারাদিন শুয়ে বসে কাটাস, কুটোটি নাড়াস না।'

শেইদনুল্লা বলে:

'দাঁড়া না, দিন আসবে, বড়োলোকি করে কাটাব!'

বৌ দিন চেয়ে বসে থাকে, ছেলেমেয়েরা বসে থাকে, কিন্তু আর পারে না।

বৌ বলে, 'না, অমন বসে থাকলে একেবারেই মারা যাব না খেয়ে।'

শেইদনুল্লা তখন ঠিক করলে পীরের কাছে গিয়ে উপদেশ চাইবে, কী করে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। সেই ভেবে যাত্রা করলে সে।

শেইদনুল্লা চলল তিন দিন তিন রাত্রি ধরে। পথে দেখা হল এক রোগা নেকড়ের সঙ্গে।

নেকড়ে জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় চলেছ, ভালোমানুষের পো?'

'চলেছি পীরের কাছে পরামর্শ নেব, কী করে বড়োলোক হওয়া যায়।'

তা শুনে নেকড়ে শেইদনুল্লাকে বলে:

'সেই সঙ্গে তাহলে দয়া করে আমার কথাটাও জেনে নিয়ো, কী করব। আজ এই তিন বছর আমার পেটে ভয়ানক ব্যথা, দিনে রাতে এতটুকু শান্তি নেই। এই যন্ত্রণা থেকে কী করে রেহাই পাই, সে কথাটাও যেন পীর বলে দেন।'

শেইদনুল্লা বলে, 'বেশ, জিজ্ঞেস করব।'

এই বলে চলল এগিয়ে।

আরো তিন দিন তিন রাত হাঁটল শেইদনুল্লা, দেখে রাস্তার কাছে একটা আপেল গাছ।

'কোথায় চলেছ, ভালোমানুষের পো?' জিজ্ঞেস করে আপেল গাছ।

'চলেছি পীরের কাছে উপদেশ নেব, না খেটে জীবন কাটানো যায় কী করে।'

আপেল গাছ বলে:

'তাহলে দয়া করে আমার কথাটাও জেনে নিয়ো একটু। প্রতিবছর বসন্তে আমি দিব্যি ফুলে ফুলে ভরে উঠি। কিন্তু ফুল ফোটার পরই সবই আবার শুকিয়ে মরে যায়, কখনো আপেল ধরে না গাছে। পীরের কাছে জেনে নিয়ো, তার কারণ কী।'

'বেশ, জিজ্ঞেস করব,' এই বলে এগিয়ে চলল শেইদনুল্লা।

ফের তিন দিন তিন রাত হাঁটার পর সে এসে পৌঁছল এক গভীর দীঘির কাছে।

জল থেকে এক মস্ত মাছ মাথা তুলে জিজ্ঞেস করে:

'কোথায় চলেছ, ভালোমানুষের পো?'

'এই তো চলেছি পীরের কাছে উপদেশ নিতে, তাঁর সাহায্য চাইতে।'

'দয়া করে তাহলে পীরের কাছে আমার কথাটাও জেনে নিয়ো। আজ এই সাত বছর অনবরত আমার গলায় কী যেন বিঁধছে। পীর যেন বলে দেন, কী করে ভালো হয়ে যাব।'

'বেশ, জিজ্ঞেস করব,' এই বলে এগিয়ে চলল শেইদুল্লা।

আরো তিন দিন তিন রাত হাঁটল শেইদুল্লা, শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছুল এক বাগিচায়, বাগিচা সবই গোলাপের ঝাড় দিয়ে গড়া। দেখে কি — একটা গোলাপ ঝাড়ের তলে বসে আছে এক বুড়ো, লম্বা সাদা তার দাড়ি। শেইদুল্লাকে দেখে বুড়ো শুধোয়:

'কী চাই তোর, শেইদুল্লা?'

অবাক লাগল শেইদুল্লার। বলে:

'আমার নাম জানলে কী করে তুমি? তুমিই কি তাহলে সেই পীর যার উপদেশ নেবার জন্যে আমি আসছি?'

বুড়ো বলে, 'হ্যাঁ, আমিই। কী জানতে চাস, বলে ফ্যাল শিগগির করে!'

শেইদুল্লা বললে কেন সে এসেছে, কী তার চাই।

সব শুনে পীর জিজ্ঞেস করে:

'আমার কাছ থেকে আর কিছু জানবার নেই তোর?'

শেইদুল্লা বলে, 'আছে।'

এই বলে, রোগা নেকড়ে, আপেল গাছ আর মস্ত মাছটার কথা বললে।

বুড়ো বললে, 'মাছের গলায় আটকে গেছে একটা মহামূল্য মণি। সে মণি গলা থেকে বার করে ফেললেই মাছ ভালো হয়ে যাবে। আপেল গাছটার তলায় পোঁতা আছে রুপো ভরা মস্ত এক কলসী। কলসীটা সরিয়ে ফেললেই আপেল গাছের ফুল আর শুকিয়ে যাবে না, আপেল ধরবে। আর নেকড়ের ব্যথা সারাতে

হলে সে যদি তার দেখা পাওয়া প্রথম আলসে মানুষটাকে গিলে খায়, তাহলে ব্যথা সেরে যাবে।'

'আর আমার প্রার্থনা?' জিজ্ঞেস করে শেইদুল্লা।

'তা পূরণ হয়ে গেছে, যা এখন!'

খুব খুশি হল শেইদুল্লা, পীরের কাছ থেকে আর কোনো কিছু জিজ্ঞেস না করেই চলল বাড়ির দিকে।

যেতে যেতে গিয়ে পোঁছল দীঘিটার কাছে। মস্ত মাছটা সেখানে অধীর হয়ে তার অপেক্ষা করছিল। শেইদুল্লাকে দেখেই জিজ্ঞেস করলে:

'আমায় কী উপদেশ দিলেন পীর?'

'তোর গলা থেকে মহামূল্য মণিটা বার করে ফেললেই তুই ভালো হয়ে যাবি।' এই বলে শেইদুল্লা চলে যাওয়ার উপক্রম করলে।

মাছ তার কাছে মিনতি করলে:

'আমায় একটু দয়া করো, ভালোমানুষের পো, গলা থেকে আমার মণিটা বার করে দাও, আমিও রেহাই পাব, তুমিও ধন পাবে!'

'উহুঁ, অত খেটে আমার কী হবে? না খেটে এমনিতেই ধন হবে আমার!' এই বলে এগিয়ে গেল শেইদুল্লা।

আপেল গাছটার কাছে এল সে।

তাকে দেখেই দুলে ওঠে আপেল গাছের ডাল, খসখসিয়ে ওঠে পাতা। জিজ্ঞেস করে:

'কী খবর? পীরের কাছে জিজ্ঞেস করেছিলে কী করে আমার দুঃখ দূর হবে?'

শেইদুল্লা বলে, 'করেছিলাম। তোর শেকড়ের তল থেকে একটা রুপো ভরা মস্ত কলসী বার করে ফেলতে হবে। তাহলে তোর ফুল আর শুকবে না, ফল ধরবে।'

এই বলে যাওয়ার উপক্রম করলে শেইদুল্লা।

আপেল গাছ মিনতি করলে:

'আমার শেকড়ের তল থেকে তাহলে রুপো ভরা কলসীটা বার করে দাও। তাতে তোমারও উপকার হবে, সঙ্গে সঙ্গে বড়োলোক হয়ে যাবে তুমি!'

'উহুঃ, অতো খেটে আমার কী হবে? পীর বলেছে, অমনিতেই আমার সব হয়ে যাবে,' এই বলে এগিয়ে গেল শেইদুল্লা।

যায় যায়, দেখা হল সেই নেকড়ের সঙ্গে। শেইদুল্লাকে দেখেই আর তর সয় না নেকড়ের। বলে:

'তা কী উপদেশ দিলেন পীর? দাঁড় করিয়ে রেখো না, চটপট বলে ফ্যালো!..'

'প্রথম যে আলসে লোকটার দেখা পাবি তাকে খেলেই তুই ভালো হয়ে যাবি,' বললে শেইদুল্লা।

শেইদুল্লাকে ধন্যবাদ দিয়ে নেকড়ে তাকে জিজ্ঞেসাবাদ করতে শুরু করল, সফরে কী দেখল সে, কী শুনল।

শেইদুল্লা বললে কেমন করে দেখা হয়েছিল আপেল গাছ আর মস্ত মাছটার সঙ্গে, কী চেয়েছিল তারা।

'আমি কিন্তু অতো ঝামেলার মধ্যে যাই নি, এমনিতেই তো বড়োলোক হয়ে যাব,' বললে শেইদুল্লা।

সব শুনে ভারি আনন্দ হল নেকড়ের।

বলে, 'তাহলে তো দেখছি আলসে লোক আমায় খুঁজে বেড়াতে হবে না। সে নিজেই যে এসে হাজির হয়েছে! শেইদুল্লার মতো আহাম্মক আর আলসে দুনিয়ায় আর কেউ নেই!'

এই বলে শেইদুল্লার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, গিলে খেয়ে তাকে শেষ করলে।

এই করেই প্রাণ গেল নিষ্কর্মা শেইদুল্লার।

আপেল পড়ল আকাশ থেকে; প্রথম আপেলটা কার, যে শুনলে তার, পরের আপেলটা কার, যে বললে তার। শেষ আপেলটা কাদের, বাদবাকি লোক তাদের।

রাজা আর তাঁতী

(আর্মেনীয় কাহিনী)





এক যে ছিল রাজা।

একদিন সিংহাসনে বসে আছে, দূর দেশের এক রাজার কাছ থেকে দূত এসে হাজির। কোনো কথা না বলে সে রাজার সিংহাসনের চারপাশে খড়ি দিয়ে এক গণ্ডি এঁকে নীরবে সরে দাঁড়াল।

কিছু বুঝতে না পেরে রাজা জিজ্ঞেস করলে:

'তার মানে?'

কিন্তু উত্তরে একটি কথাও বললে না দূত।

এতে রাজার দুর্ভাবনা হল। উজির নাজির, পাত্রমিত্র সবাইকে ডেকে বললে, সিংহাসনের চারপাশে এই দাগটার মানে কী বার করো।

উজির নাজির পাত্রমিত্ররা মন দিয়ে দাগটা দেখলে, কিন্তু কিছুই ধরতে পারলে না।

রেগে মেগে রাজা বললে, 'ধিক্ ধিক্ সবাই, রাজ্যে আমার এমন কেউ কি নেই, যে আমার সিংহাসনের চারপাশে এই দাগটার মানে বলতে পারে?'

কড়া হুকুম দিলে রাজা — রাজ্যের যত জ্ঞানীগুণীদের নিয়ে আসা হোক, এই দাগটার গুহ্য অর্থ ভেদ করে দিক তারা। আদেশে বলা হল, জ্ঞানীগুনীরা যদি এ কাজ না পারে তবে সকলেরই গর্দান যাবে।

উজিরেরা ছুটল জ্ঞানীগুণীর সন্ধানে। সব শহর ঢুঁড়ে দেখল, সব গাঁ ঘুরে দেখল, সব দরজায় ঘা দিল। শেষ পর্যন্ত হাজির হল একটা ছোটোখাটো বাড়িতে। ভেতরে ঢুকে দেখে, কেউ নেই, সব চুপচাপ, কেবল একটি দোলনা রয়েছে, আপনা থেকেই সেটা দুলছে।

উজিরেরা অবাক হল, 'এ আবার কী? কেউ নেই অথচ দুলছে কেন দোলনাটা?'

অবাক হয়ে তারা ঢুকল পরের ঘরখানায়। এ ঘরেও আরেকটা দোলনা, সেটাও দুলছে অথচ কেউ নেই।

ভয়ানক অবাক হয়ে উজিরেরা উঠল ঘরের ছাদে। দেখে, ছাদে গম শুকুতে দেওয়া হয়েছে। তার ওপর পাখিরা উড়ছে, গম খাবার ইচ্ছে, কিন্তু সাহস পাচ্ছে না: হোগলা পাতার একটা পাখা লাগানো আছে ছাদে, সেটা এদিক ওদিক দুলে দুলে পাখিগুলোকে তাড়িয়ে দিচ্ছে।

রাজার দূতেরা আরও বেশি অবাক হল।

'হোগলা পাতার পাখা এত জোরে কেন দুলছে?' শুধোয় তারা একজন অন্য জনকে। 'কোনো হাওয়া নেই, আশেপাশের গাছগুলোতে ডালপালার খসখসানি নেই।'

ছাদ থেকে তারা ফের নেমে এল নিচে, এবার ঢুকল শেষ ঘরখানায়। এ ঘরে এক তাঁতী বসে বসে তাঁত চালাচ্ছে।

রাজার দূতেরা তাকে জিজ্ঞেস করলে, 'কী ঘটছে বল তো বাপু তোমার ঘরে? ফাঁকা ঘরে আপনা থেকেই দোলনা দুলছে কেন? ছাদে কোনো বাতাস নেই, অথচ পাখা দুলছে?'

তাঁতী বললে, 'এতে অবাক হবার কিছু নেই। এ সবই আমি করছি।'

'ঠাট্টার আর জায়গা পেলি না?' চটে উঠল রাজার দূতেরা, 'তুই তো এখানে বসে বসে তাঁত বুনছিস!'

তাঁতী বললে, 'ব্যাপারটা খুব সোজা। আমার তাঁতের সঙ্গে তিনটে সুতো বেঁধে রেখেছি। একটা সুতোর ডগা বেঁধেছি প্রথম দোলনাটার সঙ্গে, দ্বিতীয় সুতোটার ডগা দ্বিতীয় দোলনার সঙ্গে আর শেষ সুতোটা বাঁধা ছাদের পাখার সঙ্গে। আমি যখন তাঁত চালাই, সুতোগুলোও অমনি এপাশ ওপাশ করে দুই দোলনা আর ছাদের পাখাটা দোলায়।'

রাজার দূতেরা তাকিয়ে দেখে সত্যিই — তাঁত থেকে তিনটে সুতো চলে গেছে — দুটো গেছে দোলনায়, একটা ছাদের পাখায়।

'তাঁতীর মাথা আছে বটে!' বললে ওরা, 'জ্ঞানীগুণীর চেয়ে কম নয়! এই রকমের লোকই আমাদের চাই! চলো আমাদের সঙ্গে রাজার কাছে, একটা গূঢ় রহস্য ভেদ করতে হবে তোমার!'

'আগে বলো কেমন রহস্য,' জিজ্ঞেস করলে তাঁতী।

উজিরেরা জানাল, 'অপর দেশের রাজার এক দূত এসেছে আমাদের রাজার কাছে। একটুকরো খড়ি দিয়ে সে রাজার সিংহাসনের চারপাশ ঘিরে এক গণ্ডি এঁকেছে। কী তার মানে কেউ ধরতে পারছে না, রাজাও পারছে না, তার পাত্রমিত্ররাও পারছে না। রাজার হুকুমে আমরা এখন জ্ঞানীগুণীর সন্ধান করছি, যে এই গণ্ডিটার অর্থ বুঝিয়ে দেবে। তুমি যদি এ রহস্য ভেদ করতে পারো তাহলে রাজা তোমায় অনেক উপঢৌকন দেবে।'

রাজার দূতদের কথা শুনে তাঁতী গভীরভাবে কী ভাবলে। তারপর ছেলেরা যা দিয়ে ঘুঁটি খেলে তেমন দুটো ঘুটিং নিয়ে পকেটে পুরলে, তারপর একটা মুরগী ধরতে গেল। কিছুই বুঝতে না পেরে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে উজিরেরা।

'মুরগী নিয়ে কী হবে তোমার?'

'কাজে লাগবে,' ছোট্ট করে জবাব দিয়ে তাঁতী ঝাঁপির মধ্যে পুরলে মুরগীটাকে।

তারপর সবাই চলল রাজার কাছে।

প্রাসাদে এসে তাঁতী রাজাকে নমস্কার করলে, সিংহাসনের চারপাশে আঁকা সাদা দাগটা দেখলে, তারপর বিদেশী দূতের দিকে চেয়ে হেসে তার সামনে ছুড়ে দিলে ছেলেদের ঐ খেলার ঘুটিংদুটো।

দূত কোনো কথা না বলে একমুঠো দানা নিয়ে ছড়িয়ে দিলে মেঝের ওপর।

তাঁতীও হেসে ঝাঁপি থেকে মুরগীটি বার করে ছেড়ে দিলে। চটপট দানা খুঁটে খেতে লাগল মুরগী, কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি দানাও পড়ে রইল না মেঝেয়।

এই দেখে একটি কথাও আর না বলে চলে গেল বিদেশী দূতটা।

রাজা আর উপস্থিত সকলে এতক্ষণ অবাক হয়ে দেখছিল এদের দু'জনের এই আচরণ। কী যে তার মানে কেউ বুঝে উঠতে পারল না।

রাজা জিজ্ঞেস করলে, 'কী বলতে চাইছিল এই বিদেশীটা?'

তাঁতী বললে, 'ও বলতে চেয়েছিল যে ওদের দেশের রাজা আমাদের দেশের সঙ্গে যুদ্ধে নেমে চারিদিক থেকে ঘেরাও করবে আমাদের। জানতে চেয়েছিল, মহারাজ হার মেনে নেবেন, নাকি লড়াই করবেন? আপনার সিংহাসনের চারপাশের ঐ গণ্ডিটার এই হল অর্থ।'

রাজা বললে, 'তা বটে, এবার বেশ বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু ঘুটিংদুটো তুমি ওর সামনে ছুড়ে ফেললে কেন বুঝলাম না।'

তাঁতী বললে:

'ঘুটিং ছুড়ে দিয়েছিলাম এই জন্যে যে ও বুঝুক আমরা ওদের চেয়ে এত বেশি শক্তি ধরি যে আমাদের হারাতে পারবে না, আমি ওকে দেখিয়ে দিলাম, 'আমাদের কাছে তোরা শিশু, বরং ঘুটিং নিয়ে খেলা কর, যুদ্ধ করতে আসিস না'।'

রাজা বললে, 'তা বটে! তোমার কথা শুনে এ ব্যাপারটাও এখন বেশ বুঝতে পারছি। এবার বলো, বিদেশীটা মেঝের ওপর একমুঠো দানা ছড়িয়ে দিলে কেন? তুমিই বা কেন ঝাঁপি থেকে মুরগীটা ছেড়ে দিলে।'

তাঁতী বললে, 'এটা বোঝা কঠিন নয়। ও একমুঠো দানা ছড়িয়ে দেখাতে

চেয়েছিল যে তাদের সৈন্যসামন্ত অগুন্তি। আমি তার জবাব দিলাম মুরগীটা দিয়ে, বুঝিয়ে দিলাম, ওরা যদি যুদ্ধ করতে আসে, তবে ওদের একটি সৈন্যও বেঁচে ফিরবে না।'

'বিদেশীটা তা বুঝলে?'

'মানে, পালাল যখন, তখন বুঝেছে বৈকি!'

জ্ঞানী তাঁতীকে রাজা মহামূল্য উপহার দিয়ে সম্মান দেখিয়ে বললে:

'শোনো বলি তাঁতী! এইখানেই থেকে যাও, আমার প্রধান উজির হবে তুমি।'

তাঁতী বললে, 'না মহারাজ, আপনার উজির হতে সাধ নেই, আমার নিজেরই কত কাজ।'

এই বলে চলে গেল।

আনাইৎ

(আর্মেনীয় কাহিনী)



১

মহারাজ ভাচে'র একমাত্র ছেলে যুবরাজ ভাচাগান একদিন অলিন্দে দাঁড়িয়ে আছে। বসন্তের সকাল। বাগিচায় গান গাইছে নানা রকমের পাখি, কিন্তু সবার সেরা গান নাইটিঙ্গেলের। সে গান শুরু করলেই অন্য পাখিরা চুপ করে যায়, কান পেতে শোনে, ধরতে চায় তার গানের রহস্য। কেউ নকল করে তার কাকলী, কেউ তার সুরের দোলা, কেউ আবার তার শিস, তারপর সবাই মিলে রপ্ত করে শেখা সুরটা। কিন্তু ভাচাগানের মন ছিল না গানের দিকে। বুকের মধ্যে তার অন্য ভাবনা।

তার মা, মহারানী আশ্‌হেন এসে তাকে জিজ্ঞেস করলে:

'মানিক আমার, ভাচাগান, দেখছি মনে তোর কী যেন দুঃখ। আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখিস না; বল কেন তোর মনে সুখ নেই।'

'জীবনের আনন্দে আমার সাধ নেই, মা। ইচ্ছে হয়, চলে যাই কোনো বিজন এলাকায়, যেমন ধরো আৎসিক গ্রামে।'

'বুঝতে পারছি, তুই আৎসিক গ্রামে যেতে চাস কেবল তোর বুদ্ধিমতী আনাইৎকে দেখবি বলে?'

'কোত্থেকে তার নাম জানলে, মা?'

'আমাদের বাগিচার নাইটিঙ্গেলেরা আমায় তার কথা বলেছে। ভাচাগান, মানিক আমার, ভুলে যাস নে, তুই আফগান রাজের ছেলে। রাজার ছেলের বিয়ে হয় রাজকন্যের সঙ্গে, নয়ত আমীর ওমরার মেয়ের সঙ্গে চাষীর মেয়ের সঙ্গে না। ঐ তো, জর্জিয়ার রাজার তিন কন্যা, যাকে খুশি পছন্দ কর। গুগারের আমীরের মেয়েটি ভারি সুন্দরী, তার ধনসম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। তাছাড়া, আমাদের সেনাপতির মেয়েটিই বা খারাপ কিসে, আমাদের চোখের সামনেই বেড়ে উঠেছে, আমরাই মানুষ করে তুলেছি।'

'আমি কেবল আনাইৎকেই চাই, মা...'

এই বলে ভাচাগান চলে গেল বাগানে।

২

সবে বিশে পড়েছে ভাচাগান। ভারি কোমল সে, পাণ্ডুবর্ণ, দুবলা গোছের।

বাপ বোঝাত, 'ভাচাগান, তোর ওপরেই আমার সব ভরসা। তোর এবার বিয়ে করতে হয়, দুনিয়ার নিয়মই তাই।'

কিন্তু রাজার কথা কানে তুলত না ভাচাগান। সকাল হতেই সে চলে যেত পাহাড়ে শিকার করতে, ফিরত রাত করে। অনেক আমীর ওমরা তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করার চেষ্টা করত, সে কিন্তু তাদের এড়িয়ে চলত। সঙ্গে সে নিত কেবল তার সাহসী অনুগত ভৃত্য ভাগিনাক আর শিকারী কুকুর জাঙ্গিকে। শিকারে ওদের

দেখে কেউ বুঝতে পারত না, কে বা রাজপুত্র আর কেই বা তার চাকর। দু'জনকেই দেখতে একরকম, শিকারীর পোশাক, কাঁধের ওপর ধনুক, কোমরবন্ধে চওড়া একটা ছোরা।

ঘোরাঘুরি করে উপকার হল ভাচাগানের — বেশ শক্ত, সমর্থ, জোয়ান হয়ে উঠল সে।

একদিন ভাচাগান আর ভাগিনাক চলেছে আৎসিক গ্রামের দিকে। একটা ঝর্ণার ধারে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। এমন সময় গ্রাম থেকে জল নিতে এল মেয়েরা। ভাচাগানের তেষ্টা পেয়েছিল। জল চাইলে সে। একটি মেয়ে কলস ভরে এগিয়ে দিল ভাচাগানের দিকে। কিন্তু হঠাৎ অন্য একজন কলসি টান মেরে জলটা ফেলে দিলে। ফের জল ভরে আবার ফের ফেলে দিলে। তেষ্টায় ওদিকে গলা শুকিয়ে এসেছে ভাচাগানের: মেয়েটা কিন্তু যেন তামাসাই করে চলেছে, ধারার কাছে কলসি ধরে আর জল ফেলে দেয়। শেষ পর্যন্ত ছয় বারের বার সে জল দিলে ভাচাগানকে।

জল খেয়ে ভাচাগান জিজ্ঞেস করলে:

'প্রথমেই জলটা দিলে না কেন, বলো তো? রগড় করছিলে, নাকি আমায় রাগাতে চেয়েছিলে?'

'অচেনা লোকের সঙ্গে রগড় করার প্রথা নেই আমাদের,' মেয়েটি বললে। 'কিন্তু আপনারা ক্লান্ত হয়ে গরম হয়ে এসেছিলেন — ঠান্ডা জলে অপকার হতে পারত। তাই একটু দেরি করে দিলাম।'

মেয়েটির জবাবে অবাক হয়ে গেল ভাচাগান। মুগ্ধ হয়ে গেল তার রূপে। জিজ্ঞেস করলে:

'কী নাম তোমার?'

'আনাইৎ,' বললে মেয়েটি।

'কে তোমার বাপ?'

'বাপ আমার এখানকার এক রাখাল আরান। কিন্তু আমাদের নাম নিয়ে কী হবে তোমার?'

'জিজ্ঞেস করাটা কি দোষের?'

'দোষ যদি না হয় তো বলো তুমিই বা কে, এসেছ কোথা থেকে?'

'সত্যি বলব না মিথ্যে বলব?'

'যেটা তোমার ন্যায়ে বলে।'

'ন্যায়ে আমার সত্যিই বলা উচিত। আর সত্যি কথাটা হল এই যে আপাতত কে আমি, সে বলা চলবে না। কিন্তু কথা দিচ্ছি, শিগগিরই পরিচয় দেব!'

'বেশ, এবার কলসি আমার ফিরিয়ে দাও।'

রাজপুত্রের কাছে বিদায় নিয়ে আনাইৎ কলসি নিয়ে চলে গেল। শিকারীরা ফিরল ঘরে। অনুগত ভাগিনাক মহারানীকে সবই বললে কী হয়েছিল। ভাচাগানের মা-ও তাই জেনে গিয়েছিল ছেলের গোপন কথাটা।

৩

অন্য কোনো পাত্রীর কথা ভাচাগান কানেই তুলতে চায় না। শেষ পর্যন্ত রাজারানী ওর পছন্দেই সায় দিলে। ভাগিনাক আর দুই রাজপুরুষকে তারা আৎসিক গ্রামে পাঠালে আনাইতের সঙ্গে সম্বন্ধ করতে।

রাখাল আরান তাদের সম্মান করে বরণ করলে। গালিচা পেতে দিলে আরান অতিথিদের জন্যে।

ভাগিনাক বললে, 'কী অপরূপ গালিচা! নিশ্চয় বাড়ির গিন্নি বুনেছে এটি।'

আরান বললে, 'আমার গিন্নি বেঁচে নেই। দশ বছর আগে মারা গেছে। গালিচাটি আমার মেয়ে আনাইতের হাতে বোনা।'

'আমাদের মহারাজের কক্ষেও যে এমন সুন্দর গালিচা নেই। ভারি আনন্দ হল তোমার মেয়ে এমন নিপুণা,' রাজপুরুষেরা বললে, 'তার কথা রাজপুরীতে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। রাজা আমাদের তোমার কাছে পাঠিয়েছেন কথা কইবার জন্যে। উনি চান, সিংহাসনের অধিকারী তাঁর একমাত্র ছেলের জন্যে তোমার মেয়েটি তুমি সম্প্রদান করবে।'

রাজপুরুষেরা ভেবেছিল, আরান হয় কথাটা বিশ্বাস করবে না, নয়ত আনন্দে লাফিয়ে উঠবে। রাখাল কিন্তু তার কিছুই করলে না। মাথা নিচু করে গালিচার নক্সার ওপর তর্জনী বুলাতে লাগল।

ভাগিনাক বললে:

'অমন মন ভার হল কেন, আরান ভায়া? আমরা তোমায় আনন্দের কথা শোনাতে এসেছি, দুঃখের কথা নয়। মেয়েকে তোমার জোর করে নিয়ে যাব না। ইচ্ছে হয় সম্প্রদান করবে, ইচ্ছে না হয় দিয়ো না।'

আরান বললে, 'ব্যাপারটা এই যে মেয়ের ব্যাপারে আমার ইচ্ছে খাটবে না। ও যদি নিজে রাজী থাকে তবে আমার কোনো আপত্তি নেই।'

এই সময় এক ঝুড়ি পাকা ফল নিয়ে এল আনাইৎ। অতিথিদের সামনে মাথা নুইয়ে অভিবাদন করলে সে, রেকাবে ফল রেখে সে গিয়ে বসলে তার সেলাই নিয়ে। রাজপুরুষেরা তাকিয়ে দেখে ওর আঙুলের ক্ষিপ্রতায় অবাক হয়ে গেল।

ভাগিনাক জিজ্ঞেস করলে, 'আনাইৎ, একা একা কাজ করছ কেন বলো তো। শুনেছি তোমার নাকি অনেক চেলা।'

আনাইৎ বললে, 'আছে, কিন্তু আঙুর তোলার জন্যে আমি তাদের ছেড়ে দিয়েছি।'

'শুনেছি তুমি নাকি তোমার চেলাদের লেখাপড়া শেখাও?'

আনাইৎ বললে, 'হ্যাঁ, আজকাল আমাদের রাখালেরাও যখন গোরুবাছুর চরায় তখন পড়াশুনা করে, নিজেদের মধ্যে ভাগ করে লেখাপড়া শেখায়। আমাদের এলাকার বনের প্রতিটি গাছের গুঁড়িতে লিখন আছে। দুর্গের দেয়ালে, শিলা পাথরে দেখবে কাঠকয়লায় লেখা। একজন একটা শব্দ বসাল, পরের জন বসাল পরের একটা কথা, এই ভাবেই চলে... আমাদের পাহাড় খাদ সবই লিপিতে ভরা।'

ভাগিনাক বললে, 'আমাদের ওখানে বিদ্যার তেমন আদর নেই। নগরবাসীরা আলসে। কিন্তু তুমি যদি আসো তাহলে সবাইকে মনোযোগী করে তুলতে পারবে। শোনো আনাইৎ, একটু কাজ থামিয়ে দেখো, রাজা তোমায় কী উপহার পাঠিয়েছেন।'

রেশমের পোশাক আর মণিমুক্তোর অলংকার বার করে দিলে ভাগিনাক। আনাইৎ একবার চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলে:

'আমার প্রতি রাজার এমন কৃপা কেন?'

'আমাদের যুবরাজ ভাচাগান তোমায় দেখেছিলেন ঝর্ণাতলায়, তুমি ওঁকে জল খেতে দিয়েছ। তোমায় খুব ভালো লেগেছে তাঁর। রাজা আমাদের পাঠিয়েছেন তোমায় রাজবধূ হবার জন্যে অনুরোধ করতে। এই আংটি, এই হার এই কঙ্কণ সব তোমার।'

'তার মানে, সেই শিকারীই তবে রাজপুত্র?'

'হ্যাঁ।'

'চমৎকার তরুণ তিনি, কিন্তু কোনো কাজ জানেন কি তিনি?'

'কী বলছ আনাইৎ, উনি যুবরাজ, সব প্রজারাই তো তাঁর নোকর। কাজ শিখে তাঁর কী হবে?'

'তা হতে পারে, কিন্তু আজ যে মনিব কাল সে নিজেই নোকর হয়ে যেতে পারে। সকলেরই একটা না একটা কাজ জানা দরকার — হোক সে রাজা, নোকর, কি রায়বাহাদুর।'

আনাইতের কথা শুনে অবাক লাগল রাজপুরুষদের। কিন্তু মেয়ের কথায় খুশিই হল আরান।

রাজপুরুষেরা বললে, 'তার মানে তুমি যুবরাজকে প্রত্যাখ্যান করছ কেবল এই জন্যে যে তিনি কোনো কাজ জানেন না?'

'হ্যাঁ, আর আপনারা যা সঙ্গে নিয়ে এসেছেন সব ফেরত নিয়ে যান। যুবরাজকে বলবেন, তিনি আমার প্রিয়তম, কিন্তু আমায় যেন ক্ষমা করেন! আমার শপথ আছে, যে কোনো কাজ জানে না তাকে বিয়ে করব না।'

দূতেরা দেখল, আনাইৎ তার সিদ্ধান্তে অটল। তাই আর জেদ করল না। রাজপুরীতে ফিরে এসে তারা সব জানালে।

আনাইতের সিদ্ধান্ত শুনে খুশি হল রাজারানী। ভাচাগানকে তাহলে এবার তার সংকল্প ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু ভাচাগান বললে:

'আনাইৎ ঠিক কথা বলেছে। সবার মতো আমাকেও কোনো একটা কাজে ওস্তাদ হতে হবে।'

রাজা তার পাত্রমিত্রদের সঙ্গে আলাপ করলে, সবাই একবাক্যে বললে যে যুবরাজের পক্ষে সবচেয়ে যোগ্য কাজ হবে জরির নক্সা তোলা। পারস্য থেকে আনা হল এক ওস্তাদ। একবছর ধরে ভাচাগান নক্সা তোলার কাজ শিখলে, আনাইতের জন্যে সোনার মিহি সুতোয় জরির কাজ করে একটা মহামূল্য কাপড় পাঠালে ভাগিনাকের হাত দিয়ে।

সেটা পেয়ে আনাইৎ বললে:

'কথায় বলে: 'ভাগ্যচক্রে ভয় না পায়, অভাবে পড়লে তাঁত চালায়।' যুবরাজকে বলো আমি রাজী, তাঁকে দিয়ো আমার বোনা এই গালিচা।'

তোড়জোড় শুরু হল বিয়ের, ধুমধাম চলল সাত দিন সাত রাত ধরে।

৪

বিয়ের ঠিক পরেই কিন্তু ভাচাগানের বিশ্বস্ত সাথী ও ভৃত্য ভাগিনাক উধাও হল। অনেক খোঁজাখুঁজি হল, শেষ পর্যন্ত সব আশা ছেড়ে দিতে হল তার। রাজারানীও এদিকে অনেক বুড়ো বয়স পর্যন্ত বেঁচে থেকে মারা গেল। রাজা হল ভাচাগান।

একদিন তাকে আনাইৎ বললে:

'রাজা, আমি দেখেছি রাজকাজে তোমার অবহেলা হচ্ছে। লোকে তোমায় সব সত্যি কথা জানায় না। তারা বলে যেন সবই বেশ ভালো চলছে। কিন্তু আসলে হয়ত তা নয়। তুমি বরং মাঝে মাঝে তোমার রাজ্য ঘুরে দেখো — কখনো গরিবের বেশ ধরো, কখনো মজুরের বেশ কি সওদাগরের বেশ নাও।'

রাজা বললে, 'ঠিক বলেছ আনাইৎ, আগে যখন আমি শিকার করে বেড়াতাম, তখন ভালো জানতাম লোককে। কিন্তু এখন যাই কী করে? আমি না থাকলে রাজ্য চালাবে কে?'

আনাইৎ বললে, 'আমি চালাব; তুমি নেই একথা কেউ জানবে না।'

'বেশ, কাল আমি সফরে বেরুব। যদি বিশ দিনের ভেতর না ফিরি তবে জেনো, হয় বেঁচে নেই, নয়ত বিপদ ঘটেছে।'

৫

সাধারণ চাষীর বেশ ধরে রাজা ভাচাগান রাজ্য ঘুরে দেখতে লাগল। অনেক দেখা হল, অনেক শোনা হল, শেষ পর্যন্ত এসে পেঁছিল পেরোজ শহরে।

নগরের মাঝখানে প্রশস্ত চত্বর। সেখানে বাজার, বাজারের চারপাশে কারুজীবীদের কারখানা, বণিকদের দোকান।

ভাচাগান একদিন এই চত্বরে বসে আছে, দেখে কি একটা বুড়ো লোকের পেছু পেছু চলেছে একদল লোক। বুড়ো হাঁটছে খুব ধীরে ধীরে। তার সামনে থেকে লোক সব সরে যাচ্ছে আর প্রতিবার পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে একটি করে ইঁট পেতে দেওয়া হচ্ছে তার পায়ের তলে। ভাচাগান একজনকে পেয়ে জিজ্ঞেস করলে, কে এই বুড়ো? লোকটা বললে:

'সে কী জানো না? ইনি যে আমাদের প্রধান পুরোহিত; অতি পুণ্যবান ইনি, মাটিতে পা দেন না, পাছে কোনো কীটপতঙ্গ মারা পড়ে।'

তারপর চত্বরে গালিচা পেতে দেওয়া হল। প্রধান পুরোহিত তার ওপর হাঁটু মুড়ে বসলে বিশ্রাম নেবার জন্যে। ভাচাগান ভিড় ঠেলে কাছে এগিয়ে গেল বুড়োকে দেখবে, তার কথা শুনবে বলে। ভাচাগানকে দেখেই পুরোহিত বুঝতে পারলে, পরদেশী লোক। বললে:

'কে তুই? কী কাজ করিস?'

'আমি ভিনদেশের মজুর। এ শহরে এসেছি কাজের খোঁজে।'

'বেশ, আমার সঙ্গে চল, আমি তোকে কাজ দেব, ভালো বেতনও পাবি।'

ভাচাগান মাথা নেড়ে সম্মতি দিলে। প্রধান পুরোহিত তার সহগামী পুরোহিতদের কানে কানে কী বললে, তারাও নানান দিকে চলে গেল। কিছুক্ষণ

পরে সবাই ফিরে এল কতকগুলো মুটে নিয়ে, তাদের কাঁধে নানান ধরনের সব রসদপত্র। প্রধান পুরোহিত তখন উঠে রওনা দিলে তার বাড়ির দিকে। নীরবে ভাচাগান চলল তার পিছু পিছু। এই ভাবে তারা গিয়ে পৌঁছল নগরের তোরণ দ্বারে।

প্রধান পুরোহিতের আশীর্বাদ নিয়ে লোকজনেরা সব বিদায় নিল এখান থেকে। রইল শুধু পুরোহিতরা, মুটেরা আর ভাচাগান। নগর থেকে বেশ কিছু দূরে তারা গিয়ে পৌঁছল এক উঁচু দেয়ালের কাছে। একটা মস্ত চাবি বার করে ফটক খুললে প্রধান পুরোহিত। প্রাচীরের ওপাশে চওড়া চত্বর, মাঝখানে একটা মন্দির, তার চারিপাশে কক্ষ। মুটেরা ভার নামালে। মন্দিরের অপর দিকে মুটেদের আর ভাচাগানকে নিয়ে এল প্রধান পুরোহিত, তারপর একটা লোহার দরজা খুলে বললে:

'ভেতরে যা, ওখানে তোদের কাজ দেওয়া হবে।'

হতভম্বের মতো তারা নীরবে ভেতরে ঢুকে টের পেলে, জায়গাটা মাটির নিচে। প্রধান পুরোহিত দরজা বন্ধ করে দিলে। ফেরার পথ বন্ধ হয়ে গেল জেনে মজুরেরা এগিয়েই চলল।

৬

অনেকক্ষণ ধরে চলল তারা। হঠাৎ দূরে দেখা গেল একটা ঝাপসা আলো। আলোর কাছে এসে দেখল একটা গুহা, ভেতর থেকে চিৎকার আর আর্তনাদ উঠছে। কান পেতে সে আর্তনাদ শুনে পাথরের একটা গর্ত দেখে অবাক হয়ে গেল তারা। ঠিক সেই সময় আধো অন্ধকারের মধ্যে দেখা গেল একটা ছায়া। ক্রমশ এগিয়ে এসে ঘন হয়ে তা এক মানুষের মূর্তিতে দাঁড়াল। ভাচাগান ছায়ার কাছে গিয়ে চিৎকার করে বললে:

'কে তুমি? মানুষ না প্রেত? যদি মানুষ হও তাহলে বলো আমরা এ কোথায় এলাম।'

ছায়া আরো কাছে এল, কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়াল তাদের সম্মুখে। মানুষই বটে,

কিন্তু কী মূর্তি! মড়ার মতো মুখ, কোটরে বসা চোখ, উঁচু হয়ে উঠেছে গালের হাড়। এককথায় অস্থিচর্মসার। কাঁদতে কাঁদতে সে বললে:

'এসো আমার সঙ্গে, সব দেখাব তোমাদের।'

সরু বারান্দা পার হয়ে তারা পৌঁছল দ্বিতীয় গুহাটায়। অন্তিম যন্ত্রণায় সেখানে ছটফট করছে একদল নগ্নদেহী মানুষ। তৃতীয় গুহাটায় রয়েছে মস্ত বড়ো কড়াই — মনে হয়, খাবার রান্না হচ্ছে। ভাচাগান একটা কড়াইয়ে উঁকি দিয়েই সভয়ে পিছিয়ে এল। সঙ্গীদের কিছু বললে না। এর পর নতুন একটা বারান্দায় গেল তারা। আধো অন্ধকারে এখানে কাজ করে চলেছে কয়েক শত মৃতপ্রায় মানুষ। কেউ নক্সা তুলছে, কেউ বুনছে, কেউ সেলাই করছে। মড়ার মতো লোকটা বললে:

'পাষণ্ড পুরোহিতটা ভুলিয়ে নিয়ে এসেছে আমাদের এই মাটির তলার সুরঙ্গে। কত বছর এখানে কাটল জানি না, এখানে রাত নেই দিন নেই, বরাবর শুধুই অন্ধকার। কেবল এই জানি যে এখানে আমার সঙ্গে যারা এসে পড়েছিল তারা সবাই মারা পড়েছে। যারা কোনো একটা কাজ জানে বা জানে না, তাদের সবাইকে ভুলিয়ে নিয়ে আসা হয় এখানে। যারা কাজ জানে তারা মরণ পর্যন্ত খেটে মরে, যারা জানে না, তাদের নিয়ে যাওয়া হয় মশানে, তারপর চাপান হয় ঐ কড়াইয়ে, যা তোমরা দেখেছ। বুড়ো শিপাচটা একা নয়, বাকি পুরোহিতরা সবাই তার সঙ্গী।'

যে লোকটি এসব কথা বললে, তার দিকে তাকিয়েই ভাচাগান চিনতে পারলে তার অনুগত ভৃত্য ভাগিনাককে। কিন্তু কোনো কথা বললে না, পাছে এই মিলনের দমকা উল্লাসে ভাগিনাকের জীবনের সরু সুতোটুকুও ছিঁড়ে যায়।

৭

ভাগিনাক চলে যাবার পর ভাচাগান তার সহচরদের জিজ্ঞেস করে জানলে, কে তারা, কে কী কাজ জানে। একজন বললে, দর্জি, আরেকজন বললে তাঁতী, বাকি লোকগুলোকে ভাচাগান ঠিক করলে তার যোগাড়ে করে নেবে। কিছুক্ষণ পরেই

পদক্ষেপ শোনা গেল, সামনে এসে দাঁড়াল এক হিংস্র পুরুত, সঙ্গে হাতিয়ারধারী একটা দল।

পুরোহিত বললে, 'তোমরাই নতুন এসেছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমরাই দয়াবতারের নোকর,' বললে ভাচাগান।

'তোমাদের মধ্যে কে কারু শিল্প জানে?'

ভাচাগান বললে, 'সবাই! মহামূল্য জরির কাপড় বুনতে পারি আমরা, সোনার চেয়ে শত গুণ তার দাম।'

'বলো কী, তোমাদের কাপড় কি অতই দামী?'

'মিছে বলছি না, যাচাই করে দেখতে পারো।'

'বেশ যাচাই করে দেখব। এবার বলো, কী রকম যন্ত্রপাতি মালমশলা তোমাদের দরকার। তারপর সবার সঙ্গে গিয়ে কাজ করবে ঐ কারখানায়।'

'উঁহু, সেখানে আমাদের কাজ করা সম্ভব হবে না,' আপত্তি করল ভাচাগান, 'এইখানেই আমাদের কাজ করতে সুবিধা। আর খাওয়ার ব্যাপারে বলি, আমরা নিরামিষাশী, মাংস খেলে মরেই যেতে পারি।'

পুরোহিত বললে, 'বেশ তোমাদের আমি রুটি আর শাকসবজি পাঠাব, কিন্তু তোমাদের কাজ যা বললে তেমন মহামূল্য যদি না হয় তাহলে তোমাদের মশানে পাঠাব, মরার আগে বেশ করে নির্যাতনও করা হবে।'

পুরোহিত তাদের জন্য রুটি আর ফলমূল পাঠালে। রুটির ভাগ তারা ভাগিনাককেও দিলে, অন্যদেরও দিলে। কাজে লাগল ভাচাগান। চটপট এক টুকরো জরির কাপড় বানালে সে, তাতে যেসব নক্সা তুললে তাতে এই ভূগর্ভের নরক যন্ত্রণার সব কথারই বিবরণ রইল। তবে তা সবার পক্ষে পড়া সম্ভব নয়।

কাপড়টা দেখে পুরোহিতের আনন্দ আর ধরে না।

ভাচাগান বললে:

'আগে তোমায় বলেছিলাম, আমাদের কাপড় সোনার চেয়ে শত গুণ দামী। আসলে কিন্তু এই কাপড়খানার দাম তারও দ্বিগুণ। ওর মধ্যে কবচের নকশাও আছে কিনা। আফসোস এই যে সাধারণ লোকে তার মূল্য দিতে পারবে না। এর কদর বুঝবে কেবল বুদ্ধিমতী মহারানী আনাইৎ।'

কাপড়খানার আসল দামের কথা শুনে লোভী পুরোহিতের চোখ বড়ো বড়ো হয়ে উঠল। ঠিক করলে তার দামের ভাগ সে কাউকে দেবে না। প্রধান পুরোহিতকে সে কিছুই বললে না, কাপড়খানাও দেখালে না, সোজা রওনা দিলে।

৮

সুশাসনে দেশ চালাচ্ছিল আনাইৎ, সবাই ভারি খুশি। কেউ টেরই পেলে না যে রাজা সফরে গেছে। রানীর নিজের কিন্তু দুর্ভাবনার শেষ ছিল না: নির্দিষ্ট মেয়াদের পরেও দিন দশেক কাটল, অথচ ভাচাগানের দেখা নেই। রাত্রে কেবলি দুঃস্বপ্ন দেখত সে; দিনে নানারকম অপচ্ছায়া হানা দিত। কুকুর জাঙ্গি কেবলি ডাকে, ঘেউ ঘেউ করে। ভাচাগানের ঘোড়া খাবার ছোঁয় না, মা-হারা বাচ্চার মতো কেবলি কাঁদে। মুরগীরা ডাকতে লাগল মোরগের মতো, আর মোরগরা সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় ডাকতে লাগল ডাহুকের মতো। নদীর ঢেউ চলেছে অথচ কলকল ছলছল শব্দ নেই। নির্ভীক আনাইতের মনেও ভয় হল। এমন কি নিজের ছায়া দেখে নিজেরই ভয় হতে লাগল।

একদিন তার কাছে খবর এল, দামী একটা মাল নিয়ে বেচতে এসেছে সওদাগর।

অজানা লোকটাকে নিয়ে আসার হুকুম দিলে আনাইৎ।

ভয়ংকর চেহারার একটা লোক মহারানীকে আভূমি কুর্ণিশ করে রুপোর থালে করে নামিয়ে দিলে সোনার জরিদার কাপড়খানা। রানী সেদিকে চাইলে কিন্তু নক্সার দিকে নজর না করে বললে:

'কত দাম তোমার কাপড়খানার?'

'মহারানী যদি কেবল মালমশলা আর কাজের দাম ধরেন তো সোনার চেয়ে তিনশগুণ দামী। আর আমার মেহনৎ আর উদ্যোগের দাম সে আপনিই বুঝবেন।'

'বলো কী, এত দাম?'

'মহারানী, এ কাপড়ের অসীম গুণ। এই যে নক্সা দেখছেন, এ সাধারণ নক্সা

নয়, কবচ। এ-কাপড় যিনি পরবেন, সারা জীবন তিনি শোক দুঃখ থেকে মুক্তি পাবেন।'

'তাই নাকি?' এই বলে আনাইৎ কাপড়খানা খুলে দেখলে; কোনো কবচ আঁকা নেই তাতে, আছে কেবল নক্সার আকারে লিপি। চুপ করে তা পড়ে গেল আনাইৎ:

'অতুলনীয়া আমার আনাইৎ, ভয়ঙ্কর এক নরকে গিয়ে পড়েছি আমি। এই কাপড়ের যে মালিক, সে এই নরকের রক্ষক পিশাচদের একজন। ভাগিনাকও আছে আমার সঙ্গে। আমাদের খোঁজ করো পেরোজ নগরের পুবে, প্রাচীর ঘেরা মন্দিরের তলে। তোমার সাহায্য নইলে আমরা সবাই মারা পড়ব।

ভাচাগান।'

দুরু দুরু বুকে আনাইৎ দু'বার তিনবার করে পড়লে লিপিটা। ভান করলে যেন নক্সাই দেখছে মুগ্ধ হয়ে। বললে:

'ঠিক বলেছ, তোমার কাপড়ের নক্সায় মন হালকা করার শক্তি আছে। সকালেও আমার ভারি মন খারাপ ছিল, এখন বেশ হালকা লাগছে, খুশি লাগছে। এ কাপড়ের দাম নেই। এর জন্যে অর্ধেক রাজত্ব দিলেও আমার দুঃখু হবে না। তবে, তুমি নিশ্চয় জানবে, শিল্প কখনো শিল্পীর চেয়ে বড়ো নয়।'

'মহারানী দীর্ঘজীবী হোন, সত্যি কথাই বলেছেন আপনি!'

'এই কাপড়খানা যে করেছে তাকে নিয়ে এসো আমার কাছে। যেমন তোমায় তেমনি তাকেও খেলাৎ করা উচিত।'

লোভী পুরোহিত বললে, 'মহারানী, কে যে করেছে তা আমি জানি না। এটি আমি কিনেছি হিন্দুস্তানে এক ইহুদীর কাছ থেকে, সে আবার কিনেছিল এক আরবীর কাছ থেকে, আর আরবী যে কোথা থেকে পেয়েছিল কেউ জানে না!'

'কিন্তু তুমি তো নিজেই বললে যে কেবল মালমশলা আর কাজের দামই এত। তার মানে কাপড়খানা কেনা নয়, তুমিই সেটা বুনিয়েছ।'

'মহারানী, হিন্দুস্তানে আমি তাই শুনেছিলাম, আর আমি...'

'চুপ কর!' চটে উঠে বললে আনাইৎ, 'আমি জানি তুই কে!.. ওহে কে আছ, লোকটাকে বন্দী করে অন্ধকূপে আটকে রাখো!'

৯

এ আদেশ পালিত হবার পর আনাইৎ হুকুম দিলে বিপদের ভেরী বাজাতে। আশঙ্কায় ফিসফাস করে কথা কইতে কইতে নগরবাসীরা সবাই এসে জড়ো হল প্রাসাদের সামনে। কেউ জানে না ব্যাপার কী।

এমন সময় অলিন্দে এসে দাঁড়াল আনাইৎ, আপাদমস্তক সে সশস্ত্র।

বললে, 'নগরবাসীরা শোনো, তোমাদের রাজার জীবন বিপন্ন। যারা তাকে ভালোবাসো, যারা তার জীবন বাঁচাতে চাও, তারা এসো আমার সঙ্গে। দুপুরের মধ্যেই আমাদের গিয়ে হাজির হতে হবে পেরোজ নগরে।'

এক ঘণ্টার মধ্যেই হাতিয়ার নিয়ে তৈরি হয়ে গেল সবাই। সুন্দর একটি ঘোড়ায় চেপে আনাইৎ হুকুম দিলে, 'চলো এগিয়ে! আমার পেছন পেছন!' আর গিয়ে হাজির হল একেবারে পেরোজে। নগরের চত্বরে এসে উত্তেজিত ঘোড়াকে থামালে আনাইৎ। অধিবাসীরা ভাবলে বুঝি আকাশ থেকে কোনো দেবী নেমে এসেছেন, নতজানু হয়ে তারা আভূমি প্রণত হল।

'কে তোমাদের কর্তা?' সদর্পে জিজ্ঞেস করলে আনাইৎ।

'হুজুরাণীর দাসানুদাস আমিই এখানকার কর্তা,' বললে অধিবাসীদের একজন।

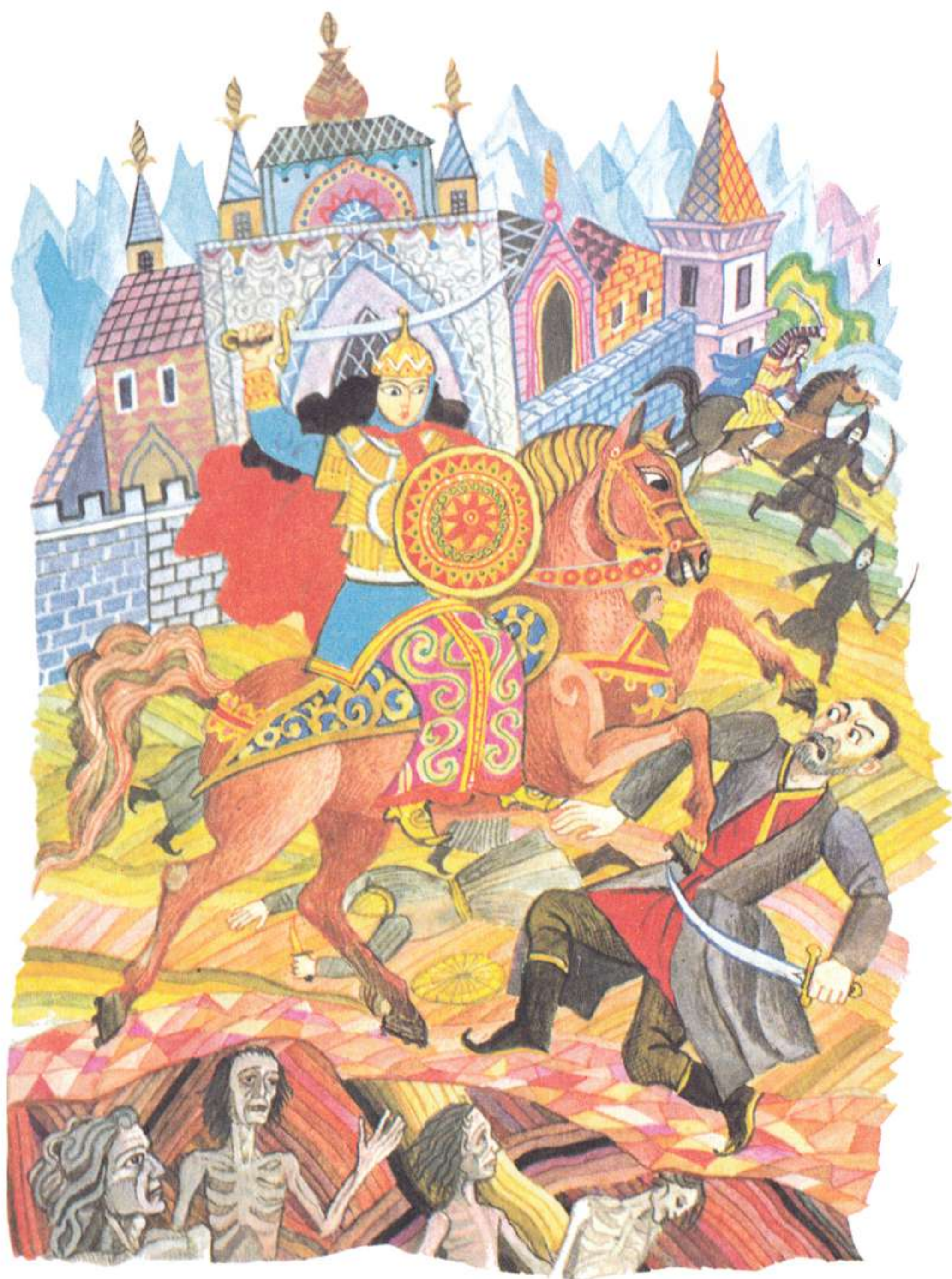
'কোনো কিছু খেয়াল নেই তোমার, জানো না কী চলছে তোমাদের দেব-মন্দিরে!'

'দাসানুদাস সত্যিই জানে না,' কুর্নিশ করলে লোকটা।

'মন্দিরটা কোথায় তাও জানো না হয়ত?'

'তা জানব না কেন হুজুরাণী!'

'তাহলে আমায় পথ দেখাও!'



আনাইৎকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল নগরপাল। তাদের পেছন পেছন চলল এক দল লোক। পুরোহিতরা ভাবলে, আরাধনার জন্যে লোকে আসছে তাদের কাছে, প্রথম লোহার দরজাটা তারা খুলে দিলে। আনাইৎ চত্বরে এসে হুকুম দিলে মন্দিরের দরজা খুলতে। তখন খেয়াল হল পুরোহিতদের ব্যাপার কী। প্রধান পুরোহিত ধেয়ে এল আনাইতের দিকে, কিন্তু তার বুদ্ধিমান ঘোড়া খুরে চেপেই পিষে দিলে তাকে।

ইতিমধ্যে সৈন্যসামন্তেরাও এসে পড়ে বাকি পুরোহিতদেরও চটপট শেষ করে দিলে। ভয়ে বিস্ময়ে লোকে ব্যাপার দেখতে লাগল।

আনাইৎ বললে, 'এগিয়ে এসে দেখো, তোমাদের দেবমন্দিরের পুরোহিতদের গুপ্তকীর্তি!'

মন্দিরের দরজা ভেঙে ফেলা হল তাড়াতাড়ি। লোকে দেখলে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য। পাতালের গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল লোকে: মনে হয় যেন মরণের ওপার থেকে আসা প্রেত। অনেকেরই মরো মরো অবস্থা, কোনোক্রমে দাঁড়িয়ে আছে। আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে কেউ কেউ পিঁপড়ের মতো ঘুরপাক খেতে লাগল। সবচেয়ে শেষে বেরুল ভাচাগান আর ভাগিনাক। ওরা বেরল চোখ ঢেকে, দিনের ঝকঝকে আলোয় যাতে কানা না হয়ে যায়। পাতালের গহ্বরে ঢুকে সৈন্যরা মৃতদেহ আর নির্যাতনের সব যন্ত্রপাতি বয়ে আনতে লাগল। লজ্জিত নগরবাসীরা সাহায্য করতে লাগল তাদের।

চটপট একটা লড়ুইয়ে ছাউনি ফেলা হয়েছিল, সেখানে অপেক্ষা করছিল ভাচাগান আর ভাগিনাক। আনাইৎ এসে মিলিত হল সেখানে। পাশাপাশি বসলে যুগলে, দু'জন দু'জনকে দেখে আর আশ মেটে না। ভাগিনাক মহারানীর হাত ছুঁয়ে কেঁদে বললে:

'মহারানীর তুলনা নেই, আমাদের আজ আপনি বাঁচালেন!'

ভাচাগান বললে, 'ভুল হল তোর ভাগিনাক, মহারানী আমাদের বাঁচিয়েছে সেই অনেক আগেই, যখন শুধিয়েছিল, তোমাদের যুবরাজ কাজ জানে কিছু? মনে আছে, জবাবে তুই কী ভাবে হেসেছিলি।'

১০

রাজা ভাচাগানের এই দুর্বিপাকের সংবাদ রটে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে। এমন কি দেশ বিদেশেও সে কথা ছড়ায়, ভাচাগান আর আনাইৎকে নিয়ে ধন্য ধন্য করে সবাই। 'আশুগরা' — চারণেরা তাদের নিয়ে গান বাঁধে। খেদের কথা, সে গান আমাদের কাল পর্যন্ত পৌঁছোয় নি, তবে ভাচাগান আর আনাইতের কাহিনীটা রয়ে গেছে।

হরিণপুত্র ও সুন্দরী এলেনার কাহিনী

(জর্জীয় রূপকথা)





সত্যি হোক, মিথ্যে হোক, এক দেশে ছিল এক ভারি ধনী রাজা। একদিন সে তার শিকারীদের বললে:

'শিকারে গিয়ে প্রথম যে জন্তুকে দেখবে তাকেই বধ করবে।'

চলল শিকারীরা। যেতে যেতে দেখে কি — তৃণভূমিতে এক হরিণ-মা। রাজার কথামতো তাকে বধ করার জন্যে হাতিয়ার তুলে ধরতেই দেখে হরিণীর দুধ খাচ্ছে এক শিশু। হাতিয়ার দেখেই ছেলেটা হরিণীর বাঁট ছেড়ে দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগল।

ভারি অবাক হয়ে গেল শিকারীরা।

ছেলেটিকে নিয়ে এল তারা রাজার কাছে, সব কথা বললে।

রাজার এক ছেলে ছিল, এরই সমবয়সী।

দুটি ছেলের একসঙ্গে খ্রীষ্টদীক্ষা হল, বনে পাওয়া ছেলেটির নাম দেওয়া হল হরিণপুত্র।

রাজপুত্রের সঙ্গে হরিণপুত্রও বড়ো হয়, একই ঘরে শোয়, একই মায়ের দুধ খায়।

কেউ বাড়ে বছরে, এরা বাড়ে দিনে দিনে। বারো বছর বয়স হল।

রাজার আনন্দ ধরে না, বড়ো হয়ে উঠছে তার দুটি ছেলে।

একদিন ছেলেদুটি মাঠে গেছে তীর ধনু নিয়ে। রাজপুত্র একটি তীর ছুড়লে. এক বুড়ি সে সময় কলসী ভরে জল আনছিল। সে তীর লেগে হাতল ভেঙে গেল কলসীর।

বুড়ি ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে:

'তোকে আমি শাপ দেব না, বাপের এক ছেলে তুই, কিন্তু মন যেন তোর পোড়ে সুন্দরী এলেনার প্রেমে।'

হরিণপুত্রের অবাক লাগল:

'কী বলছে বুড়িটা?'

রাজপুত্র কিন্তু সেই দিন থেকেই ভাবে কেবল এই সুন্দরী এলেনার কথা। মনে ওর ভালোবাসা এল, শান্তি নেই এতটুকু।

কী করা যাবে? তিন হপ্তা কাটল। রাজপুত্র যেন আধমরা, অদেখা সুন্দরীর প্রেমে হৃদয় ওর জরো জরো।

হরিণপুত্র একদিন তাকে বললে:

'সুন্দরী এলেনাকে যদি তোর কাছে না এনে দিই তবে তোর এই পালিত ভাই যেন মরে।'

রাজার কাছে গিয়ে বললে:

'বাবা, কামারকে বলো আমায় যেন লোহার পাদুকা আর লোহার তীর ধনু বানিয়ে দেয়। সুন্দরী এলেনার খোঁজে যাব।'

রাজী হল বাপ। হরিণপুত্রের জন্যে লোহার পাদুকা আর দুই মণ ওজনের লোহার তীর ধনু বানানো হল, রাজপুত্রের সঙ্গে রওনা দিলে সে।

বিদায় জানিয়ে ধর্মবাপকে বললে হরিণপুত্র:

'ভয় পেয়ো না বাবা: হরিণপুত্র যেখানে আছে সেখানে ভয়ের কিছু নেই। দুই বছর অপেক্ষা কোরো আমাদের জন্যে। যদি ফিরি তো ফিরব গৌরব নিয়ে, নইলে বুঝবে বেঁচে নেই।'

চলেছে দুই পুত্র, চলেছে। গেল এক দুর্ভেদ্য ঘন বনের মধ্যে। দেখে কি — বনের মধ্যে এক উঁচু পাহাড় — পাহাড়ের ওপর এক মস্ত পুরী। পুরীর সামনে অপূর্ব বাগান। সে পুরীতে থাকে যত পঞ্চমুণ্ডু নয়মুণ্ডু দানব।

রাজপুত্র বললে হরিণপুত্রকে:

'বড়ো ক্লান্ত হয়ে গেছি ভাই, এখানে একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক।'

'বেশ,' বললে হরিণপুত্র।

রাজপুত্র শুয়ে চোখ বুজলে।

হরিণপুত্র বললে:

'তুই শুয়ে গড়িয়ে নে, আমি বাগানে গিয়ে তোর জন্যে নিয়ে আসব ভালো ভালো সব ফল।'

ওরা যেন দুই ভাই নয়, ছেলের জন্যে বাপের যেমন যত্ন, রাজপুত্রের জন্যেও তেমনি যত্ন হরিণপুত্রের।

বাগানে গিয়ে ভালো আপেল গাছটির কাছে গিয়ে ফল ছিঁড়ল হরিণপুত্র।

অমনি ছুটে এল নয়মুণ্ডু দানব। হাঁক দিলে:

'কে তুই, আমার বাগানে এসেছিস এত স্পর্ধা তোর? আমার দাপটে আকাশের পাখিও আসে না এখানে, মাটির পিঁপড়েও উঁকি দেয় না!'

'আমি হরিণপুত্র!' হাঁক দিলে হরিণপুত্র।

শুনেই পেছিয়ে গেল দানব। মনে মনেই কেবল গজরানি।

কেননা দানব জানত, হরিণপুত্র এলেই দানবদের দিন শেষ।

আতঙ্কে ছোটাছুটি লাগালে দানবেরা, লুকালে যে যেখানে পারে।

সব দানবকে কেটে ফেললে হরিণপুত্র: রয়ে গেল কেবল পঞ্চমুণ্ডু এক দানব — সে গিয়ে লুকিয়েছিল চিলেকোঠায়।

রাজপুত্র ওদিকে আপন মনে ঘুমচ্ছে গাছের ছায়ায়।

বাড়িখানাকে দানবশূন্য করে হরিণপুত্র ফিরে এসে ভাইকে জাগালে। দানবপুরী আর দানবদের যতকিছু ধনসম্পদ সবই হল ওদের।

দুই ভাই বাগানে ঘুরে বেড়ায়, আমোদ করে। আর পঞ্চমুণ্ডু দানব বাবাখাঞ্জমি ওদিকে চিলেকোঠায় বসে বসে কাঁপে।

শেষ পর্যন্ত নিজের কোণটি ছেড়ে নিচে নেমে এসে বললে হরিণপুত্রকে:

'মেরো না আমায়, তোমার ভাইয়ের মতো হয়ে থাকব। আমাদের ধনসম্পদ সব তুমিই নাও।'

হরিণপুত্র হাসলে।

পঞ্চমুণ্ডু দানব তারপর জিজ্ঞেস করলে:

'আচ্ছা, কী প্রয়োজনে পথে বেরিয়েছ বলো তো, পৃথিবী ঘুরে মরছ, শহর গ্রাম ঢুঁড়ছ?'

হরিণপুত্র বললে:

'আমাদের কেবল একটি উদ্দেশ্য। সিদ্ধ না হলে কিন্তু এ সব দানবদের মতো তোকেও নিশ্চিহ্ন করব!'

এই বলে জানাল:

'সুন্দরী এলেনার খোঁজে বেরিয়েছি আমরা। আমাদের সঙ্গে তোকেও যেতে হবে।'

বাবাখাঞ্জমির ছিল একটা ছোট্ট বাড়ি, সেটি সে পিঠে তুলে নিয়ে যেত যেখানে দরকার।

বললে:

'এই ঘরের মধ্যে গিয়ে বসো, সুন্দরী এলেনার সন্ধানে বেরুব, তবে কাজটা সহজ নয়। ওর পাণিপ্রার্থী কিন্তু অনেক।'

ঘরে গিয়ে বসে রওনা দিলে ওরা।

চলল ওরা মাস তিনেক ধরে। শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছল এক নদীর কাছে।

রাজপুত্র বললে হরিণপুত্রকে, 'হাঁপিয়ে গেছি, একটু জিরিয়ে নেব।'

বাবাখাঞ্জামি তো আরোই হাঁপিয়ে গেছে। ঘর থেকে নেমে দু'ভাই নদীর পাড়ে বসে জিরতে লাগল।

তেষ্টা পেল, জল খেয়ে দেখে কিন্তু নোনা।

অবাক লাগল হরিণপুত্রের:

'এ জল নোনা হল কিসে?'

বাবাখাঞ্জামি বলে, 'এ জল নয়, অশ্রু। ওই ওপরে থাকে এক পঞ্চমুণ্ডু দানব, সেও ভালোবাসে সুন্দরী এলেনাকে, কিন্তু কিছুতেই পায় না। প্রেমে ও জ্বলে পুড়ে মরছে। চোখের জল ওর নদীর মতো বইছে।'

অবাক হয়ে হরিণপুত্র বলে:

'সুন্দরীকে যদি আমার ভাইয়ের জন্যে এনে দিয়ে বিয়ে না দিই তাহলে আমি হরিণপুত্রই নই।'

সেই দানবের কাছে গিয়ে হরিণপুত্র বলে:

'কী রে দানব? সুন্দরী এলেনাকে খুবই ভালোবাসিস নাকি?'

দানব কাঁদে, চোখের জলের স্রোত নামে।

বলে, 'একটি বার যদি কেবল তাকে দেখতে পেতাম, তাহলে মরতেও রাজী।'

'বেশ তো, ওকে নিয়ে বাড়ি যাবার পথে তোকে দেখিয়ে যাব।'

চলল ওরা এগিয়ে।

আরো কয়েক মাস কাটল। ওরা চলেছে তো চলেছেই। জন্তুজানোয়ার পেলেই মারে, কাটে, খাবার তবু কুলায় না। এই করে এসে পৌঁছল এক কাননে। সুন্দরী এলেনার কোনো খবরই কিন্তু নেই।

হরিণপুত্র বলে:

'ঐ যে দূরে একটা ছোট গ্রাম দেখা যাচ্ছে, সেখানে চললাম আমি, জিজ্ঞেস করে দেখব, হয়ত সুন্দরী এলেনার খবর জানে তারা।'

ঘরের মধ্যে রইল বাবাখাঞ্জামি আর রাজপুত্র। এগিয়ে গেল হরিণপুত্র।

একটা ভাঙা কুটিরের মধ্যে এক বুড়িকে দেখে হরিণপুত্র জিজ্ঞেস করলে:

'দুনিয়ার সব মায়ের স্নেহের দোহাই রইল, আমায় তুমি বলো মা, কোথায় পাব সুন্দরী এলেনার খোঁজ, কোন কেল্লায় সে থাকে?'

অবাক লাগল বুড়ির। সুন্দরী এলেনার কাছে যাওয়া যে কী কঠিন তা সে জানত, তাই অবাক লাগল ছেলেটির অমন সরল কথা শুনে।

বললে, 'এ ভারি কঠিন কাজ বাছা, বুঝতে পারছি তুমি তার কিছুই জানো না। ওকে ভালোবাসে পবনরাজ, কেবলি খোঁজ করে, ভাবে হরণ করে নিয়ে যাবে। তাই সুন্দরীকে রাখা হয়েছে নয়-নয়টা তালা বন্ধ করে। পাছে ওকে হরণ করে এই ভয়ে সূর্যের মুখ দেখাও তার বন্ধ।'

সবই বললে বুড়ি, কোথায় আছে সুন্দরী এলেনার গড়। সে এক মস্ত বাগিচা, তার চারধারে উঁচু পাঁচিল। সেই বাগিচার গহনে এক গড়। সেই গড়ে থাকে সুন্দরী এলেনা আর তার আত্মীয় স্বজন।

হরিণপুত্র বলে, 'কী করে পৌঁছুই সেখানে। আমার ভাই চায় তাকে বিয়ে করবে।'

বুড়ি বলে, 'সে যে বড়ো কঠিন কাজ। তার পাণিপ্রার্থী অনেক, তোমার ভাইয়ের হাতে সম্প্রদান করবে না: যারা বিয়ে করতে চায় তাদের সে দেয় তিনটে কাজ: পূরণ করতে পারলে বিয়ে, নইলে প্রাণ যাবে।'

হরিণপুত্র হাসলে। কী আর এমন কাজ দেবে যা আমরা পারব না? এই ভেবে সে ফিরে এল তার ভাই আর বাবাখাঞ্জমির কাছে।

বাড়িটি পিঠে তুলে রওনা দিলে দানব।

পৌঁছল গিয়ে গড়ের কাছে।

আগে গেল হরিণপুত্র।

সুন্দরী এলেনার মা কিন্তু মায়াবিনী, মানুষকে সে মেরে আবার বাঁচিয়ে দিতে পারে।

হরিণপুত্রের দিকে তাকিয়ে চোখ আর তার সরে না — এমন সুঠাম, সুপুরুষ!

'কে তুমি, কী ধরনের মানুষ। এখানে এলে কী উদ্দেশ্যে?'

হরিণপুত্র বললে:

'এসেছি বন্ধুর মতো, শত্রুর মতো নয়।'

'কী চাই তোমার?'

'তোমাদের সুন্দরী এলেনাকে চাই বৌদি করব।'

এলেনার তিন ভাই। তিন ভাইই সে সময় বনে গেছে শিকারে।

সুন্দরী এলেনার মা বললে, 'এইখানে বোসো, ভাইয়েরা আসুক, কথাবার্তা হোক, ঠিকঠাক করে নিয়ো।'

বাগানে বসে বসে ভাইয়েদের জন্যে অপেক্ষা করে হরিণপুত্র।

এদিকে রাজপুত্র আর বাবাখাঞ্জমির তর আর সয় না; ভয় হয় পবনরাজ যদি তার ভাইয়ের পেছনে লেগে মেরে ফেলে তাকে। ঠিক করলে গিয়ে দেখবে।

অন্ধকার হতেই সুন্দরী এলেনার ভাইয়েরা এসে পৌঁছল। একজনের পিঠে একটা আস্ত হরিণ, আরেকজনের পিঠে একটা ছাগ, আর তৃতীয়ের পিঠে একটা আস্ত কাঠের গুঁড়ি আগুন জ্বালাবার জন্যে।

অন্যরকম গন্ধ পেলে ভাইয়েরা। মাকে জিজ্ঞেস করলে:

'কে এসেছে মা?'

'বন্ধুর মতো এসেছে বাছা, ওর গায়ে হাত দিস নে,' বললে মা।

ওদিকে তখন রাজপুত্রকে নিয়ে এসেছে বাবাখাঞ্জমি। রাজপুত্র দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে কী হয়।

হরিণের ছাল ছাড়াতে বসলে ভাইয়েরা। হরিণপুত্রও এসে যোগ দিলে। ভাইয়েরা যখন একটা পা খালাস করেছে, হরিণপুত্র তখন গোটা হরিণটারই ছাল ছাড়িয়ে শেষ। সুন্দরী এলেনার ভাইয়েরা দেখে অবাক।

খেতে বসা হল। মস্ত একেক টুকুরো মাংস খেলে হরিণপুত্র। ভাইয়েরা আশ্চর্য।

খেয়ে দেয়ে শোয়া হল।

সকাল হতে সুন্দরী এলেনা বললে:

'আমার তিনটে কাজ করতে পারলে বিয়ে করব, নইলে নয়।'

রাজপুত্রকে নিয়ে আসা হল সুন্দরীর কাছে। এলেনা কথা বলে আর রাজপুত্র দাঁড়িয়েই থাকে, মুখে রা নেই। হয়েছে কি, এলেনার মা যাদু করেছিল রাজপুত্রকে, বেহুঁস করে দিয়েছিল, কিছুই বুঝতে পারে না বেচারী, দাঁড়িয়ে থাকে পাথরের মতো।

'বেরিয়ে যাও বাপু!' রাজপুত্রকে তাড়িয়ে দিলে সুন্দরী।

রাজপুত্র বেরিয়ে এল মাতালের মতো। হরিণপুত্র ছুটে এসে শুধোয়:

'কী বললে এলেনা?'

'জানি না ভাই, কিছুই বুঝতে পারলাম না।'

রাগ হল হরিণপুত্রের। ফের এসে বললে, রাজপুত্রকে যেন দ্বিতীয় বার সুযোগ দেয় সুন্দরী।

সুন্দরী রাজী হল। বর কিন্তু দ্বিতীয় বারও চুপ করে রইলে, বেরিয়ে এল যেন স্বপ্নের ঘোরে।

বাবাখাঞ্জমিকে হরিণপুত্র বললে সব কথা। পরামর্শ করলে। তারপর তিনবারের বার সুযোগ দেবার জন্যে অনুরোধ করলে সুন্দরীর কাছে। রাজপুত্র কিন্তু ফের সেই পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকে, বুড়ি তাকে ফের যাদু করেছিল। এই সময় বাবাখাঞ্জমি এসে যাদু কাটাবার মন্ত্র লেখা কাগজখানা ছুড়ে ফেলে দিলে ঘরের মধ্যে।

অমনি দুলে উঠল দেয়াল, জ্ঞান ফিরে এল রাজপুত্রের। সম্বিত ফিরতেই দেখে সুন্দরী এলেনা, ছুটে গিয়ে তার হাত চেপে ধরে রাজপুত্র বললে:

'তুমি আমার, আমার!'

খুশি হল হরিণপুত্র, সুন্দরী এলেনাও খুব খুশি। জানত সে মা সব পাণিপ্রার্থীদের যাদু করে দিয়ে তার বিয়ে আটকে রাখত।

বরকনে বেরিয়ে এল, চারিদিকে আমোদ আহ্লাদ।

পরদিন সকালে বরকনে বাগিচায় বেড়াচ্ছে; হরিণপুত্রও একটু দূর থেকে ওদের দেখছে, আনন্দ তার আর ধরে না।

এমন সময় চোখে পড়ে গেল পবনরাজের। ভীষণ এক ঘূর্ণিঝড় তুলে সে রাজপুত্রকে জাপটে ধরে পাক খাইয়ে উল্টে আছড়ে ফেললে মাটিতে। আর সুন্দরীকে ধরে উড়িয়ে নিয়ে গেল আকাশে।

হরিণপুত্র দেখলে, ভাইয়ের নিঃশ্বাস নেই। শোকে মৃতপ্রায় হয়ে সে সুন্দরী এলেনার কথা ভুলে গেল। বুড়ি সেই পবনরাজের কথা যা বলেছিল, সেটা যখন মনে পড়ল তখন আর উপায় নেই।

বসে বসে ভাইয়ের জন্যে কাঁদে হরিণপুত্র।

সুন্দরী এলেনার মা এসে বলে:

'কাঁদিস নে, ওকে আমি বাঁচিয়ে দেব, কিন্তু এলেনাকে যে হরণ করে নিয়ে গেল সেই দুঃখের কী উপায় হবে জানি না।'

রুমাল নিয়ে এসে কুমারের মুখে বুলিয়ে দিতেই বেঁচে উঠল রাজপুত্র। উঠে বসে চোখ মুছে বলে:

'কী ঘুম ঘুমিয়েছি!'

তারপর তাকিয়ে দেখে, সুন্দরী এলেনা নেই। ফোঁপাতে শুরু করে, কাঁদতে শুরু করে, 'কী করি এখন? কী হবে?!'

হরিণপুত্র বাবাখাঞ্জমির কাছে এসে বললে:

'পবনরাজ আমাদের কনেকে হরণ করেছে, যে করেই হোক তাকে উদ্ধার করা চাই।'

দানব বলে, 'তোমায় যদি সাহায্য না করি তবে বাবাখাঞ্জমি যেন মরে। আমার ডান কানে খুঁজে দেখো, একটা ঘোড়ার জিন পাবে। বাঁ কানে পাবে লাগাম চাবুক। আমায় জুতে নিয়ে চলো।'

সুন্দরী এলেনার বাড়িতে রাজপুত্রকে রেখে দিয়ে বাবাখাঞ্জমিকে জুতলে; পাঁচ বাঁধনে বাঁধলে, পাঁচ লাগাম টানলে।

বাবাখাঞ্জমি বললে, 'এবার আমার পিঠে ওঠো। তিনবার চাবুক কষে নয় চিলতে ছাল তোলা চাই। অমনি উড়তে আরম্ভ করব আমি, তবে দেখো ভয় পেয়ো না!'

রাজপুত্রের কাছে বিদায় নিলে হরিণপুত্র।

'এইখানে বসে অপেক্ষা কোরো, আমরা চললাম সুন্দরী এলেনার খোঁজে।'

লাফিয়ে উঠল দানবের পিঠে, তিনবার এমন জোরে চাবুক কষলে যে নয় চিলতে চামড়া উঠে গেল। ককিয়ে উঠল দানব, শিস দিয়ে উঠল, মাটির ওপর ঝাপট মেরে উঠে গেল বাতাসে, মেঘ ফুঁড়ে উড়ে চলল। আকাশ বেয়ে উড়তে উড়তে গিয়ে পৌঁছল এক মাঠের মধ্যে।

সে মাঠে এক বুড়ি। হরিণপুত্র শুধোয়:

'কোথায় থাকে পবনরাজ?'

বুড়ি হায় হায় করতে লাগল:

'হায় বাছা, কেন এলি এখানে? মানুষের গন্ধ টের পায় সে, আমাদের সবাইকে সে ছারখার করে! কী সাহসে তুই দেখা দিলি এখানে? কিছুদিন আগে সে নিয়ে এসেছে একটি মেয়েকে, ধরায় কেউ তেমন সুন্দরী কখনো দেখে নি, আর সে কী ঝড়, সে কী গর্জন, সে কী শনশন — আশেপাশের সবকিছু একেবারে তাতে ছারখার।'

হরিণপুত্র বলে, 'সেই সুন্দরীর জন্যেই আমার আসা। তার কাছে আমায় নিয়ে চলো।'

বুড়ি বললে, 'বেশ।'

নিজে এদিকে কাঁপে, ভয়ে নিঃশ্বাসও পড়ে না।

দানবের পিঠ থেকে নেমে এল হরিণপুত্র, জিন লাগাম চাবুক সব কানের মধ্যে লুকিয়ে রেখে চলে গেল বুড়ির সঙ্গে।

দানব রইল। হাঁটাহাঁটি করে সে, এদিক ওদিক দেখে, তছনছ করে, পবনরাজের সবক'টি মুর্গি খেয়ে শেষ করে।

পবনরাজের গড় পর্যন্ত হরিণপুত্রকে পৌঁছে দিয়ে বুড়ি চলে গেল।

রাজা তখন গেছে শিকারে, সুন্দরী এলেন। একা বসে আছে গড়ে। বসে বসে কাঁদে।

হরিণপুত্র এসে লাথি দিয়ে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকল।

সুন্দরী বলে, 'এখানে এলে কী করে? আর কেমন আছে সেই অসুখী মানুষটি?'

কোলাকুলি করলে ওরা, চুমু খেলে।

হরিণপুত্র সব কথা জানিয়ে বললে:

'তোমায় নিতে এসেছি আমি।'

'বলো কী! আমায় নিয়ে যাওয়া তোমার কম্ম নয়। মুখপোড়া পবনরাজ আমাদের দু'জনকেই মেরে ফেলবে।'

বুড়ির কাছে এসে হরিণপুত্র বলে:

'বলো বুড়ি, কী করে উদ্ধার করি সুন্দরীকে, কী করে নিধন করি পবনরাজকে।'

বুড়ি বললে, 'সুন্দরীকে গিয়ে বলো, পবনরাজ বেরিয়ে যেতেই সে যেন ঘরের এক কোণ ফুল দিয়ে সাজায় আর ফিরলে যেন মুখভার করে তাকে ঘরে তোলে; যেন ভাব করে যে পবনরাজের বিরহে কাতর।'

তাই করা হল। পবনরাজ শিকারে যেতেই ফুল তুললে সুন্দরী এলেনা, ছেলেমানুষের মতো তাই নিয়ে খেলাপাতি শুরু করলে, ফুল দিয়ে সাজালে ঘরের এক কোণ। সন্ধ্যের দিকে রাজা ফিরে এসে দেখে শুনে অবাক হয়ে শুধোয়:

'এ সব কী, তুই একেবারে ছেলেমানুষের মতো ফুলপাতি নিয়ে খেলা জুড়েছিস?'

সুন্দরী বলে, 'তাছাড়া কী করি? তুমি ঘরে নেই, কী নিয়ে ভুলে থাকি বলো। তুমি যদি বলতে তোমার প্রাণটা কোথায়, তাহলে এত খারাপ লাগত না।'

'আমার প্রাণ কোথায় তা জেনে কী হবে তোর সুন্দরী?'

'কী হবে মানে? জানা থাকবে, তুমি ঘরে না থাকলে তাকেই আদর করব। আমি তোমার বৌ, বলো না আমায়।'

পবনরাজ বললে:

'বেশ, তাহলে বলছি।'

গড়ের ছাতে নিয়ে গিয়ে পবনরাজ বললে:

'দেখেছিস, ঐ যে মাঠের মধ্যে এক হরিণ? তিনটে লোকে ওর ঘাস কাটে, আর ও একাই সব ঘাস খেয়ে ফেলে, ঘেসেড়েরা পেরে ওঠে না। এই হরিণের মাথার মধ্যে তিনটি কৌটো, আর সেই কৌটোর মধ্যে আমার প্রাণ।'

'কেউ যদি মেরে ফেলে ওই হরিণকে?' জিজ্ঞেস করে সুন্দরী।

'আমার তীর ধনুক ছাড়া কেউ ওকে মারতে পারবে না। ঐ তিন কৌটোয় বসে থাকে আমার তিন প্রাণপাখি। একটা পাখি মরলে আমার হাটু পর্যন্ত পাথর হয়ে যাবে, দ্বিতীয় পাখিটা মরলে আমার কোমর পর্যন্ত পাষাণ। তৃতীয় পাখিটাও যদি মরে তবেই আমার প্রাণ যাবে। এবার বুঝলি, কোথায় আমার প্রাণ?'

সকাল হল। পবনরাজ চলে গেল তার কাজে। সুন্দরী তার তীর ধনুক নিয়ে হরিণপুত্রকে দিয়ে বললে, কী করে প্রাণ নেওয়া যায় রাজার।

12*

হরিণপুত্রের আনন্দ আর ধরে না, তীর ধনুক নিয়ে গিয়ে বাণ মারলে। হরিণটিকে মেরে তার মাথা ভেঙে বার করলে কৌটো।

হরিণ মারা পড়তেই অমঙ্গল টের পেলে পবনরাজ। পড়িমরি সে ছুটে এল ঘরে।

প্রথম পাখির মাথা ছিঁড়তেই পা অবশ হয়ে গেল পবনরাজের।

দ্বিতীয় পাখির গলা ছিঁড়তেই দেহ তার আর নড়ে না; কোনোক্রমে চৌকাট পর্যন্ত পৌঁছিয়ে ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে বলে সুন্দরী এলেনাকে:

'বিশ্বাসঘাতকতা করলি?'

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে যাবে, কিন্তু তৃতীয় পাখিটাও চেপে ধরেছে হরিণপুত্র।

'তোর দুষ্কর্মের ফল ভোগ এবার!' পবনরাজকে এই বলে তৃতীয় পাখিরও মুণ্ডু ছিঁড়ে ফেলল সে।

প্রাণ হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল পবনরাজ, আর হরিণপুত্র সুন্দরী এলেনার কাছে এসে বললে:

'আর কী, এবার চলো!'

এলেনা বললে, 'শোনো বলি, নয় মহল পেরিয়ে দশ মহলে গিয়ে দেখবে পবনরাজের ঘোড়া বাঁধা আছে। এ ঘোড়া পবনঘোড়া, পিঠে চেপেই পলকে উড়ে যাব।'

ঘোড়াটি নিলে হরিণপুত্র, বাবাখাঞ্জমিকে ডাকলে। তার কান থেকে জিন লাগাম সব বের করে নিজে চাপলে দানবের ওপর, আর সুন্দরী এলেনাকে বসালে পবনঘোড়ার ওপর। তারপর রওনা দিলে।

সুন্দরী এলেনাকে সে পৌঁছে দিলে তার বরের কাছে। ধুমধাম করে বিয়ে হল। হরিণপুত্রকে ধন্য ধন্য করতে লাগল সবাই।

ওদিকে রাজার কিন্তু কেঁদে কেঁদে চোখ যায়। সারা রাজ্যে শোক করার হুকুম দিল সে। দুই কুমার মারা গেছে ভেবে দুঃখু করে, কাঁদে। তাদের জীবন্ত দেখবে এ আশা আর নেই।

এদিকে বীর কুমারেরা কনের বাড়িতে ভোজ খেয়ে বাবাখাঞ্জমির পিঠে ঘরে চেপে রওনা দিলে।

সুন্দরী এলেনার জন্যে কেঁদে কেঁদে যে নদী বইয়েছিল, সেই দানবের কাছ দিয়ে চলেছে ওরা।

হরিণপুত্র বলে:

'কী দানব, সুন্দরী এলেনাকে দেখবি নাকি?'

'হায় হুজুর হরিণপুত্র, কে বা তাকে দেখায়?

'তবে দ্যাখ,' বলে হরিণপুত্র।

সুন্দরীর দিকে চাইতেই কিন্তু রূপের আগুনে অন্ধ হয়ে গেল সে, পলকের মধ্যে দেহ ক্ষয়ে প্রাণ বেরিয়ে গেল তার। ওরাও চলল এগিয়ে।

রাত কাটালে সেই নয়মুণ্ডু দানবের পুরীতে, যাদের নিঃশেষ করেছিল হরিণপুত্র। রাত কাটিয়ে ফের চলল ওরা।

তখনো সামনে আরো পাঁচ মাসের পথ।

একটা বনের কাছে বিশ্রাম নিতে লাগল তারা।

হঠাৎ রাতের বেলায় উড়ে এল তিনটে পায়রা। গাছের ডালে বসলে। প্রথম পায়রা বলে:

'রাজা যেই শুনবে যে তার ছেলে আসছে সুন্দরী এলেনাকে নিয়ে, অমনি সে উপহার পাঠাবে হাতিয়ার। হাতিয়ার কিন্তু ছুটে যাবে, তাতে মারা পড়বে ছেলে। আর যে এই কথা শুনে কাউকে বলতে যাবে সেই পাষাণ হয়ে মারা পড়বে।'

'তাই হবে বটে,' সায় দিলে বাকি দুই পায়রা।

দ্বিতীয় পায়রা বলে:

'রাজপিতা যেই শুনবে ছেলে আসছে, অমনি বেরিয়ে এসে একটি ঘোড়া দেবে তাকে। ছেলে কিন্তু ঘোড়ায় চাপতে গিয়েই পড়ে মরবে।'

'তাই হবে বটে,' যোগ দিলে বাকি দুই পায়রা; সেই সঙ্গে বললে, 'আর যে এই কথা শুনে কাউকে বলতে যাবে সেই পাষাণ হয়ে মারা পড়বে।'

তৃতীয় পায়রা বলে:

'আরো বলি, ওরা এলেই, রাত্রে এসে পেঁছিবে গভেলেশাপি দৈত্য, রাজপুত্র আর সুন্দরী এলেনা — দু'জনকেই পিষে মেরে ফেলবে। আর যে এই কথা শুনে কাউকে বলতে যাবে সেই পাষাণ হয়ে মারা পড়বে।'

এই বলে উড়ে চলে গেল আবার।

হরিণপুত্র সব শুনলে কিন্তু ভাঙলে না।

সকাল হল। দানবের ঘরখানায় উঠে ফের রওনা দিলে তারা।

রাজা শুনলে, ছেলে আসছে জীবন্ত অক্ষত দেহে, সঙ্গে আনছে সুন্দরী এলেনাকে। ছেলের জন্যে হাতিয়ার পাঠালে রাজা। হরিণপুত্র কিন্তু আগেভাগে গিয়ে হাতিয়ার ছুড়ে ফেলে দিলে দূরে, বরকে ছুঁতে দিলে না।

দুঃখ হল রাজপুত্রের 'বাপ আমায় সম্মান করে হাতিয়ার পাঠালে। আর হরিণপুত্র তা ছুড়ে ফেলে দিলে।'

ছেলের জন্যে নিজের ঘোড়াটি পাঠাল রাজা। ঘোড়াটাও ফিরিয়ে দিলে হরিণপুত্র।

দুঃখ হল রাজপুত্রের কিন্তু কী করা যায়?

এসে পেঁছুল সবাই, বাপ এসে বরণ করলে, কুশল মানলে।

ধুমধাম করে বিয়ের ভোজ হল।

হরিণপুত্র এসে বাবাখাঞ্জমিকে ছেড়ে দিলে:

'তুই যা কাজ করেছিস তার জন্যে ধন্যবাদ। যা এবার, স্বাধীনভাবে থাকবি।'

দানব চলে গেল। হরিণপুত্র কিন্তু বাসর ঘরে গিয়ে দরজার আড়ালে লুকিয়ে রইল; বরকনে ঘুমোয়, কিন্তু হরিণপুত্রের ঘুম নেই। ঘুমুবে কী, সে আছে পাহারায়, বাগিয়ে ধরে আছে তলোয়ার। জানে তার ওপরেই বন্ধুর ভরসা।

মাঝ রাতে এল গুভেলেশাপি দৈত্যি। চুপি চুপি গিয়ে মুখ হাঁ করেছে, বরকনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের গলা টিপে মারবে, এমন সময় ঝপাং করে এসে পড়ল হরিণপুত্রের তলোয়ার। তার গলা কেটে, দেহ টুকরো টুকরো করে লুকিয়ে রাখল খাটের নিচে।

সকাল হল।

বরকনের ঘুম ভাঙল, কিছু টের পায় নি কী হয়েছিল রাতে।

বাসর ঘর পরিষ্কার করতে এসে লোকে দেখে, বরকনের পালঙ্কের নিচে মাংসের টুকরো। ভয়ানক রাগ হল রাজার — কে এই রসিকতা করেছে?

গুজগাজ ফিসফাস শুরু হল সবার। সব দোষ চাপল হরিণপুত্রের ঘাড়ে। ফেরার পথে সেই তো রাজপুত্রকে কোনো সম্মান দেখায় নি, হাতিয়ার দেয় নি, ঘোড়া ফিরিয়ে দিয়েছে। নিশ্চয় ওই এই উপহাসটা করেছে।

হরিণপুত্র বলে:

'আমি তোমাদের ভালো চেয়েই করেছি। এমন পথে আমায় ঠেলো না যাতে তোমরা হাসিখুশিতে বেঁচে থাকবে আর আমায় মরতে হবে।'

কিন্তু রাগ কারো যায় না, জিদ ধরে, বলতে হবে কী হয়েছিল, কেন হয়েছিল — সব বৃত্তান্ত।

হরিণপুত্র বলে, 'বেশ বলব, তবে দেখো যেন এই ভেবে তোমাদের দুঃখু করতে না হয় যে তোমাদের সুখের জন্যেই আমি প্রাণপাত করেছি আর তোমরাই আমায় মারলে।'

হরিণপুত্র জানালে, 'সেই যে রাতে আমরা বনের কাছে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, তখন তিনটে পায়রা এসে বসে ডালে। একটা পায়রা বলে, ওরা গেলেই রাজপিতা ছেলেকে হাতিয়ার পাঠাবে, কিন্তু সেই হাতিয়ার ছুটে গিয়ে ছেলেই মারা পড়বে। আর আমাদের এই কথা যে ফাঁস করবে সে পাথর হয়ে যাবে।'

এই কথা বলতেই হাঁটু পর্যন্ত পাষাণ হয়ে গেল হরিণপুত্রের।

তখন সবাই বুঝতে পেরে মিনতি করলে:

'থাক, আর বলিস নে, দরকার নেই!'

হরিণপুত্র বললে, 'না, শেষ পর্যন্ত বলব। দ্বিতীয় পায়রাটা বললে: রাজপিতা ঘোড়া পাঠাবে, কিন্তু ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে মারা পড়বে রাজপুত্র, আর যে একথা ফাঁস করবে সে পাথর হয়ে যাবে।'

এই বলতেই কোমর পর্যন্ত পাষাণ হয়ে গেল হরিণপুত্রের।

সবাই কাকুতি মিনতি করে, 'না, না, আর বলিস নে, দরকার নেই!'

হরিণপুত্র বলে, 'না, আগে আমার কথায় বিশ্বাস করো নি, এখন আর পার নেই। তৃতীয় পায়রা বললে: বরকনে বাসর ঘরে গেলেই গুভেলেশাপি রাক্ষস এসে ওদের খেয়ে ফেলবে...'

এই বলতেই গোটা দেহ তার পাষাণ হয়ে গেল।

রাজা আর রাজপুত্র তখন ডুকরে উঠে কেঁদে ভাসায়, কিন্তু তাতে কী আর শোক যায়?

সুন্দরী এলেনার পেটে তখন ছেলে, কিন্তু রাজপুত্রের তাতে সুখ নেই। ভাবে, 'না, যাই ঘটুক আমার কপালে, অনুগত বন্ধুকে আমায় বাঁচাতেই হবে।'

এই ভেবে সে তার লোহার পাদুকা পরে, লোহার দন্ড নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

যায় আর জিজ্ঞেস করে:

'বলতে পারো, আমার পাষাণ হয়ে যাওয়া ভাইকে কী করে বাঁচানো যায়?'

ক্লান্ত হয়ে সে এক বনের কাছে বসলে একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে। হঠাৎ দেখে এক বুড়ো বেরিয়ে আসছে। রাজপুত্র তাকেও জিজ্ঞেস করলে কী ভাবে বন্ধুকে বাঁচানো যায়। বুড়ো বললে:

'যা খুঁজে ফিরছিস, সে উপায় আছে তোর ঘরেই।'

রাজপুত্র বোঝে না ঘরে আবার কী উপায় আছে। বুড়ো বলে:

'তুই জানিস না যে তোর একটি ছেলে হয়েছে, সোনালী রঙের কোঁকড়া চুল। সেই ছেলেই তোর বন্ধুকে বাঁচাতে পারে। দোলনার মধ্যে সেই ছেলেটিকে মেরে, তাকে সেদ্ধ করে সেই জল ঢেলে দিস তোর ভাইয়ের পাষাণ দেহে — অমনি সে বেঁচে উঠবে।'

ঘরে ফিরল রাজপুত্র।

ভাবে, 'ছেলে আরো হবে, কিন্তু ভাইবন্ধু আর হবে না।'

ফিরে এসে দেখে, দোলনায় শুয়ে আছে ছেলে, শশিকলার মতো ধবধব করছে। জ্বলজ্বল করছে তার সোনালী চুলের চিকুর।

বৌকে বললে:

'সুন্দরী এলেনা, বুড়ো তো আমায় এই এই বললে।'

সায় দিলে এলেনা:

'যাই হোক, আমাদের হরিণপুত্র তো বাঁচুক।'

বুড়ো যা বলেছিল সব করা হল।

নড়েচড়ে উঠল হরিণপুত্র চোখ মেললে, বেঁচে উঠল।

সকালে দোলনার কাছে এসে দাঁড়ায় সুন্দরী এলেনা। মা তো, ছেলেকে উৎসর্গ

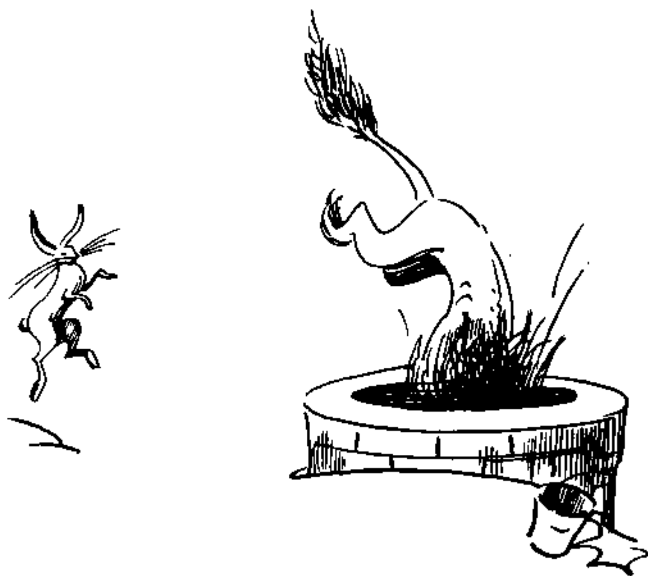
করলেও বুক ওর দুরুদুরু করছে। দেখে কি, দোলনায় কী যেন নড়ছে। চাদর তুলে দেখে — ওমা, বেঁচে আছে ছেলেটি।

আনন্দ আর ধরে না সবার।

একটি ঘোড়া আর পনেরটি ভেড়া মেরে গোটাগুটি শল্যপক্ক করা হল। পানভোজন চলল চোদ্দ দিন ধরে, টেবিল ছেড়ে কেউ আর ওঠে না।

সিংহ আর শশক

(জর্জীয় কাহিনী)



এক বনে প্রায়ই পশুরা এসে জুটত; আর প্রতিবারই সেখানে উদয় হত সিংহের। নির্ঘাৎ সে তাদের একটিকে ধরে সেখানেই খেয়ে শেষ করত। কেবলি ভয়ে ভয়ে দিন কাটত অভাগা পশুদের।

একদিন তারা জুটে আলাপ করলে কী করা যায়, কী করে রেহাই পাওয়া যায় এই চিরকেলে ভয়টা থেকে। অনেক সলা অনেক পরামর্শের পর স্থির হল, সিংহকে জীবনভোর ভেট দিয়ে যাবে তারা, নিজেরাই গিয়ে দিয়ে আসবে, তার বদলে মিনতি করবে যেন সে প্রতিদিন অমন করে তাদের আঁতকে না দেয়। সিংহের কাছে গিয়ে তারা তাদের আর্জি পেশ করলে।

সিংহ রাজি হল এই শর্তে যে ভেট পৌঁছুন চাই একটা নির্দিষ্ট সময়ে, এতটুকু দেরি হওয়া চলবে না।

'নইলে তোমাদের সব্বাইকে খেয়ে ফেলব!' বললে সে।

নিজেদের মধ্যে থেকেই এক একজনকে বেছে পশুরা তাই ভেট দিয়ে আসে সিংহকে। একবার পড়ল শশকের পালা। সিংহের কাছে ওকে নিয়ে যাবার জন্যে এল সবাই।

শশক বললে, 'তা আমার যখন পালা, তখন কী আর করা যাবে। কেবল একটা অনুরোধ, আমায় একা ছেড়ে দাও, নিজেই গিয়ে সিংহের সঙ্গে হিসেব চুকোবার চেষ্টা করব, বলা যায় না, নিজেও বেঁচে যেতে পারি তোমাদেরও বাঁচিয়ে দিতে পারি এই ভয়ংকর যন্ত্রণা থেকে।'

পশুরা হেসে উঠল।

'ইস্, ট্যারা চোখো ওই ভয়কুনো শশকটার বড়াই দেখো!'

ওদিকে ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে সিংহের, কিন্তু ইচ্ছে করেই দেরি করতে লাগল শশক। চোখে আগুন ঝরিয়ে, দাঁত কড়মড় করে সিংহ পথ চেয়ে বসেছিল কখন ভেট আসবে, ঠিক করলে সমস্ত পশুদেরই এবার শিক্ষা দিয়ে ছাড়বে, এমন সময় দেখা দিল শশক। ভয়ংকর দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে সিংহ শুধাল:

'স্পর্ধা তোর কম নয়, এত দেরি হল যে?'

রাজাধিরাজ!' সবিনয়ে শশক বললে, 'আপনার কাছে একটি শশক আনার ভার ছিল আমার। ওকে আনছি এমন সময় পথে আরেক সিংহ ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে টেনে নিয়ে গেছে এক গভীর খাদের মধ্যে।'

সিংহ গর্জন করলে, 'বটে, দেখা দেখি কোথায় সে সিংহ!'

শশক তাকে এক কুয়োর কাছে নিয়ে এসে বললে:

'এই যে মহারাজ, এর ভেতরে সে আছে, কিন্তু আমার উঁকি দেবার সাহস নেই, আপনার থাবার মধ্যে আমায় তুলে নিন, আপনাকে দেখাচ্ছি।'

খরগোসকে থাবায় তুলে নিয়ে উঁকি দেওয়া হল। কুয়োর তলে জলের ওপর ভেসে উঠল তাদের ছায়া; থাবার মধ্যে এক শশককে ধরে সিংহ চেয়ে আছে ওপর পানে।

ক্ষেপে উঠে সিংহ শশককে ঠেলে দিলে; প্রতিদ্বন্দ্বীকে শায়েস্তা করে তার খাদ্যটা কেড়ে নেবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়লে কুয়োর মধ্যে। কিন্তু কুয়োর জলটা ছিল বেশ গভীর, ডুবে মরল হিংস্র সিংহ।

নিষ্ঠুর শত্রুর হাত থেকে বেঁচেছে শুনে মহা আনন্দ করতে লাগল পশুরা। মন খুলে তারা ধন্যি ধন্যি করলে শশককে।

ভালুকের শিক্ষাদান

(জর্জীয় কাহিনী)



এক ভালুক এক নেকড়ে আর এক শেয়ালের একদিন দেখা হতে তারা খেদ করতে লাগল যে প্রায়ই তাদের অনেক দিন ধরে খিদেয় কাটাতে হয়, পেটের মধ্যে টাঁস ধরে। বিলাপ করলে তারা, নানা কথা কইলে, তারপর ঠিক করলে, এখন থেকে তারা থাকবে ভাইয়ের মতো; যাই জুটুক, ভাইয়ের মতো ভাগাভাগি করে নেবে। এই বলে ভাই পাতিয়ে, বিশ্বাসের শপথ নিয়ে একসঙ্গে চলল খাদ্যের সন্ধানে।

যায় আর খোঁজে, কী খেয়ে বাঁচবে।

একটা জখম হরিণের দেখা পেলে তারা। সঙ্গে সঙ্গে তার ঘাড় মটকে ঘাসের ওপর ছায়ায় বসে ভাগাভাগি শুরু হল।

খিদেয় নেকড়ের তখন দাঁত কসমস করছে। ভালুক তাকে হুকুম দিলে:

'নাও, নেকড়ে, ভাগ করো।'

নেকড়ে শুরু করল, 'মাথাটা তোমার — তুমি আমাদের মাথা, আমাদের মনিব কিনা, দেহটা আমার, আর পাগুলো শেয়ালের, ও ভারি ছুটতে ভালোবাসে তো।'

কথাটা শেষ করতে না করতেই ভালুক এমন জোরে থাবড়া মারলে নেকড়ের মাথায় যে সারা পাহাড় গমগম করে উঠল। যন্ত্রণায় কেঁউ কেঁউ করে পাশে সরে গেল নেকড়ে।

এবার শেয়ালের দিকে ফিরে ভালুক বললে:

'তা শেয়াল-গিন্নি, তাহলে তুমিই ভাগ করো।'

ধূর্ত শেয়াল উঠে ভারি খোশামুদি করে বললে, 'মাথাটা তোমার, কেননা তুমি আমাদের মাথা, কর্তা, লাশটাও তোমার, কেননা, বাপের মতো তুমি আমাদের পালন করো, আর পাগুলোও তোমার, কেননা তুমি পা ফেলো কেবল আমাদের কল্যাণের জন্যে।'

'ভারি বিচক্ষণ তুমি শেয়াল-গিন্নি,' বললে ভালুক, 'এমন বিচক্ষণ, বুদ্ধিমানের মত বখরা করা তুমি শিখলে কোত্থেকে বলো তো?'

শেয়াল বললে, 'নেকড়েকে তুমি যা শিক্ষা দিয়েছ হুজুর, তা দেখে বিচক্ষণতা না শিখে উপায় কী?'

সোনার গুটি আল্‌তিন-সাকা

(বাশ্‌কিরী রূপকথা)



অনেক কাল আগে ছিল এক বুড়োবুড়ি। তাদের একটি মাত্র ছেলে — সোনার গুটি আলতিন-সাকা। এই বলে তাকে ডাকত কারণ তার ছিল এক সোনার গুটি। আর গুটি খেলত ও সবার বাড়া, কেউ ওকে হারাতে পারত না।

একদিন বুড়ো গেছে সায়রে তার ঘোড়াদের জল খাওয়াতে। তাড়া দিয়ে ঘোড়াগুলোকে জলের কাছে নিয়ে আসা হল, কিন্তু ঘোড়াগুলো ঘাড় ঝাঁকায়, লেজ নাড়ে, মাটিতে খুর ঠোকে, ভয় খাওয়া ডাক ছাড়ে, পিছিয়ে আসে জলের কাছ থেকে: কে যেন টেনে ধরছে তাদের কেশর, টিপে ধরছে তাদের ঠোঁট, জল খেতে দিচ্ছে না।

বুড়ো ভাবে, 'কী ব্যাপার, দেখতে হয়।'

জলের কাছে গিয়ে উঁকি দিতেই কে যেন চেপে ধরল তার দাড়ি। ছাড়াবার চেষ্টা করে বুড়ো, পারে না।

দেখে কি, দাড়ি ওর চেপে ধরেছে আর কেউ নয় বুড়ি ডাইনী — উবীর। বললে:

'এই উবীর, দাড়ি ছেড়ে দে বাপু! এক পাল ভেড়া দেব তার বদলে!'

'ভেড়া আমার দরকার নেই,' বলে উবীর।

'বেশ, এক পাল ঘোড়া দেব তোকে, ছেড়ে দে!'

'ঘোড়াও আমার দরকার নেই।'

'তাহলে কী চাই তোর, বল!'

'তোর তাঁবুতে তোর একমাত্র যা আছে সেইটে দে।'

ভয়েডরে বুড়োর মাথায় এল না একমাত্র জিনিস কী আছে তার তাঁবুতে।

বলে, 'বেশ, তাই দেব, এখন ছেড়ে দে!'

উবীর ওকে ছেড়ে দিয়ে বললে:

'দেখিস, আমার কাছ থেকে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করিস না। যেখানেই যাবি খুঁজে বার করব!'

ঘরে ফিরল বুড়ো; আর তখন খেয়াল হল কী চেয়েছে উবীর: ওর একমাত্র বলতে তো কেবল ছেলেটি, আল্‌তিন-সাকা।

ভারি মুষড়ে পড়লে বুড়ো, বউ ছেলেকে কিছুই জানালে না, কেবল একটি কথা বললে:

'দূরে কোথাও আমাদের পাড়ি দিতে হয়, এ জায়গাটা খারাপ।'

ঘোড়াটোড়া নিয়ে অনেক দূরে চলে গেল তারা; তাঁবু ফেললে। পরের দিন আল্‌তিন-সাকার সোনার গুটি আর পাওয়া যায় না।

'কোথায় গেল আমার সোনার গুটি?'

বাপ বলে, 'যেখানে আগে ছিলাম সেখানেই থেকে গেছে তাহলে। তবে সেখানে তুই যাস না। উবীর তোকে ধরবে।'

সায়রের কাছে কী হয়েছিল সে ঘটনা সব বললে।

বাপের কথা শুনে আল্‌তিন-সাকা বলে:

'উবীরকে আমি ডরাই না! আমায় ধরতে পারবে না! কেবল বলো, কোন ঘোড়াটায় চেপে যাব?'

ছেলেকে নিরস্ত করার চেষ্টা করলে বাপ, কিন্তু ছেলে ছাড়ে না। উবীরকে ডরাই না আমি যাবই। বাপ দেখে ছেলেকে ফেরানো যাবে না।

বলে, 'বেশ, তোর কথাই থাক। যা তাহলে। ঘোড়ার পালের কাছে গিয়ে কোরক* ঘোরাবি, বল্গা নাচাবি, যে ঘোড়াটা তোর কাছে এগিয়ে আসবে তাতে চেপে যাবি।'

ঘোড়ার পালের কাছে গেল আল্‌তিন-সাকা, কোরক ঘোরালে, বল্গা নাচালে। কিন্তু কাছে ছুটে এল একটা ঝাঁকড়া লোমো রোগাটে ঘোড়ার বাচ্চা। তাকে ভাগিয়ে দিলে আল্‌তিন-সাকা, ফের এল বাপের কাছে। বলে:

'কোন ঘোড়ায় চেপে যাব, বলো বাবা!'

'বললাম তো: কোরক ঘোরাবি, বল্গা নাচাবি!' জবাব দেয় বাপ।

ফের পালের কাছে গেল আল্‌তিন-সাকা। কোরক ঘোরালে, বল্গা নাচালে, কিন্তু ফের ছুটে এল সেই আগের বাচ্চাটাই।

'তাহলে এতে চেপেই যেতে হবে দেখছি,' বললে আল্‌তিন-সাকা।

বাচ্চাটার ঘাড়ে হাত দিতেই তার ঝাঁকড়া বুনো লোম সব ঝরে গেল, লাগাম পরাতেই সে বাচ্চা হয়ে উঠল চিকন চঞ্চল টগবগে! ঘেরাও থেকে বার করে আনতেই সে হয়ে উঠল এক বড়ো সড়ো সুঠাম ঘোড়া। পিঠে জিন চাপাতেই সে ঘোড়া হয়ে উঠল পালের মধ্যে সবচেয়ে সেরা।

আল্‌তিন-সাকাকে সে জিজ্ঞেস করে:

'কোথায় যাবি বল তো?'

'যাব আমাদের আগের ডেরায়, আমার সোনার গুটির খোঁজে,' বলে আল্‌তিন-সাকা।

ঘোড়া বলে, 'সেখানে তোর পথ চেয়ে আছে পাষণ্ডা উবীর। বলবে, 'ঘোড়া

---

* কোরক — ডগায় ফাঁস ঝোলানো হালকা একটা ডাণ্ডা। ঘোড়া ধরা হয় তা দিয়ে। — সম্পাঃ

থেকে নেমে তোর গুটি নিয়ে যা।' তার কথা শুনিস না। আমার পিঠ থেকে নামিস না। নামলেই মারা পড়বি, তোকে খেয়ে ফেলবে উবীর। বাজের মতো ছোঁ মারবি, ঘোড়া থেকেই নিচু হয়ে তুলে নিবি তোর গুটি।'

ঘোড়ায় চেপে আল্‌তিন-সাকা তো চলল সেই আগের ডেরায়। দেখে কি, বুড়ি উবীর আগুনের কাছে বসে বসে হাত গরম করছে। আল্‌তিন-সাকা বলে:

'দিদিমা, আমার সোনার গুটি দাও!'

উবীর বলে,'এই নে বাছা তোর গুটি, ঘোড়া থেকে নেমে এসে নিজেই নিয়ে যা। আমার পিঠ কন্‌কন্‌ করছে, দাঁড়াতে পারছি না।'

ঘোড়া তখন মাটিতে নুয়ে বসল আর আল্‌তিন-সাকা ছোঁ মেরে তুলে নিলে গুটি। তারপর যত জোরে পারে ছুটল তার বাদামী ঘোড়া। আর রাগে গর্জন করে উঠল উবীর, লাফিয়ে উঠে একবার থুতু ফেললে, অমনি এসে গেল এক কালো কুচকুচে মোটা ঘোড়া, ফের থুতু ফেললে — এসে গেল লাগাম বল্গা। সে ঘোড়ায় চেপে উবীর ছুটল আল্‌তিন-সাকার পেছনে।

বাদামী ঘোড়ায় ছুটছে আল্‌তিন-সাকা, আর উবীর ছুটছে তার মোটা কালো ঘোড়ায়। এই ছোঁয় ছোঁয়, এই ধরে ধরে! হঠাৎ হোঁচট খেল তার ঘোড়া, ঘোঁৎঘোঁৎ করে উঠল, পেছিয়ে পড়তে লাগল।

কালো ঘোড়ার লাগাম হাঁকায় উবীর, পা দিয়ে খোঁচা মারে তার পেটে, ঘোড়ার গতি কিন্তু ক্রমেই কমে।

ক্ষেপে উঠলে উবীর, রেগেমেগে নিজের ঘোড়াটাই খেয়ে নিলে, তারপর পায়ে ছুটেই পিছু ধাওয়া করলে।

ছুটছে উবীর, নিজেই তাড়া দিচ্ছে নিজেকে — নিজেই নিজেকে কিল মারছে বুকে পিঠে। ছুটতে ছুটতে বাদামী ঘোড়ার পাল্লা ধরে কামড় বসালে তার ডান পাটায়। তিন পায়েই ঘোড়া ছুটছে, আর উবীর কিন্তু থামে না। ফের এসে পাল্লা ধরে কামড় বসালে তার বাঁ পাটায়।

সব শক্তি জড়ো করে ঘোড়া আল্‌তিন-সাকাকে বয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু শক্তি তখন আর তার নেই।

কোনো রকমে সরোবর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে ঘোড়া বলে:



'আর ছোটার ক্ষমতা নেই আমার। আমি এই জলের মধ্যে গিয়ে লুকুব, আর ঐ সরোবরের কাছে যে ওক গাছটা রয়েছে তার ওপরে গিয়ে তুই ওঠ, আমার পায়ের ব্যথা সারুক তখন তোকে পেঁাছে দেব।'

এই বলে ঘোড়া ডুব দিল হ্রদের মধ্যে আর আল্‌তিন-সাকা চটপট গিয়ে উঠল হ্রদের ধারের ওক গাছটায় — উঠে বসল একেবারে ডগায়।

এদিকে উবীর ছুটে এসে দেখে ওক গাছের ওপরে আল্‌তিন-সাকা। হেঁকে বলে:

'এই বার পেয়েছি! টেনে নামিয়ে তোকে খাব!'

এই বলে থুতু ফেললে সে। অমনি এসে গেল একটা কুড়ুল। মুখ থেকে একটা দাঁত তুলে নিয়ে উবীর ধার দিতে লাগল তার কুড়ুলে। ধার-টার দিয়ে ওক গাছটা ঝপাঝপ কাটতে লাগল, চারিদিকে উড়তে লাগল কাঠের চিলতে।

শব্দ শুনে ছুটে এল এক শেয়াল। বলে:

'ও কি দিদিমা, গাছ কাটছ কেন?'

উবীর বলে, 'দেখছিস না, গাছে কে বসে আছে? গাছ কেটে ঐ ছেলেটিকে ধরে খাব!'

শেয়াল গাছের দিকে তাকিয়ে দেখে — ডগায় বসে আছে একটি সুন্দর ছেলে। মায়া হল তার। উবীরকে বললে:

'তুমি বুড়ো হয়েছ, অত কষ্ট করছ কেন, দাও আমায়, গাছটা কেটে দিচ্ছি!'

উবীর বলে, 'উঁহু, আমি নিজেই কাটব, নিজেই খাব!'

শেয়াল কিন্তু ছাড়ে না।

'আমি গাছ কেটে দিচ্ছি, ছেলেটাকে তুমিই খেয়ো!'

শেয়ালকে তাই কুড়ুল ছেড়ে দিলে উবীর। নিজে গিয়ে গাছের তলে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। উবীর ঘুমোয়, নাক ডাকে, নাক মুখ থেকে আগুনের ফুলকি ছোটে, গলগলিয়ে ধোঁয়া বেরয়। শেয়াল তখন কুড়ুল আর দাঁত জলে ফেলে দিলে, সমস্ত টুকরোগুলো জড়ো করে বুঁজিয়ে দিলে গাছের কাটা জায়গাটা তারপর থুতু ছিটিয়ে জিভ দিয়ে চেটে দিলে, কাটা জায়গাটাও অমনি জুড়ে গিয়ে যেমনকার গাছ তেমনি হয়ে উঠল।

তারপর সে বললে:

'চললাম ছেলে!' বলে চলে গেল।

ঘুম থেকে জেগে উবীর ওক গাছের দিকে তাকিয়ে বলে:

'এ কী দেখছি নয়নে? গাছ যে গোটা, যেন কুড়ুলই পড়ে নি কখনো?'

শেয়ালকে গালমন্দ করে উবীর ফের থুতু ফেললে — অমনি এসে গেল কুড়ুল। মুখ থেকে আর একটা দাঁত খসিয়ে ধার দিতে লাগল কুড়ুলে। ধার দেয় আর আল্‌তিন-সাকার দিকে চেয়ে চেয়ে বলে:

'গাছ কাটব, তোকে খাব!'

কুড়ুলে ধার দিয়ে কোপ বসাতে লাগল ডাইনী। ছিটকে ছিটকে পড়ে কাঠের চিলতে, ওক গাছ কেঁপে ওঠে — আর কয়েক কোপ পড়লেই মড়মড়িয়ে ভেঙে পড়বে গাছ।

এমন সময় এক শেয়াল এসে বলে:

'কী করছ দিদিমা?'

'গাছ কাটছি।'

'কাটছ কেন বলো তো?'

'ঐ ছেলেটাকে ধরে খাব!'

শেয়াল বলে:

'তুমি নিজে অত কষ্ট করছ কেন, দাও আমায় কেটে দিচ্ছি!'

উবীর বলে, 'উহুঁ, নিজে কাটব, নিজে খাব!'

'আমি গাছ কেটে দেব, তুমি খেয়ো!' বলে শেয়াল।

'উহুঁ,' উবীর চেঁচায়, 'কুড়ুল তোকে দিচ্ছি না! আরো এক শেয়াল এসেছিল। আমার জন্যে খেটে দেবে বলে আমায় ঠকিয়ে গেছে!'

'আচ্ছা, কী রঙ তার?' জিজ্ঞেস করে শেয়াল।

উবীর বলে, 'বাদামী!'

শেয়াল বলে, 'বাদামী শেয়ালকে আবার কেউ বিশ্বাস করে? বাদামীগুলো সবাই ঠগ। বিশ্বাস করবে কেবল আমাদের, কালো শেয়ালকে!'

উবীর তাকিয়ে দেখে সত্যিই এ শেয়ালটা কালো। শেয়ালকে কুড়ুল দিয়ে

নিজে গিয়ে শুয়ে নাক ডাকাতে লাগল। নাক মুখ থেকে আগুনের ফুলকি ছোটে, গলগলিয়ে ধোঁয়া বেরয়।

কালো শেয়াল কুড়ুলটি আর দাঁতটা জলে ছুড়ে ফেললে, ফাড়া চিলতেগুলো ঠিকঠাক বসিয়ে থুতু ছিটিয়ে চেটে দিতেই ফের সব জুড়ে যেমন ছিল গাছ তেমনি। তারপর আল্‌তিন-সাকার কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

কিছু পরে ঘুম ভাঙল উবীরের। ওক গাছের দিকে তাকিয়েই চেঁচিয়ে ওঠে, 'এ কী দেখছি আমার নয়নে? গাছ ফের গোটা হয়ে উঠেছে?'

থুতু ফেললে উবীর অমনি এসে গেল কুড়ুল, আরো একটা দাঁত টেনে তুলে ধার দিতে লাগল কুড়ুলে। ধার-টার দিয়ে কোপ বসাতে লাগল গাছে। কোপ দেয় আর আল্‌তিন-সাকাকে আর শেয়ালগুলোকে সাধ মিটিয়ে গালমন্দ করে। কোপ দিতে দিতে গাছের আধখানা অবধি কাটা হয়ে গেল। আল্‌তিন-সাকা নিচের দিকে তাকিয়ে ভাবে:

'এবার আর উবীরের হাত থেকে আমার রেহাই নেই!..'

দেখে ছুটে আসছে এক সাদা শেয়াল। ওক গাছের কাছে এসে উবীরকে বলে:

'দাও দিদিমা, তোমায় একটু সাহায্য করি, গাছ কেটে দিই!'

'দূর হ এখনি, প্রাণের মায়া থাকে তো পালা!' চেঁচায় উবীর, 'দুদুবার শেয়াল আমায় ঠকিয়ে পালিয়েছে!'

'কী রকম শেয়াল, বলো তো দিদিমা?' জিজ্ঞেস করে শেয়াল।

'একটা বাদামী, একটা কালো।'

শেয়াল বলে, 'বাদামী শেয়াল, কালো শেয়াল — এদের বিশ্বাস নেই দিদিমা, এরা সবাই ঠগ। বিশ্বাস করবে কেবল আমাদের, সাদা মেঠো শেয়ালদের! আমি তোমায় ঠকাব না, সাহায্য করব!'

উবীর শেয়ালকে কুড়ুল দিয়ে শুতে গেল। শেয়ালও অমনি কুড়ুল আর দাঁত জলে ফেলে দিলে, টুকরো কাঠকুটগুলো তাড়াতাড়ি জড়ো করে কাটা জায়গাটা ভরে দিলে। তারপর থুতু ছিটিয়ে চেটে দিতেই সব জুড়ে গেল।

শেয়াল বলে, 'শোন ছেলে, তিনবার তোকে বাঁচিয়েছি, কালো কাদা আর সাদা

কাদায় চামড়া রঙ করে এসেছি, উবীর আমায় চিনতে পারে নি। কিন্তু এরপর আর উপায় নেই !'

বিদায় নিয়ে চলে গেল শেয়াল।

ঘুম ভেঙে চেঁচিয়ে উঠল উবীর:

'এ কী দেখছি আমার নয়নে? গাছে যেন কেউ কখনো কুড়ুল ছোঁয়ায় নি!'

থুতু ফেলতেই অমনি এসে গেল এক কুড়ুল। মুখ থেকে শেষ দাঁতটা উপড়ে নিয়ে ধার দিতে লাগল কুড়ুলে। ধার-টার দিয়ে ঝপাঝপ কোপ মারতে শুরু করলে। কোপ মারে, আর বিড়বিড় করে:

'এবার আর কারো সাহায্য নিচ্ছি না! নিজেই শেষ করব!'

চারিদিকে ছোটে কাঠের চিলতে, টলতে শুরু করে গাছ, মড়মড় করে, এই বুঝি ভেঙে পড়ে।

আল্‌তিন-সাকা দেখে, উবীরের হাত থেকে আর নিস্তার নেই। বসে বসে ভাবে কী করা যায়! হঠাৎ এক দাঁড়কাক উড়ে এসে বসল গাছের ডগায়। আল্‌তিন-সাকা কাককে বললে:

'কাক ভায়া, সবখানে তোমার গতি, সব জায়গায় উড়ে যাও। আমাদের নতুন ছাউনিতে উড়ে গিয়ে দেখা কোরো আমার দুই কুকুর আক্‌কুলাক আর আকতিরনাকের সঙ্গে। বলো যেন তারা ছুটে আসে আমার সাহায্যে!'

দাঁড়কাক বলে, 'উহুঁ, যাব না। উবীর তোকে ধরলে আমারও কিছু খাদ্য জুটবে।'

ডালে বসে অপেক্ষা করতে লাগল কাক।

চারিদিকে তাকিয়ে দেখে আল্‌তিন-সাকা: কোথাও কি কোনো সাহায্য মিলবে না? এমন সময় ওক গাছে উড়ে এল এক হাঁড়িচাঁচা। আল্‌তিন-সাকা বলে:

'হাঁড়িচাঁচা ভায়া, সবখানে তোমার গতি, সব জায়গায় উড়ে যাও, আমাদের নতুন আস্তানায় উড়ে গিয়ে আমার কুকুর আক্‌কুলাক আর আকতিরনাককে বলো যেন চটপট ছুটে আসে আমার সাহায্যে!'

হাঁড়িচাঁচা বলে, 'কী দরকার, উবীর যখন তোকে খাবে তখন আমারও কিছু জুটবে।'

আরো মন খারাপ হয়ে গেল আল্‌তিন-সাকার।

ভাবে, 'অন্তিমকাল আমার ঘনিয়ে এসেছে!'

এই সময় মাথার ওপর উড়ে এল এক ঝাঁক চড়ুই। আল্‌তিন-সাকা বলে:

'শোনো চড়ুই ভাইয়েরা, আমাদের নতুন আস্তানায় উড়ে গিয়ে আমার কুকুর আক্‌কুলাক আর আর্কাতিরনাককে খুঁজে বার করে বলো, তোদের মনিবকে মারতে চায় উবীর!'

'যাব, যাব! বলব, বলব!' চড়ুইয়ের ঝাঁক কিচির মিচির করে ঝটপট উড়ে গেল।

গিয়ে খুঁজে বার করলে কুকুরদুটোকে। কুকুররা ওদিকে সবখানে ছুটাছুটি করে মনিবকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে শেষ পর্যন্ত লুটিয়ে পড়ে বেঘোরে ঘুমুচ্ছে। চড়ুইয়েরা গিয়ে তাদের কানে খোঁচায়, ঘুম ভাঙায়। ঘুম ভাঙিয়েই কিচির মিচির:

'এই আক্‌কুলাক, এই আর্কাতিরনাক! শিগগির ছুটে যাও সরোবরের ধারে মস্ত ওক গাছটার কাছে! মনিবকে গিয়ে বাঁচাও — উবীর তাকে খাবে ঠিক করেছে!'

লাফিয়ে উঠেই আল্‌তিন-সাকার সাহায্যে ছুটল আক্‌কুলাক, আর্কাতিরনাক। রাস্তার ওপর দিয়ে ওড়ে চড়াইয়েরা, সেই দেখে রাস্তা ধরে ছোটে কুকুরেরা, ধুলো ওঠে রাস্তায়।

ধুলো দেখে উবীর জিজ্ঞেস করে আল্‌তিন-সাকাকে:

'এই ছেলে, দ্যাখ তো, রাস্তায় ওটা কিসের ধুলো?'

আল্‌তিন-সাকা বলে, 'ও ধুলোয় আমার হরিষ, তোর বিষাদ!'

কুকুরের পায়ের শব্দ শুনে উবীর শুধোয়:

'এই ছেলে, ও কিসের শব্দ বল তো?'

আল্‌তিন-সাকা বলে, 'ওতে আমার হরিষ, তোর বিষাদ!'

ততক্ষণে ছুটে এসেছে আক্‌কুলাক, আর্কাতিরনাক। উবীরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শুরু করলে দাঁত বসাতে, কামড় দিতে। উবীর ভয় পেয়ে কুড়ুল ছুড়ে ফেললে জলে, আর নিজেও সেই সঙ্গে ডুব দিলে। আল্‌তিন-সাকাকে বললে কুকুরেরা:

'উবীরের পিছু ধাওয়া করে আমরাও গিয়ে ডুব দিচ্ছি জলে, আর তুই জলের দিকে দেখিস: আমরা যদি উবীরকে মারি, তাহলে কালো হয়ে উঠবে জল, আর উবীর যদি আমাদের মারে, তবে জলের রঙ হবে লাল।'

এই বলে তারা ঝাঁপ দিলে জলে।

উথালপাথাল শুরু হল জলে, ঢেউ উঠল ফুঁসে।

আল্‌তিন-সাকা দেখে — লাল হয়ে উঠেছে জল। ভাবে, 'আমার কুকুরদুটিকেই মেরেছে উবীর!' তারপর ফের তাকাতেই দেখে জল হয়ে উঠেছে কালো। আল্‌তিন-সাকার আনন্দ আর ধরে না, হেসে গাছ থেকে সে নামলে। আক্‌কুলাক আকতিরনাকও উঠে এল জল থেকে। গা ঝাড়া দিতে লাগল।

আল্‌তিন-সাকা বলে, 'জলের রঙ প্রথমে লাল হয়ে উঠেছিল কেন?'

আকতিরনাক বলে:

'তার কারণ উবীর প্রথমে আমাদের কাবু করে ফেলে, কান আমার ছিঁড়ে নেয়। কিন্তু শিগগিরই আমরা তার শায়েস্তা করি!'

কুকুরের পেছু পেছু জল থেকে উঠে এল বাদামী ঘোড়া।

বলে, 'নে ছেলে, বস আমার পিঠে, পেঁীছে দিই তোকে!'

জীবন্ত অক্ষত দেহে ছাউনিতে ফিরল আল্‌তিন-সাকা। মা-বাপের আনন্দ ধরে না, মস্ত ভোজের আয়োজন করলে। আত্মীয় বান্ধব চেনা পরিচয় সকলের নেমন্তন্ন হল। নয় দিন ধরে ভোজন হল, নয় দিন ধরে পান হল, ধুমধাম চলল নয় দিন।

তীরন্দাজ ও জার্কিন-খাঁ

(কালমীক রূপকথা)



পুরাকালে জার্কিন-খাঁয়ের রাজ্যে ছিল এক নওজোয়ান তীরন্দাজ। একদিন সে সরোবরে পাখি শিকার করতে এসে দেখে হলদে মাথা তিনটে মরালী। দেখেই সে শুয়ে পড়ে লুকিয়ে রইল কাশ বনের মধ্যে, নজর রাখল কী হয়।

হলুদ-মুণ্ড তিন মরালী তীরে নেমে ডানা পালক খসিয়ে হয়ে গেল তিন অপরূপ সুন্দরী কন্যে। জলে নেমে তারা স্নান শুরু করলে। তীরন্দাজ ওদিকে চুপি চুপি গিয়ে একটি মরালীর ডানা পালক নিয়ে এসে ফের লুকিয়ে রইল কাশের ঝোপে।

স্নান সেরে তিন কন্যে উঠল জল থেকে। দুই কন্যে তাদের মরালী ডানা পরলে, কিন্তু তৃতীয় জন আর তা খুঁজে পায় না। দুই মরালী উড়ে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করলে, কোথায় তাদের বোনটির ডানা পালক, কিন্তু খুঁজে আর পায় না।

'কী আর করি, তোরই নির্বন্ধ,' এই বলে উড়ে চলে গেল তারা।

মেয়েটি একা পড়ে রইল। তীরের কাছে ছোটাছুটি করে, পালক খোঁজে, আকুল হয়ে কাঁদে। বলে:

'আমার ডানা খুঁজে যে দেবে সে যদি গরিব হয় তাকে আমি ধনী করে দেব। যদি কুৎসিত হয় তাকে রূপবান করে দেব, যা চাইবে সব দেব, সব বাসনা পূর্ণ করব!'

এই বলে সে ছোটে তীর ধরে আর কাঁদে। তীরন্দাজ তখন কাশ বন থেকে বেরিয়ে এসে বললে:

'দুঃখু কোরো না কন্যে, এসো, মরালীর যে ডানা খুঁজছ সেটি আমার কাছে।'

মেয়েটি দেখল নওজোয়ানটির হাতে তার মরাল-ডানা। ভারি খুশি হয়ে ভয়ে-ভয়ে তার কাছে এগিয়ে এসে বলে:

'ভাই তুমি, এত উপকার করেছ আমার ডানাটি খুঁজে পেয়ে, আরো একটি উপকার করো, ডানাটি আমায় ফিরিয়ে দাও। তার বদলে তুমি যা চাইবে তাই দেব, যে বাসনা হবে পূরণ করব।'

তীরন্দাজ বলে, 'তুমি আর কী দেবে আমায়? আমি তোমাকেই চাই। বলো আমার বৌ হবে?'

তীরন্দাজের দিকে চেয়ে কন্যে বললে, 'হব।'

তীরন্দাজ তখন তার হাত ধরে নিয়ে এল নিজের ডেরায়। বিয়ে করলে।

থাকত তারা এক গরিব ছাউনিতে, কিন্তু ভালোবাসা ছিল অগাধ, দেখে দেখে আর আশ মিটত না, এক মুহূর্তও ছেড়ে থাকতে চাইত না।

কিছুকাল যায়। জার্কিন-খাঁ শুনলে, তার তীরন্দাজ যে বৌ পেয়েছে সে নাকি অপরূপা সুন্দরী। ভারি কৌতূহল হল তার। ঠিক করলে দেখবে গুজবটা সত্যি কিনা। তীরন্দাজের ছাউনিতে এসে দেখে সত্যিই — মেয়েটির রূপের কথা লোকেরা একটুও বাড়িয়ে বলে নি! অমন রূপ আর কখনো আর কোথাও কেউ দেখে নি। রূপসী যেন সূর্যকন্যা। দেখে দেখে আশ মেটে না, খাঁয়ের রাজ্যের কোনো মেয়েই তার কাছে লাগে না।

নয়ন ভরে মেয়েটির রূপ দেখে জার্কিন-খাঁ রাজপুরীতে ফিরে ডাকলে তার সব আমীর ওমরা, দরখাঁ উপখাঁদের, ভালো ভালো খাবার দাবার দিয়ে বললে:

'আমার পেয়ারের দরখাঁ উপখাঁ — আমার প্রাণের মতো প্রিয় তোমরা, কিছু সলাপরামর্শ দাও আমায়!'

'বেশ দেব,' একবাক্যে বললে তারা।

জার্কিন-খাঁ বলে:

'আমার এক তীরন্দাজের যে বউ আছে, তেমন রূপসী দুনিয়ায় নেই। তার সঙ্গে কারো তুলনা হয়, তেমন সুরৎ দ্বিতীয় আর মিলবে না। সেরা সেরা সুন্দরীরা তার কাছে হার মানবে।'

তীরন্দাজের বউয়ের কথা বললে জার্কিন-খাঁ, কী তার ছিরি কী তার ছাঁদ, কেমন চলন কেমন বলন, কেমন নয়ন কেমন বেণী। বলে:

'এক মামুলী তীরন্দাজ — তার কিনা অমন অরুণ-কিরণ অপরূপা বৌ! ওকে আমার বেগম করি কী করে তার সলা দাও তোমরা।'

একদল দরখাঁ ভেবে ভেবে বললে:

'ওকে হরণ করে গোপনে ধরে রাখা যাক প্রাসাদে।'

আরেক দল বললে:

'তীরন্দাজকে খুন করে ওকে নিয়ে আসা ভালো।'

অন্য দল বলে:

'খুন করে কী লাভ? আমাদের রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে ওকে খেদিয়ে দেওয়া দরকার, তখন নিশ্চিন্তে ওর বৌকে নিয়ে আসা যায়।'

সবাই সব পরামর্শ দেবার পর ডানদিকের প্রধান দরখাঁ উঠল।

বললে, 'এ সব সলায় কোনো কাজই হবে না। ওকে হরণ করে চুপি চুপি প্রাসাদে ধরে রাখা অসম্ভব; আজ হোক কাল হোক লোকে তা জানবে। তীরন্দাজকে মেরে তার বৌকে লুট করা খুবই বিপজ্জনক — লোকে ক্ষেপে উঠতে পারে, তখন ঝামেলার আর অন্ত মিলবে না। তীরন্দাজকে খেদিয়ে দেওয়াও চলে না, চুপি চুপি পালিয়ে এসে বৌকে নিয়ে চলে যাবে। উহুঁ, এখানে চালাকি খেলতে হবে।'

'তাহলে কী করা যায় বলো,' জিজ্ঞেস করে খাঁ।

প্রধান দরখাঁ বলে:

'শুনেছি সূর্য যেখানে অস্ত যায় সেখানকার মহানদীর খাড়াই পাড়ে থাকে এক মস্ত বাঘিনী আর তার বাচ্চারা। লোকে বলে সব জানোয়ারের চেয়ে এই বাঘিনী নাকি বেশি হিংস্র আর ভয়ঙ্কর। খাঁয়ের জন্যে সে বাঘিনীর দুধ নিয়ে আনার জন্যে হুকুম দিয়ে পাঠানো হোক তাকে। তাহলে বেঁচে আর তাকে ফিরতে হবে না, নির্ঘাৎ বাঘিনী তাকে খাবে। তখন তার সুন্দরী বৌকে সহজেই নেওয়া যায়। খাঁয়ের হুকুম অমান্যি করার সাহস হবে না তার।'

প্রধান দরখাঁর এই ধূর্ত ফন্দিটা সবারই ভালো লাগল।

'খাসা ফন্দি বটে!' সবাই বললে একবাক্যে।

জার্কিন-খাঁ তাই রোগের ভান করে ডেকে পাঠালে তার তীরন্দাজকে। তীরন্দাজ আসতেই খাঁ কোঁকাতে কোঁকাতে বললে:

'দেখছিস তো কী কঠিন মারাত্মক ব্যামো ধরেছে আমায়! এ রোগের এক ওষুধ — তা পাওয়া যাবে ঐ এলাকায় যেখানে সূর্য পাটে বসে, সেখানে মহানদীর খাড়াই পাড়ে কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে থাকে এক মস্ত বাঘিনী। সেই বাঘিনীর দুধ পেলেই কেবল আমার স্বাস্থ্য শক্তি ফিরতে পারে। এক্ষুনি রওনা দে, বাঘিনীর দুধ আমায় এনে দে!'

এই বলে খাঁ আরো বেশি ছটফট করতে লাগল, আরো জোরে কোঁকাতে লাগল।

ছাউনিতে ফিরে তীরন্দাজ যাত্রার আয়োজন করলে। গায়ে চাপালে তার সেরা পোশাকটি, সঙ্গে নিলে তার সেরা হাতিয়ার। বৌ বলে:

'কোথায় চললে?'

তীরন্দাজ বলে:

'আমাদের খাঁয়ের খুব ব্যামো। যে দেশে সূর্য পাটে বসে, সেখানকার মহানদীর খাড়াই পাড়ে থাকে বাঘিনী, তার দুধেই কেবল এ ব্যামো সারবে। দেরি না করে সেখানে রওনা দেবার হুকুম করেছে। আপত্তি করার উপায় নেই, তাই ইচ্ছে না থাকলেও চললাম।'

বৌ টের পেলে, বাঘিনীর দুধের জন্যে তার স্বামীকে খামোকা পাঠাচ্ছে না জার্কিন-খাঁ, নিশ্চয় কোনো একটা গোপন উদ্দেশ্য আছে তার, কোনো একটা কুমতলব আছে। নিজের হলুদ-ফুটকি রুমালটা সে স্বামীকে দিয়ে বললে:

'এই রুমালটি নাও, বিপদ থেকে তোমায় বাঁচাবে। বাঘিনী যখন তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবে তখন রুমালটি নিয়ে নাড়িও। তা দেখলে শান্ত হয়ে যাবে বাঘিনী, তোমায় দুধ দুইতে দেবে। এ বাঘিনী আগে ছিল আমার কাছে।'

হলুদ-ফুটকি রুমালটি লুকিয়ে রেখে ঘোড়ায় চেপে বসল তীরন্দাজ। তরুণী বধূর কাছে বিদায় নিয়ে রওনা দিলে সূর্যাস্তের দেশে।

ঘোড়া ছুটল ঘর বাড়ির ওপর দিয়ে, মেঘের নিচ দিয়ে। পেছনে পড়ল খাদ নালা, পাহাড় পর্বত, পেছনে পড়ল লবণ হ্রদ, বালিয়াড়ি। দিনে খাওয়া নেই, রাতে ঘুম নেই, দিন রাতের হিসাব নেই — খাঁয়ের হুকুম পালন করে ঘরে ফেরার জন্যে এমনি তার তাড়া।

এমনি করে অনেক পথ পাড়ি দিয়ে পেঁছিল সাগরের মতো চওড়া মহানদীর খাড়াই পাড়ে। কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে এইখানে থাকে সেই মস্ত বাঘিনী।

তখনো পুরো একদিনের পথ, সেই দূর থেকেই বাঘিনী দেখেছিল তাকে। কান ফাটানো গর্জন করে সে ছুটল, তীরন্দাজকে কুটি কুটি করে ছিঁড়বে বলে। তীরন্দাজও অমনি তার বৌয়ের দেওয়া হলুদ-ফুটকি রুমাল বার করে দোলাতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল বাঘিনী, গর্জন বন্ধ করে শুধালে:

'বলো বীর, এ রুমাল তুমি পেলে কোথায়?'

তীরন্দাজ বললে:

'এ রুমাল আমার বৌ দিয়েছে।'

'এবার বলো, এখানে এলে কেন?' জিজ্ঞেস করে বাঘিনী।

তীরন্দাজ বলে:

'আমাদের খাঁয়ের ভারি জবর ব্যামো, তার জন্যে তোমার দুধ আনবার হুকুম দিয়েছে সে।'

বাঘিনী বললে, 'তাই যদি হয় তবে চট করে ঘোড়া থেকে নেমে তোমার মশকের মধ্যে দুধ দুয়ে নাও।'

ঘোড়া থেকে নেমে তীরন্দাজ পুরো এক মশক দুধ দুইলে বাঘিনীর। তারপর জিনের সঙ্গে মশক এঁটে বাঘিনীকে ধন্যবাদ দিয়ে তার কুশল কামনা করলে।

'তোমারও কুশল হোক,' বললে বাঘিনী। 'ঘরে ফিরে খাঁয়ের রোগ সারিয়ে তোলো, সৌভাগ্য হোক তোমার।'

এই বলে বাঘিনী ফিরে গেল তার কাচ্চা বাচ্চার কাছে, আর তীরন্দাজ উঠলে তার ঘোড়ায়।

ফিরেই মশক ভরা বাঘিনীর দুধ সে এনে দিলে খাঁয়ের কাছে। জার্কিন-খাঁ আর কী করে, দুধ খেয়ে বললে:

'দ্যাখো দিকি, সত্যিই সেরে উঠলাম!'

তীরন্দাজকে বিদায় দিয়েই খাঁ ডেকে পাঠাল তার দরখাঁ খয়েরখাঁদের। বলে:

'আমাদের প্রধান দরখাঁ খুবই সেয়ানা সলা দিয়েছিল, কিন্তু সুফল কিছু হল না। ভেবেছিলাম, তীরন্দাজকে ছিঁড়ে খাবে বাঘিনী, কিন্তু অক্ষত দেহে ফিরে এল তীরন্দাজ। কী কাজের ভার এখন ওর ওপর চাপানো যায়, যাতে আর কখনো এখানে ফিরতে না পারে?'

দরখাঁয়েরা মাথা ঘামাতে লাগল। কিন্তু যতই ভাবে, যতই মাথা কোটে, কিছুই আর ভেবে পায় না, একটিও জুতসই কথা মুখ দিয়ে বেরয় না।

তখন বাঁদিকের প্রধান দরখাঁ উঠে বললে:

'তীরন্দাজটিকে আমরা এমন জায়গায় পাঠিয়েছিলাম যেখানে আমাদের হিসেব মতো তার নির্ঘাৎ মরার কথা, কিন্তু মরল না সে। তার মানে সে কাজ করার মতো উপায় আমাদের নিজেদের হাতে নেই। আমার মতে তাই একটি পথ বাকি আছে: যত ডাকু বদমাইশদের জড়ো করে তাদের সরাব খাইয়ে মাতাল করো, চর্বি মাংস খাইয়ে পেট ভরাও, তারপর জিজ্ঞেস করো, তীরন্দাজের হাত থেকে রেহাই পাওয়া, তাকে খতম করার উপায় কেউ জানে কী না।'

'ঠিক, এই কাজই করতে হবে!' রাজী হল সবাই।

দিন ধার্য করে খাঁ আর দরখাঁয়েরা ডেকে গোপনে জড়ো করলে যত খুনে ডাকু চোর বদমাইশদের। পেট পুরে মাংস খাওয়ালে, আকণ্ঠ সরাব খাওয়ালে, তারপর জিজ্ঞেস করতে লাগল:



'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এই তীরন্দাজের হাত থেকে আমাদের খাঁকে উদ্ধার করতে পারবে? তোমাদের মধ্যে একাজের উপযোগী যদি কেউ না থাকে, তাহলে আমাদের বলো, কে গোপনে গুমখুন করতে পারবে তাকে?'

এই সব কথা জিজ্ঞেস করে খাঁ আর দরখাঁয়েরা, পায়চারি করে আর অপেক্ষা করে কী বলবে ডাকু বদমাইশরা। ডাকুরা কিন্তু কথা বলে না, মুখ যেন মাংসে ঠাসা। ফের জিজ্ঞেস করা হল — কিন্তু চুপচাপই বসে থাকে ডাকু বদমাইশরা। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল একচোখো এক বদমাইশ, আলখাল্লা খুলে বুকে চাপড় মেরে বললে:

'আমি জানি তার উপায়!'

তার কথা শুনে খাঁয়ের আনন্দ আর ধরে না, হুকুম করে:

'বল দেখি, কী তুই জানিস!'

একচোখোটা বলে:

'তীরন্দাজকে পাঠাতে হবে অজানা দেশের অদেখার জন্যে। এই অজানা দেশ খুঁজে বেড়াবে তীরন্দাজ, এমন জিনিস খুঁজবে যার স্থান নেই, রূপ নেই, সারা জীবনভোর খুঁজেও তা পাবে না, এ রাজ্যে মুখ দেখাবারও সাহস হবে না!'

একচোখো বদমাইশটার এই কথা শুনে জার্কিন-খাঁ আর দরখাঁদের আনন্দ ধরে না। প্রচুর পুরস্কার দিয়ে তাকে বিদায় দেওয়া হল। একটা ছুতো দেখাবার জন্যে ফের রোগের ভান করলে খাঁ, তীরন্দাজকে ডেকে পাঠিয়ে কোঁকাতে কোঁকাতে বললে:

'আবার এক জবর ব্যামো ধরেছে আমায়! তা থেকে উদ্ধার পেতে হলে চাই এমন এক জিনিস যার স্থান নেই, রূপ নেই, যা মিলবে কেবল অজানা এক দেশে। আমার একাজ তুই ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না, এখুনি রওনা দে, ও জিনিস তুই এনে দে আমার জন্যে!'

'কোন দেশে যাব, কী জিনিস আনব?' জিজ্ঞেস করে তীরন্দাজ।

জ্যার্কিন-খাঁ বলে, 'সে সব জানি না, কেবল এই জানি যে শুধু তুই-ই পারিস সে জিনিস এনে দিতে। না এনে দিলে আমি আর বাঁচব না!'

এই বলে যত পারে গোঙায়, ছটফট করে।

নিজের ছাউনিতে ফিরে তীরন্দাজ ভাবতে বসল কী করা যায়। তিন দিন তিন রাত ধরে ভাবলে। দিনে গিয়ে বসে এক পাহাড়ের চুড়োয়, রাতে ঘুম নেই, কেবলি

এপাশ ওপাশ করে আর ভাবে। অনেক ভেবে ভেবেও কোনো কূল পেলে না। বৌকে কিন্তু একটি কথাও বলে না, কে জানে যদি ভয় পায়?

তিন দিন পরে সে ঘোড়ায় চেপে ঠিক করলে যে দিকে দু'চোখ যায় চলে যাবে।

ভাবে, 'বলা যায় না, হয়ত তাতে গিয়ে পেঁছিব সেই অজানা দেশে।'

ঘোড়ায় চেপে বিদায় নিলে বৌয়ের কাছে।

বৌ বলে, 'চললে কোথায়?'

তীরন্দাজ বলে, 'আবার রোগ ধরেছে আমাদের খাঁকে। তার হুকুমে আমি চলেছি অজানা দেশে, এমন জিনিস আনতে হবে যার স্থান নেই, রূপ নেই।'

বৌ সব শুনেটুনে বললে:

'সে দেশে তো ঘোড়ায় চেপে যাওয়া যাবে না, বরং পায়ে হেঁটে যাও। এই সুতোর গুটিটা নাও, ছাউনি থেকে তিন পা এগিয়ে গুটিটা ছুড়ে দিয়ো। গুটিটা যেদিকে গড়িয়ে যাবে সেই দিকে যেও। আর এই নাও এক সোনার চিরুণী। রোজ সকালে তা দিয়ে চুল আঁচড়িয়ো।'

তরুণী বধূর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তীরন্দাজ ছাউনি থেকে তিন পা এগিয়ে গুটিটা ছুড়ে ফেললে। গুটিও অমনি গড়াতে লাগল, তীরন্দাজও চলল গুটির পেছু পেছু।

গুটির পেছু পেছু সে চলল নোনা ভূমি আর বালিয়াড়ি পেরিয়ে, উঠল পাহাড়ের শিখরে, নামল খাদের অতলে, পেরিয়ে গেল হ্রদ আর ডাঙা, নলখাগড়ার ঝোপ আর ঝাড়। দিনে খাওয়া নেই, রাতে ঘুম নেই। কত দিন, কত হপ্তা, কত মাস কাটল তার হিসেব নেই। শেষ পর্যন্ত গুটির পেছু পেছু সে এসে পেঁছিল এক মস্ত অন্ধকার বনে। দিনে রাতে না জিরিয়ে চলেছে বনের মধ্য দিয়ে আর গুটি কিন্তু কেবলি গড়ায় গড়ায়। গড়িয়ে গড়িয়ে একটা ছোট্ট ছাউনির কাছে গিয়ে উধাও হয়ে যেন বা গলে গেল বরফের মতো।

তীরন্দাজ ভাবে, 'কী করি এবার? এই ছাউনির ভেতরেই ঢুকতে হয় তাহলে।'

নকশাদার পর্দা তুলে সে ঢুকল ভেতরে। দেখে, এক ছোট্ট সুন্দরী মেয়ে। বলে:

'বলো কে তুমি, কোথা থেকে আসছ, যাবে কোথায়?'

'আমি খাঁয়ের তীরন্দাজ,' বললে বীর, 'কোথায় চলেছি তা আমি নিজেই জানি না।'

ছোট্ট মেয়েটি আর কিছু জিজ্ঞেস করলে না। খাওয়ালে দাওয়ালে, বিছানা পেতে শোয়ালে। শুতেই ঘুমিয়ে পড়ল তীরন্দাজ।

সকালে উঠে হাত মুখ ধুয়ে সোনার চিরুণী দিয়ে মাথা আঁচড়াতে লাগল। ছোট্ট ছাউনির গিন্নি তা দেখে শুধোয়:

'সোনার এ চিরুণী কোথায় পেলে?'

'এ চিরুণী দিয়েছে আমার বৌ,' বললে তীরন্দাজ।

ছোট্ট মেয়েটি খুশি হয়ে উঠল।

বলে, 'তাহলে তো তুমি আমার পর নও। তুমি যে আমার ছোটো বোনের বর। কাল সাঁঝে সে কথা বললে না কেন?'

তীরন্দাজের সামনে নানা রকম খানাপিনা পরিবেশন করে সে বলে:

'অমন দূরের পথ, কঠিন পথ হেঁটে এসেছ, পাদুটো একটু জিরোক। আমার এখানে থাক তিন দিন।'

তার ছাউনিতে তিন দিন কাটালে তীরন্দাজ।

বেশ ভালো রকম জিরনো হলে তিন দিনের দিন মেয়েটি ওকে বলে:

'এবার বলো চলেছ কোথায়, কিসের জন্যে।'

তীরন্দাজ বললে:

'আমাদের খাঁয়ের বড়ো ব্যামো, আমায় বলেছে অজানা দেশে গিয়ে তার জন্যে এমন একটা জিনিস আনতে হবে যার স্থান নেই, রূপ নেই। সে যে কী জিনিস তা আমিও জানি না। আমার বৌ, তোমার ছোটো বোন আমায় এক সুতোর গুটি দিয়ে তার পেছু পেছু যেতে বলেছে। তারই পেছু পেছু এসে পৌঁছেছি তোমার এখানে। এবার যে কোন দিকে যাব জানি না, সুতোর গুটিটা হারিয়ে গেছে!'

ছোট্ট ছাউনির কর্ত্রী একটা রেশমী সুতোর গুটি দিয়ে বললে:

'এই গুটির পেছু পেছু যেয়ো। এটা তোমাকে পৌঁছে দেবে আমাদের বড়ো

বোনের কাছে। হয়ত সে তোমায় বলবে, কোথায় যেতে হবে, কোথায় পাবে সেই আজব জিনিস যার স্থান নেই, রূপ নেই।'

ফের সুতোর গুটির পেছু পেছু চলল তীরন্দাজ। চলল দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, জিরিয়ে নেবার জন্যেও কোথাও একটু বসলে না। সেই অন্ধকার বনটা থেকে বেরিয়ে সে তিরিশ দিন তিরিশ রাত চলল স্তেপের ওপর দিয়ে। তারপর ফের ঢুকল এক মস্ত গহীন বনের মধ্যে।

গাছপালা ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে গড়িয়ে চলে গুটি। ডালপালায় গা ছড়ে যায়, মুখে ঝাপটা এসে পড়ে, কিন্তু থামে না তীরন্দাজ — চলে আর চলে।

শেষ পর্যন্ত বনের মাঝামাঝি এক ছোট্ট ছাউনির দোরগোড়ায় এসে মিলিয়ে গেল গুটি।

ছাউনির ভেতর থেকে ছোট্ট এক সুন্দরী মেয়ে বেরিয়ে এসে বলে:

'কে তুমি, কোথা হতে আসছ, যাবে কোথায়?'

তীরন্দাজ বলে, 'আমি মুসাফির, দূর থেকে আসছি, দূর দেশে যাব।'

ছাউনির কর্ত্রী আর কিছু জিজ্ঞেস করলে না, ছাউনির মধ্যে নিয়ে গিয়ে খাওয়ালে দাওয়ালে, বিছানা পেতে শোয়ালে।

সকাল বেলায় উঠে তীরন্দাজ হাত মুখ ধুয়ে সোনার চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে। কর্ত্রী তা দেখে বলে:

'সোনার চিরুণী পেলে কোথায়?'

'এ চিরুণী আমায় বৌ দিয়েছে,' বললে তীরন্দাজ।

শুনে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ছোট্ট মেয়েটির, আনন্দ করে বলে:

'তবে তো তুমি আমার পর নও, তুমি যে আমার ছোটো বোনের বর! এ কথা আগে বলতে হয়।'

ঘরে যা কিছু ছিল সব ভালো ভালো খানাপিনা ধরে দিলে, খুবই খাতির করতে লাগল। পেট ভরে খাওয়া দাওয়ার পর কর্ত্রী বললে:

'পাজোড়া তোমার হয়রান হয়েছে, একটু জিরোক। ভালো করে বিশ্রাম নাও এখানে।'

তিন দিন তিন রাতের পর ছোট্ট মেয়েটি বললে:

'এবার বলো কোথায় চলেছ, কিসের জন্যে। কিছু গোপন কোরো না।'

তীরন্দাজ সব কথাই তাকে বললে — কেন চলেছে, কোথায় চলেছে।

সব কথা শুনে মেয়েটি মাথা নেড়ে বললে:

'কিন্তু সে অজানা দেশ যে কোথায় তা তো আমি জানি না। আমার অনুচরদের তাহলে জিজ্ঞেস করতে হয়।'

এই বলে তার সোনার শিঙাটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে জোরে ফুঁ দিলে।

একশ' আট করুণ সুর বাজল তাতে, বাষট্টি আনন্দের সুর। অমনি ছুটে ছুটে, ডানা মেলে, বুকে হেঁটে এসে জুটল যত জীব — বন প্রান্তরের যত জন্তু, আকাশের যত পাখি, মাটির নিচের যত কীট — যত প্রাণী সব। ছোট্ট ছাউনির কর্ত্রীর চারপাশে ঘিরে দাঁড়াল তারা।

কর্ত্রী বললে:

'পশু পক্ষী, সর্বত্র তোমরা যাও, অবাধ তোমাদের গতি। সব জানো, সব শোনো। তোমাদের মধ্যে কে জানে, কোথায় আছে এমন জিনিস যার স্থান নেই, রূপ নেই, যা মিলবে অজানা এক দেশে। যদি কেউ জানো, এগিয়ে এসে বলো, 'আমি জানি।' যারা জানো না, বলো, 'আমরা জানি না।' ফিরে চলে যাও নিজের নিজের জায়গায়।'

পাখিরা বললে:

'আমরা জানি না!' বলেই উড়ে গেল।

পশুরা বললে:

'আমরা জানি না!' বলেই ছুটে গেল বনে প্রান্তরে।

কীট পতঙ্গেরা বললে:

'আমরা জানি না!' বলেই ফিরে গেল।

ছোট্ট মেয়েটি তখন ফের ফুঁ দিলে তার শিঙায়, একশ' আট করুণ সুর বাজল, বাষট্টি আনন্দের সুর, তার চারপাশে ঘিরে এল জলের যত প্রাণী — মাছ, কাছিম, ব্যাঙ, সাপ, চিংড়ি। ছোটো ছাউনির কর্ত্রী বললে:

'সাপেরা, মাছেরা — সর্বত্র তোমরা যাও, দূর জলে পাড়ি দাও, সব কিছু জানো, সব কিছু শোনো — আমায় বলো তো, কী করে যাওয়া যায় এক অজানা দেশে যেখানে আছে এমন এক জিনিস যার স্থান নেই, রূপ নেই। যদি কেউ

জানো সে এগিয়ে এসে বলো, ‘জানি।’ যারা জানো না, তারা ‘জানি না’ বলে বাড়ি চলে যাও।’

মাছ, কাছিম, সাপ, ব্যাঙ, চিংড়ি — সবাই চেঁচামেচি করে বললে, ‘জানি না! জানি না! জানি না!’ বলে ফিরে গেল হ্রদ নদী জলায়।

গেল না কেবল একটা প্রকাণ্ড মতো চিংড়ি। একবার করে জলের দিকে এগোয়, একবার করে ছাউনির দিকে ফেরে। চিংড়ি কী করবে বুঝতে পারছে না দেখে মেয়েটি জিজ্ঞেস করলে:

‘তুমি চিংড়িদের খাঁ?’

চিংড়ি বললে, ‘হ্যাঁ।’

‘কী তুমি জানো, কী শুনেছ? কী বলতে চাও? তা সে সত্যি খবর হোক মিথ্যে গুজব হোক, আমায় বলো!’

চিংড়ি বলে:

‘জানি নাও বটে, জানিও বটে!’

‘যা বলবে, নির্ভয়ে বলো!’ হুকুম দিলে ছোট্ট ছাউনির কর্ত্রী।

তখন চিংড়ি বললে:

‘এখান থেকে বেরিয়ে দুপুরের সূর্য বরাবর হাঁটলে এক মাসের পথের পর মিলবে এক মস্ত সাগর। সাগর পেরতে না পারলে মুসাফির যেন পশ্চিম মুখো চলে। এক মাসের পথের পর মিলবে খেয়াঘাট। খেয়া পেরিয়ে সাগরের অপর তীরে পৌঁছলে মিলবে মস্ত এক সড়ক। সে সড়ক চলে গেছে দুপুরবেলার কাছে। সে সড়কে এক মাসের পথ পাড়ি দিলে মিলবে পূর্ব দিকে এক মস্ত গহন বন। সড়ক থেকে এই বনের দিকে চলে গেছে দুই চাকার দাগ। সেই দাগ ধরে এগুলে বনে পৌঁছবে। পথও সেইখানে শেষ। তারপরে কী আমার জানা নেই।’

এই বলে চিংড়ি চলে গেল তার হ্রদে।

ছোট্ট মেয়েটি তীরন্দাজকে বলে:

‘কী বীর, শুনলে তো কী বলল চিংড়িদের খাঁ?’

‘শুনলাম,’ বললে তীরন্দাজ।

‘শুনেছ যখন তখন যাত্রা করো। যেখানে যেতে চাও সেই অজানা দেশ হয়ত

ওইটাই। সে দেশের আর কোনো খবর কেউ জানে না। তোমাকেই বুদ্ধি করে বার করতে হবে!'

তীরন্দাজকে খাইয়ে দাইয়ে তার যাবার আয়োজন করে দিলে। ছোট্ট ছাউনির কর্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তীরন্দাজও রওনা দিলে।

দিনের পর দিন সে চলেছে তো চলেছেই, কোথাও থামে না। পুরো এক মাস পাড়ি দিয়ে পেঁৗছল সাগরে। সাগরের দিকে দেখে তীরন্দাজ বুঝলে, পেরনো যাবে না। তাই পশ্চিম মুখো হয়ে চলতে লাগল সাগরের তীর ধরে। আরো এক মাসের পথ পাড়ি দিয়ে সে এল খেয়াঘাটের কাছে। খেয়া পেরিয়ে সমুদ্রের অপর পারে উঠে পেল সেই বড়ো সড়ক। সড়ক ধরে আরো পুরো এক মাসের পথ পাড়ি দিলে সে।

মাস কাটতেই তীরন্দাজ পূর্ব দিকে দেখে এক মস্ত গহীন বন। এক মুহূর্ত দেরি না করে সে গেল বনের দিকে, খুঁজে বার করলে দুই চাকার চওড়া দাগ। সড়ক ছেড়ে সে তখন সেই চাকার দাগ ধরে চলল তিন দিন তিন রাত ধরে, তারপর পেঁৗছল এক গহন বনে।

বনের মধ্যে ঢুকে তীরন্দাজ দেখে কি — দু'চাকার সে দাগ গেছে গাছপালার মধ্য দিয়ে। সেই দাগ ধরে চলল। দাগ কিন্তু এক দুর্গম জঙ্গলের কাছে পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়ে গেছে। সেই জঙ্গলের ভেতরে ঢুকলে তীরন্দাজ। বড়ো বড়ো কালো কালো গাছের ডালে আকাশ ঢাকা, কোথাও এতটুকু আলো নেই, কোথাও রোদের দেখা নেই। সামনে নয়, বাঁয়ে নয়, ডাইনে নয় — কোনো দিকেই পথ নেই। থেমে দাঁড়িয়ে তীরন্দাজ ভাবে, 'কী করি এখন? এত লম্বা পথ পাড়ির পর কি এখন পেছন ফেরা চলে?'

চারিদিকে তাকিয়ে দেখতেই হঠাৎ চোখে পড়ল একটা গর্ত। সেই গর্তের ভেতর নেমে চলল এক সুরঙ্গ দিয়ে। চলতে চলতে গিয়ে পেঁৗছল মাটির নিচের ঘরে। সেই ঘরে ঢুকে তাকিয়ে দেখে কেউ কোথাও নেই। কান পাতল — একটি শব্দও নেই কোথাও। অথচ বেশ বোঝা যায় কেউ না কেউ বাস করে এখানে।

'অজানা কে যেন বাস করে এখানে,' ভাবে তীরন্দাজ, 'হুঁশিয়ার থাকতে হবে, বিপদে না পড়ি।'

দেখে দেয়ালে একটা গভীর ফাটল, সেই ফাটলের মধ্যে ঢুকে সে গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমের মধ্যেই শোনে — গাড়ির চাকার ঘড়ঘড় শব্দ, এমন জোর শব্দ যে সাধারণ কোনো গাড়িতে শোনা যায় না।

আরো ভালো করে লুকিয়ে রইল, লুকিয়ে লুকিয়ে ভাবে, 'কী জানি কী হয়!'

শোনে, গাড়ি এসে থামল একেবারে ঐ বাড়ির সামনেই। ভয়ংকর চেহারার এক বীর এসে ঢুকলে ঘরে। গায়ে তার ঝলমলে সাজ, কোমরবন্ধে দামী দামী হাতিয়ার। হাতিয়ারপত্র খুলে সে একপাশে টাঙিয়ে রাখলে। নিজের পোশাক খুলে টাঙিয়ে রাখলে অন্য দিকে। তারপর বাবু হয়ে বসে বললে:

'মুর্জা, খেতে দে!'

কথাটা বলতে না বলতেই তার সামনে এসে খুলে গেল হলদে বুটিদার জাজিম, জাজিমের ওপর নানা রকমের সব সুস্বাদু খানাপিনা, ফলমূল, কী চাই!

খেয়ে দেয়ে হুকুম দিলে বীর:

'মুর্জা, সরিয়ে নিয়ে যা!'

অমনি যত খানাপিনা পেয়ালা পিরিচ নিয়ে হলদে বুটিদার জাজিম উধাও হয়ে গেল, শূন্য হয়ে মিলিয়ে গেল। আগন্তুক বীরও তারপর পোশাক আশাক পরে হাতিয়ারপত্র নিয়ে বেরিয়ে গেল এই পাতালপুরী থেকে। ঘড়ঘড় মড়মড় করে উঠল গাড়ির চাকা — চলে গেল সে।

গুপ্ত জায়গাটা থেকে বেরিয়ে দেখে কেউ নেই, কিছুই নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে ভাবে:

'কে এই বীর? তাকে খানাপিনাই বা দিলে কে? খাওয়ার পর যা বাকি ছিল সেগুলোই বা গেল কোথায়? ও যা করেছিল তাই করে দেখলে হয়!'

নিজের হাতিয়ারপত্র খুলে তীরন্দাজ টাঙিয়ে রাখলে সেই খোঁটায় যেখানে টাঙিয়ে রেখেছিল অজানা বীরটা। পোশাক খুলে টাঙিয়ে রাখলে অপর খোঁটায় যেখানে পোশাক টাঙিয়েছিল অজানা বীরটা। তারপর গদির ওপর বাবু হয়ে বসে বললে:

'মর্জা, খেতে দে!'

নিমেষের মধ্যে অমনি তার সামনে খুলে গেল হলদে বুটিদার জাজিম, তার ওপর সেরা সেরা খানাপিনা একেবারে অঢেল। যত পারো খাও দাও!

খেলে তীরন্দাজ, পান করলে, পরিতৃপ্ত হয়ে বললে:

'কোথায় তুই মর্জা? আয় বস, খিদে মিটিয়ে তুইও খানাপিনা কর!'

মর্জাও অমনি এসে খেতে শুরু করলে। পেট ভরে খাওয়ার পর বললে:

'এই যে বীর কিছুক্ষণ আগে এখানে এসেছিল তাকে তিরিশ বছর ধরে আমি খাওয়াচ্ছি দাওয়াচ্ছি, কিন্তু একবারও সে আমায় বলে নি: 'আয় বস, খানাপিনা কর!' তোমায় আমি খেতে দিয়েছি কেবল একবার, কিন্তু তুমি বললে, 'বস মর্জা, খেয়ে নে!' তোমার কাছে থাকাই আমার ভালো। আমায় তুমি সঙ্গে নিয়ে চলো!'

তীরন্দাজ বলে, 'বেশ, নিয়ে যাব, তোর জন্যেই তো আমার এখানে আসা, তোকেই তো আমি খুঁজে মরছি, আচমকা পেয়ে গেলাম এখানে!'

'তাহলে আজ থেকে আমি তোমার হলাম, তোমার সঙ্গেই যাব!' বলে মর্জা।

তীরন্দাজ বলে, 'বেশ, একসঙ্গেই যাব!'

পাতালপুরী থেকে বেরিয়ে ওরা চলল। তীরন্দাজের পাশেপাশেই চলেছে মর্জা কিন্তু কেউ তাকে দেখতে পায় না।

কতদূর গেল কে জানে, হঠাৎ শোনে চাকার ভয়ঙ্কর ঘড়ঘড় শব্দ।

তীরন্দাজকে মর্জা বলে:

'এ আমার সেই আগের মনিব আসছে তার কালো ন্যাড়া আট ঘোড়ার গাড়িতে চেপে। আমায় ডাকাডাকি করবে, কিন্তু সাড়া আর কেউ দেবে না!'

গভীর সন্ধ্যায় তীরন্দাজ এসে পৌঁছল এক বিজন এলাকায়। দেখে কি — একটা কালো বিবর্ণ ছাউনি, চারিদিকে ফুটো ফাটা। ছাউনির ভেতর ঢুকল তীরন্দাজ, দেখে এক দরবেশ-দয়াণ্ড নামাজ পড়ছে, লোকটা তার দিকে ফিরেও তাকাল না।

তীরন্দাজ বলে, 'দরবেশ বুড়ো, তোমার কাছে এক আর্জি আছে, তোমার ছাউনিতে আজ রাতটা কাটাব।'

নামাজ পড়া থামিয়ে বুড়ো বললে:

'এ জায়গায় আজ পর্যন্ত কোনো লোক আসে নি। তুই এলি কোত্থেকে, চলেছিস কোথায়?'

'এসেছি আমাদের রাজ্যের খাঁয়ের হুকুমে, এবার ফিরছি,' বললে তীরন্দাজ।

দরবেশ বললে:

'রাত কাটাবার মতো জায়গা এখানে আছে, কিন্তু তোকে খাওয়াতে পারব না। শুলুন নেই, পোলাও নেই আমার, চা নেই টা নেই, কিছুই নেই। এমন কি একটা ডেকচি কড়াইও নেই এ ছাউনিতে!'

তীরন্দাজ বলে, 'আমার কিছু দরকার নেই। শুধু রাত কাটাতে পারলেই হল।'

'বেশ, তাহলে থাক!' বলে দরবেশ-দয়াণ্ডি।

নিজের ছাউনিটিতে তীরন্দাজকে আশ্রয় দিয়ে দরবেশ ফের নামাজ পড়তে লাগল। তারপর শোয়ার আগে নিজের ঝুলি খুলে খেতে শুরু করলে। তাতে আছে কেবল পাথরের ফাঁক ফুঁক থেকে কুড়িয়ে আনা বৈঁচি, শুকনো ফল পাকুড়। বসে বসে তাই খায় দয়াণ্ডি আর তীরন্দাজকে বলে:

'দেখছিস তো কী খেয়ে থাকি? এই অখাদ্য কি আর তোকে দিতে পারি? তাও এ আমার কতটুকু। কুড়িয়ে আনব তার সময় কই। নামাজ নিয়েই সময় কাটে।'

তীরন্দাজ রাগ করলে না।

বললে, 'তুমি তোমারটা খাও, আমিও আমারটা খাই। মুর্গী, খাবার দে!'

কথাটা বলতেই সামনে খুলে হলদে বুটিদার জাজিম, তার ওপর নানা রকমের খানাপিনা। যত ইচ্ছে খাও দাও!

তীরন্দাজ জাজিমের ধারে বসে বলে:

'কী দয়াণ্ডি বুড়ো, আমার সঙ্গে বসে একটু খেয়েই নাও!'

বেশ অবাক হয়ে গেল বুড়ো, তীরন্দাজের সঙ্গে বসে খেতে শুরু করলে, তারিফ করলে। মুর্গীকেও ডাকলে তীরন্দাজ, তাকেও খাওয়ালে দাওয়ালে। সবাই পেট পুরে খাবার পর তীরন্দাজ বললে:

'সরিয়ে নিয়ে যা, মুর্গী!'

জাজিমের ওপর যা ছিল সব অদৃশ্য হল, হলদে বুটিদার জাজিমটাও মিলিয়ে গেল।

সুস্বাদু খাবার খেয়ে ভারি ভালো লাগল দয়াণ্ডির।

তীরন্দাজকে বললে:

'শোন বীর, তোর ঐ মুর্জা আর জাজিমখানা আমার সঙ্গে বদলাবদলি কর!'

তীরন্দাজ বলে, 'উহুঁ, বদল করব না। ও আমার নিজেরই দরকার!'

সারা রাত ধরে মিনতি করলে দয়াণ্ডি।

'বদল কর বীর, তোকে দেব আরো আজব এক জিনিস!'

'কী জিনিস দেবে?' জিজ্ঞেস করে তীরন্দাজ।

'আয় দেখাচ্ছি!' বললে দয়াণ্ডি।

এই বলে সে একটা লম্বা রেশমী রুমাল নিয়ে তীরন্দাজকে বললে সঙ্গে আসতে। বাইরে এসে দয়াণ্ডি রুমাল দুলিয়ে বললে:

'প্রাসাদ হোক!'

পলকের মধ্যে অমনি সামনে দাঁড়াল এক অপরূপ পুরী, শিখর তার আকাশ ছোঁয়। কী বাহার সে পুরীর, চারিদিকে সোনা রুপোর কারু কাজ করা, তার মধ্যে চোখের মতো জ্বলজ্বল করছে প্রবাল আর মণিমুক্তা। এই তার বাইরের শোভা আর ভেতরে তার যে সাজসজ্জা — তেমন বাহার, তেমন জাঁক খাঁয়ের খাঁ আজম খাঁর পুরীতেও দেখা যায় না।

এই পুরী দেখিয়ে বুড়ো দয়াণ্ডি তীরন্দাজকে বলে:

'তোর বয়স কম রে, পুরী তোর কাজে লাগবে। আর আমার দরকার ভালোমন্দ খাবার, মিষ্টি-মধুর সরাব। আমার রুমালটা তুই নে আর তোর ঐ মুর্জা আর জাজিম আমায় দে!'

কিন্তু দয়াণ্ডি যতই বোঝায়, তীরন্দাজ রাজী হয় না।

বলে, 'না, আমার মুর্জাকে আমি দিতে পারব না!'

আর মুর্জা তার কানে কানে বলে:

'বদলে নাও! ও পুরীও তোমার হবে, আমিও তোমারই থাকব। বদলে নাও!'

মুর্জার কথা মেনে তীরন্দাজ বদল করলে।

বুড়ো দয়াণ্ডি রুমাল নেড়ে বললে:

'মিলিয়ে যা!' অমনি পলকের মধ্যে মিলিয়ে গেল পুরী।

তীরন্দাজ তার রুমালটা নিয়ে বললে:

'এবার মুর্জা রইল তোমার কাছে!'

দয়াণ্ডির কাছে বিদায় নিয়ে ও চলে গেল। গিয়ে পেঁাছল এক গিরি সংকটের কাছে। তাকে পাশ কাটিয়ে পার হয়ে সে বলছে:

'হঠকারী কাজ করলাম না তো? খামোকাই বদলাবদলি করেছি হয়ত। আমার এক বাহারে পুরী আছে এখন, কিন্তু মুর্জা তো নেই। কে জানে কী করছে এখন সে, কোথায় আছে?'

হঠাৎ শোনে: 'দুঃখু কোরো না বীর, আমি তোমার পাশেই! কখনো তোমায় ছেড়ে যাব না!'

'আর বুড়ো দয়াণ্ডির কী হল?' জিজ্ঞেস করে তীরন্দাজ।

মুর্জা বলে, 'সে তার নামাজ-কলমা নিয়ে থাক। আমি ওর চাকর নই!'

আনন্দ হল তীরন্দাজের। চলল আরো এগিয়ে। কখনো পায়ে হাঁটে, কখনো ছুটে চলে, ধৈর্য আর ধরে না, সুন্দরী তরুণী বৌটির কাছে কত তাড়াতাড়ি ফেরা যায়। এমনি করেই না থেমে চলল সে, দিন রাতের হিসেব করলে না, শেষ পর্যন্ত এসে পেঁাছল সাগরে।

তীরন্দাজ ভাবে, 'যদি সাগর ঘুরে যেতে হয় তাহলে আরো এক মাসের পথ। দেখি না এখানে কোনো জাহাজ নৌকো মেলে কি না।'

সাগরের তীর ধরে ও হাঁটে। দেখে কি, তীরে এসে লেগেছে এক মস্ত জাহাজ। জাহাজে অসংখ্য সৈন্য, অপর তীরে পাড়ি দেবে তারা। তীরন্দাজ জাহাজের কাছে এসে বলে:

'অনেক দূর দেশ থেকে আসছি। মেহেরবানি করে দরিয়া পার করে দাও!'

সেনাপতি বললে:

'ওঠ জাহাজে, পার করে দেব তোকে!'

জাহাজে উঠে তীরন্দাজ সৈন্যদের সঙ্গে সাগর পাড়ি দিলে। খিদে পেয়েছে সবার, খেতে শুরু করেছে সৈন্যরা। তীরন্দাজ বলে:

'আমায় কিছু দাও বাপু খেতে!'

সৈন্যরা বলে, 'ইস কী সখ! জাহাজে উঠতে দিয়েছি, এখন আবার ওকে খাওয়াতেও হবে! আমাদের কী লাভ? দেব না খেতে। আমাদের খানা মাপা, তোকে দেব কোত্থেকে!'

তীরন্দাজ বলে:

'তোমাদের খানা মাপা কিন্তু আমার খানার মাপ নেই: ইচ্ছে করলে তোমাদের সকলকে খাওয়াতে পারি, তাতেও বাকি থাকবে!'

চটে উঠে সৈন্যেরা গালাগালি করতে লাগল তীরন্দাজকে।

'খুব যে বড়াই দেখছি, মিথ্যুক কোথাকার!'

গিয়ে সব বললে সেনাপতির কাছে। সেনাপতি তীরন্দাজকে ডেকে জিজ্ঞেস করে:

'তুই নাকি বড়াই করেছিস, আমার সমস্ত সৈন্যদের তুই খাওয়াতে পারিস?'

'বড়াই করি নি, সত্যি বলেছি,' জবাব দেয় তীরন্দাজ।

'তাহলে করে দেখা। তবেই বিশ্বাস করব তুই সৎ লোক। আর যদি মিথ্যে বলে থাকিস তবে ষাঁড়ের মতো প্রকাণ্ড একটা পাথর তোর গর্দানে বেঁধে দরিয়ায় ফেলে দেব!'

তীরন্দাজ বলে, 'বেশ, দেখিয়ে দিচ্ছি আমার কথা সত্যি কিনা। দুই সারি দিয়ে বসো তোমরা, মাঝখানে যেন যাওয়ার মতো ফাঁক থাকে।'

জাহাজের এক মুড়ো থেকে আরেক মুড়ো পর্যন্ত মুখোমুখি হয়ে বসল সৈন্যরা।

তীরন্দাজ বললে, 'মুর্জা, এই সৈন্যদের তাহলে পেট পুরে খাইয়ে দে!'

অমনি জাহাজের এমুড়ো থেকে ওমুড়ো পর্যন্ত খুলে গেল এক হলদে বুটিদার জাজিম — তার ওপর নানা রকমের খানাপিনা, নানা রকমের ফলমূল। যেটা খুশি খাও, যত খুশি খাও!

খানাপিনা করলে সৈন্যরা, আকণ্ঠ পেট ভরালে, কিন্তু খাবারের কমতি নেই, এত জিনিস বাকি রইল যে পুরো একদল সৈন্যকে খাওয়ানো চলে।

তীরন্দাজ বলে, 'পেট ভরেছে সবার?'

'ভরেছে!' বললে সৈন্যেরা।

'তাহলে সাফ কর, মুর্জা!' বললে তীরন্দাজ।

অমনি পলকের মধ্যে সব অদৃশ্য হল — খানাপিনা, পেয়ালা পিরিচ সব।

দেখে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল সৈন্যেরা।

বলে, 'এমন আশ্চর্য ব্যাপার আমরা কখনো দেখি নি!'

এই আজব বাবুর্চিটিকে কী করে হাত করা যায় সেই কথা বলাবলি করতে লাগল ওরা। তীরন্দাজকে বললে:

'ওকে বেচে দে আমাদের কাছে!'

তীরন্দাজ বলে, 'উহুঁ, ও বেচার নয়!'

কত মিনতি করলে, কত সোনা রুপো দেবে বললে, কিন্তু তীরন্দাজকে রাজী করানো গেল না।

সৈন্যেরা বললে, 'যদি বেচতে না চাস তো বদল কর! অন্য একটা আজব জিনিস আমরা তোকে দেব!'

তীরন্দাজ বলে, 'কী আর দেবে? আমার মুর্জার মতো দামী জিনিস কোথায় পাবে? ওকেই আমার সবচেয়ে বেশি দরকার!'

সৈন্যেরা নিয়ে এল এক মাথা-মোটা সোনার দণ্ড। সেটি দেখিয়ে বলে:

'এই দণ্ডটা তোকে দেব। এর খুব আশ্চর্য গুণ: যদি মাথাটা দিয়ে মাটিতে বাড়ি মারা যায়, তাহলে কেবলি বেরিয়ে আসতে থাকবে ঘোড়সওয়ার, তার আর শেষ নেই, — সবারই গায়ে ঝকঝকে বর্ম, সবারই হাতে ইস্পাতের তলোয়ার। আর যদি সরু দিকটা দিয়ে বাড়ি মারা যায়, তাহলে কেবলি বেরিয়ে আসবে যত তীরন্দাজ, তার আর শেষ নেই, সবারই হাতে তীর ধনুক।'

মুর্জা সেই দণ্ডটা দেখে তীরন্দাজের কানে কানে ফিসফিস করে।

বলে, 'বদলে নাও। এ সৈন্যদলও তোমার হবে, আমিও তোমার থাকব!'

তীরন্দাজ তার কথা শুনে বদলাবদলি করলে। নিজে নিলে সোনার দণ্ডটা।

সাগর পার হয়ে সৈন্যরা চলে গেল নিজেদের দিকে, আর তীরন্দাজ চললে নিজের পথে।

তীরন্দাজ হাঁটে আর বলে:

'কোথায় আমার মুর্জা?'

কিন্তু মুর্জার দেখা নেই, সাড়া নেই, শব্দ নেই।

আরো একদিন এক রাত গিয়ে তীরন্দাজ ফের বলে:

'কোথায় তুই, দোস্ত মুর্জা?'

কিন্তু মুর্জা নেই। কেউ সাড়া দেয় না। এগিয়েই চলল তীরন্দাজ। আরো দুই দিন দুই রাত কাটল। ফের সে তার দোস্তকে ডাকে:

'কোথায় তুই মুর্জা, সাড়া দে!'

কিন্তু মুর্জা নেই, কোনো সাড়া নেই তার। ভয়ানক দুঃখ হল তীরন্দাজের।

'বোঝা যাচ্ছে আমায় ঠকিয়েছে! খামোকাই ওকে বদল করলাম এই সৈন্যদের জন্যে!'

পাঁচ দিনের দিন সন্ধ্যায় তীরন্দাজ ভাবলে: 'শেষ বারের মতো ওকে একবার ডেকে দেখি!'

তাই ডাকলে:

'সাড়া দে মুর্জা, কোথায় তুই?'

অমনি শোনে:

'দুঃখ নেই বীর, মুর্জা তোমার এখানেই, ও বেলাতেই এসে পৌঁছেছি!'

তীরন্দাজের খুশি আর ধরে না। বসে-টসে বলে:

'তুই নেই, খিদের চোটে প্রাণ ওষ্ঠাগত। আয় খেয়ে নি তাড়াতাড়ি!'

অমনি খুলে গেল হলদে বুটিদার জাজিম — তার ওপর নানা রকমের খাবার। মুর্জার সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করে ফের রওনা দিলে তারা। দিনের পর দিন যায়, রাতের পর রাত — তার হিসাব নেই — শেষ পর্যন্ত ঠিক রাত দুপুরে এসে পৌঁছল জার্কিন-খাঁয়ের রাজ্যে।

নিজের ছাউনিতে গিয়ে বৌকে জাগিয়ে তুললে তীরন্দাজ।

বলে, 'ঘুম ভেঙে ওঠো বৌ, আমি এসেছি!'

বৌয়ের আনন্দ আর ধরে না, তাড়াতাড়ি উঠে উনুনে আগুন দিলে।

বলে, 'কুশলে ফিরেছ তো?'

জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে তারা, এতদিন কে কেমন কাটিয়েছে, কোথায় কী হয়েছে।

তীরন্দাজ বলে, 'আর আমাদের খাঁ কেমন আছে? অসুখ সেরেছে ওর? কেমন বোধ করছে?'

বৌ বলে, 'তুমি যেদিন গেছ সেদিন থেকেই তার আর ব্যামো নেই। তিন বার ও আমার কাছে এসেছিল, বলে, 'বেগম হও।' তিন বারই আমি তাকে বলি: 'নতুন সাদির কথাই আমার ভাবা চলে না। আমার স্বামী গেছে তোমার ওষুধ আনতে, জানি না বেঁচে আছে কি মরে গেছে; এখন কি আর নতুন সাদিতে বসা যায়?' খাঁ ছাড়ে না: 'তোমার স্বামী অনেক দিন মারা গেছে'।'

'আমি বলি, 'তার হাড় এনে দেখাও তবে তোমায় বিশ্বাস করব। সে হাড় দেখলে তখন ভেবে দেখব কী জবাব দেব।' আমার এই জবাব শুনেই খাঁ হুকুম দিলে আমার সব গোরু ঘোড়া, আমার সব ধনসম্পদ কেড়ে দিতে। আমাদের এখন সম্বল কেবল এই ফাঁকা ছাউনিটা!'

বৌয়ের সব কথা শুনে তীরন্দাজ ভয়ানক ক্ষেপে উঠল। বললে:

'চলো যাই খাঁয়ের পুরীতে। এই প্রতারণার, এই বেকানুনির শোধ তুলব!'

খাঁয়ের প্রাসাদের কাছাকাছি এসে থামল তীরন্দাজ, লম্বা সেই রেশমী রুমালটা নেড়ে বললে:

'এইখানে এক প্রাসাদ হোক!'

অমনি আকাশ ছোঁয়া এক প্রাসাদ দেখা দিল — এমন জমকালো, এমন বাহারে যে খাঁর পুরীকে তার পাশে মনে হল এক গরিবখানা। বৌকে নিয়ে পুরীর ভেতর ঢুকে তীরন্দাজ বললে:

'খেতে দে, মুর্জা!'

পেট পুরে খাওয়া দাওয়ার পর তীরন্দাজ পুরী থেকে বেরিয়ে এসে তার সোনার দণ্ডের সরু দিকটা দিয়ে মাটিতে বাড়ি মারলে। অমনি পলকের মধ্যে তীর ধনুক নিয়ে দেখা দিতে লাগল যত তীরন্দাজ। প্রাসাদের তোরণের সামনে দাঁড়িয়ে তারা হুকুম চাইলে। তীরন্দাজ বললে:

'যতক্ষণ ঘুম ভেঙে না উঠছি ততক্ষণ কেউ যেন আমার কাছে না আসে!'

সকালে খাঁয়ের কর্মচারীরা দেখে বিরাট এক অপরূপ পুরী। ভেবে পায় না কী ব্যাপার।

বলে, 'এ আবার কী অবাক কান্ড? রাতের মধ্যে কে তুললে এই পুরী — বেহেস্তের বুরখাঁ নাকি জিন, শয়তান?'

ছুটে গিয়ে সবাই খাঁকে বললে। জার্কিন-খাঁ বেরিয়ে এসে তাকিয়ে দেখে পুরীর দিকে, বিস্ময়ে তার মাথা খারাপ হয় আর কি।

বলে, 'এ আবার কী? আমার মনুষ্যজন্মে আমি এমন প্রাসাদ কখনো দেখি নি, কখনো শুনি নি! কে তুললে? কে থাকে? অপূর্ব এই প্রাসাদে কে থাকে গিয়ে দ্যাখো, নিয়ে এসো তাকে আমার কাছে!'

অমনি ছুটল সব খাঁয়ের দূত।

পুরীর কাছে গিয়ে তারা লম্বা চওড়া করাল চেহারার দুই দ্বারীকে শুধোয়:

'কার পুরী এটা? কে থাকে তাতে? তোমরাই বা কে? এলে কোত্থেকে? আসমান থেকে নেমেছ নাকি জমিন ফুঁড়ে উঠেছ? শিগগির বলো!'

গমগমে গলায় দ্বারীরা জিজ্ঞেস করে:

'আমাদের জেরা করতে এসেছ, তোমরাই বা কে?'

'আমরা মহাবল জার্কিন-খাঁয়ের দূত। তাঁর হুকুম সব কিছু জেনে তাঁকে খবর দিতে হবে।'

দ্বারীরা বলে, 'কে আবার এই জার্কিন-খাঁ। তোমাদের খাঁয়ের কথা আমরা কখনো শুনি নি, তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই। আমাদের আছে নিজেদের খাঁ, নিজের পুরীতে নিদ্রা যাচ্ছেন তিনি। জানে বাঁচতে চাইলে এখনি দূর হও!'

ভয় পেয়ে গেল খাঁয়ের দূতেরা। যা শুনলে ছুটে গিয়ে সব জার্কিন-খাঁকে জানালে। জার্কিন-খাঁ তাদের গালমন্দ করতে লাগল।

বলে, 'আমি তোদের দ্বারীর সঙ্গে আলাপ করার জন্যে পাঠাই নি, পাঠিয়েছিলাম তাদের মনিবকে ধরে আনতে!'

এই দুই দূতের কঠোর শাস্তির হুকুম দিয়ে খাঁ ডেকে পাঠালে তার সেরা বীরদের দু'জনকে। বললে:

'এই পুরীর মালিককে ধরে নিয়ে এসো আমার কাছে!'

খাঁয়ের বীরেরা গেল পুরীর কাছে। দরজা ভেঙে ঢোকার ইচ্ছে। কিন্তু দ্বারীরা তাদের ঠেলে সরিয়ে বলে:

'কে তোরা? প্রাণের ভয় থাকলে পালা!'

খাঁয়ের বীরেরা বলে:

'তোদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে আমরা আসি নি। এসেছি এই পুরীর মালিককে ধরে আমাদের খাঁয়ের কাছে নিয়ে যেতে!'

এই বলে বীরেরা জোর করে ঢুকতে গেল পুরীর মধ্যে। দ্বারীরা তাদের ধরে উত্তম-মধ্যম দিলে। বলে:

'তোদের খাঁয়ের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই! তার কথাও শুনতে চাই না আমরা!'

উত্তম-মধ্যম দিয়ে তাড়িয়ে দিলে খাঁয়ের বীরদের।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে, কোঁকাতে কোঁকাতে বীরেরা ফিরে এল জার্কিন-খাঁয়ের কাছে।

'দ্বারীরা আমাদের পুরীতে ঢুকতে দিলে না! ওদের জোরের সঙ্গে আমরা পারলাম না! ওদের আধাআধি জোরও আমাদের নেই!'

জার্কিন-খাঁ তখন তার দরখাঁ উপখাঁদের ডেকে সলাপরামর্শ নিতে লাগল।

'বলো তোমরা কী করা যায়? বোঝা যাচ্ছে, এ এক প্রবল প্রতিপক্ষ।'

দরখাঁরা বলে:

'তার বিরুদ্ধে তাহলে সৈন্য পাঠাতে হয়!'

সৈন্য তলবের হুকুম দিলে জার্কিন-খাঁ।

বলে, 'ঘোড়ায় চাপতে পারে এমন সবাইকে জমায়েত করো! জলদি!'

খাঁয়ের সেনাপতিরা সৈন্য জমায়েত করে নিয়ে এল।

তেত্রিশটা সারি বেঁধে তেত্রিশ বাহিনী সৈন্য নিয়ে জার্কিন-খাঁ ঘেরাও করলে তীরন্দাজের পুরী। হুকুম দিলে হাঁক দিতে:

'আসমানে সূর্য থাকতে থাকতেই বেরিয়ে আয়, দেখব কার জোর!'

সে হাঁক শুনে তীরন্দাজ জানলা খুলে কোমর পর্যন্ত নুয়ে জিজ্ঞেস করলে:

'কে তোমরা? জুটেছ কী উদ্দেশ্যে?'

সৈন্যরা জবাব দিলে:

'আমরা মহাবল জার্কিন-খাঁয়ের সৈন্য!'

তীরন্দাজ বলে:

'আমি জার্কিন-খাঁয়ের শত্রুও নই মিত্রও নই। নিজের ঘরে আমি আছি, শত্রুতা করতে যাই নি। তবে জার্কিন-খাঁ যদি যুদ্ধ চায়, বেশ যুদ্ধ করব। বলুক কী চায় সে!'

'যুদ্ধই হোক!' হাঁক দেয় জার্কিন-খাঁ।

তখন নিজের পুরী থেকে বেরিয়ে এল তীরন্দাজ, সোনার দণ্ডের মোটা মাথাটা দিয়ে বাড়ি মারলে মাটির ওপর। অমনি এসে হাজির যত ঘোড়সওয়ার — গুনে তাদের শেষ করা যায় না, চোখে দেখে অন্ত মেলে না। ঝকঝকে বর্ম সবার গায়ে, সব্বার হাতেই হাতিয়ার। হাতিয়ার তুলে তারা বলে:

'হুকুম করুন!'

তীরন্দাজ বলে, 'এই খাঁয়ের সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করো!'

বেধে গেল যুদ্ধ, শুরু হল লড়াই। সোনার দণ্ডের সরু দিকটা দিয়ে বাড়ি মারে তীরন্দাজ — অমনি হাতে তীর ধনুক নিয়ে দেখা দেয় সংখ্যাহীন সব ধনুর্ধর — ধনুক তুলে তারা বলে:

'কী হুকুম করুন?'

তীরন্দাজ বলে, 'লড়াই করো এই খাঁয়ের সৈন্যদের সঙ্গে!'

অমনি তীরন্দাজেরা গেল ঘোড়সওয়ারদের সাহায্যে। টলে উঠল জার্কিন-খাঁয়ের সৈন্যরা, পিছু হটতে লাগল। তীরন্দাজের সৈন্যরা কিন্তু ছাড়ে না, ধেয়ে যায় তাড়া করে, কচুকাটা করে। লড়াই শুরু হয় সকালে, সন্ধ্যার মধ্যেই লড়ব্যর মতো কেউ আর রইল না। শেষ পর্যন্ত খোদ জার্কিন-খাঁকেই ধরতে যাবে, জার্কিন-খাঁ অমনি ঘোড়া থেকে নেমে প্রাণপণে ছুটতে লাগল তীরন্দাজের পুরীর দিকে। ছোটে আর চ্যাঁচায়:

'বাঁচাও, জান বাঁচাও আমার, মেহেরবানি করো!'

তীরন্দাজ তার সৈন্যদের বললে:

'মেরো না ওকে, জীবন্ত ধরে নিয়ে এসো! কথা কইব!'

জার্কিন-খাঁয়ের হাত পা বেঁধে তাকে তীরন্দাজের সম্মুখে নিয়ে এল তারা। ভয়ের চোটে তীরন্দাজকে চিনতে না পেরে খাঁ লুটিয়ে পড়ল তার পায়ের ওপর, ক্ষমা চায়, প্রাণভিক্ষা করে। তীরন্দাজ তখন হেসে উঠল:

বলে, 'ভয় পেয়ো না, তোমায় মারব না! লড়াইয়ের সাধ হয়েছিল তোমার তাই লড়লাম। এবার তোমায় খাওয়াব। মুর্জা, খেতে দে!'

অমনি খুলে গেল হলদে বুটিদার জাজিম, তার ওপর নানা রকম খানাপিনা। খাঁকে আপ্যায়ন করতে লাগল তীরন্দাজ।

খাঁকে এটা ওটা এগিয়ে দেয় আর শুধোয়:

'শুনেছি তোমার রাজ্যে বাস করে এক বীর তীরন্দাজ। লোকটা কোথায় এখন? ওকে একবার দেখার ইচ্ছে ছিল।'

'নেই ও,' বলে খাঁ।

'কেন, গেছে কোথায়?' জিজ্ঞেস করে তীরন্দাজ।

জার্কিন-খাঁ বলে, 'মারা গেছে।'

'কিন্তু আমরা শুনেছি সে বেঁচে আছে,' বলে তীরন্দাজ।

খাঁ বলে, 'সে গেছে অজানা কোন এক দেশে। ফেরার মেয়াদ অনেক দিন পেরিয়ে গেছে। তাই আমরা ধরে নিয়েছি সে মারা গেছে।'

'কিন্তু অজানা দেশে তাকে পাঠালে কে, কী উদ্দেশ্যে?' জিজ্ঞেস করে তীরন্দাজ।

জার্কিন-খাঁ বলে:

'কেউ ওকে পাঠায় নি, নিজের ইচ্ছেতেই ও গেছে কোন দূর দেশে। কেন গেছে তা আমি জানি না।'

ভারি রাগ হল তীরন্দাজের।

'বলেছিলাম তোমায় মারব না, কিন্তু এমন নির্লজ্জ মিথ্যেবাদীকে কি বাঁচিয়ে রাখা চলে? তীরন্দাজের বৌটিকে দখল করার ইচ্ছে হয়েছিল তোমার, তাই ভান করেছিলে রোগে ধরেছে, তীরন্দাজকে পাঠিয়েছিলে বাঘিনীর দুধ আনতে। পরে তাকে পাঠালে অজানা দেশে, হুকুম করেছিলে এমন জিনিস আনতে হবে যার স্থান নেই, রূপ নেই। ভয়ে একেবারে অন্ধ না হয়ে থাকলে আমার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখো। আমিই সেই তীরন্দাজ... অজানা দেশে গিয়ে আমি সেই জিনিস

নিয়ে এসেছি যার স্থান নেই, রূপ নেই। তাই আমায় মেরে তোমার কুমতলব হাসিল করা আর হল না। এখন ন্যায় মতো তোমায় মেরে ফেলাই উচিত।'

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জার্কিন-খাঁ লুটিয়ে পড়ল তীরন্দাজের পায়ের ওপর, তার সামনে নাকখত দেয়, কাকুতি মিনতি করে যেন প্রাণে তাকে না মারে। খাঁকে পায়ে ঠেলে তীরন্দাজ বলে:

'অনেক দুষ্কার্য করেছ তুমি, কিন্তু প্রাণে মারব না। তবে এ দেশে থাকা তোমার চলবে না। এক্ষুনি দূর হও এখান থেকে, এদেশের কেউ যেন তোমায় আর না দেখে!'

'এই মেহেরবানির জন্যে ধন্যবাদ!' বললে জার্কিন-খাঁ।

নিজের পরিবার পরিজন নিয়ে সে তাড়াতাড়ি চলে গেল এদেশ ছেড়ে। সেই থেকে তাকে আর দেখা যায় নি।

আর বীর তীরন্দাজ তার সেই ছাউনিতেই সুন্দরী বৌ নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করতে লাগল।

মণির পাহাড়

(তুর্কমেনী রূপকথা)



এক গ্রামে ছিল এক বুড়ি বিধবা, তার এক ছেলে — মিরালি। দুঃখে কষ্টে দিন চলে তাদের। লোকেদের জন্যে পশম ঝাড়াই বাছাই, বুনে ধুনে, ধোয়া পাকলা করে রুটি রোজগার করত বুড়ি।

মিরালি যখন বড়ো হল তখন তার মা বললে:

'আমার আর খাটুনির শক্তি নেই বাপ, একটা কাজ দেখে শুনে নে, নিজের খোরপোষ নিজে চালা।'

'বেশ' বলে মিরালি চলে গেল কাজের খোঁজে।

এখানে যায় সেখানে যায়, কোথাও আর কাজ মেলে না। শেষ পর্যন্ত এক বাইয়ের কাছে এসে শুধোয়:

'মজুর লাগবে না তোমার, বাই?'

বাই বলে, 'লাগবে।'

মিরালিকে কাজে নিল বাই।

দিন গেল — বাই কিন্তু কোনো কাজেই লাগালে না মিরালিকে। দ্বিতীয় দিনও গেল — তবু কোনো হুকুম করে না বাই। তৃতীয় দিনও গেল মজুরের কথা যেন বাই ভুলেই গেছে।

ভারি অবাক লাগল মিরালির।

ভাবে, 'তাহলে কিসের জন্যে মজুর নিল আমায়?' বাইয়ের কাছে গিয়ে শুধোয়:

'আমার কি কাজ হবে কিছু?'

বাই বলে, 'হবে। কাল যাবি আমার সঙ্গে।'

পরের দিন বাই একটা ষাঁড় জবাই করে তার ছাল ছাড়াবার হুকুম দিলে। তারপর চারটে বড়ো বড়ো বস্তা আর দুটো উট নিয়ে আসার আদেশ হল। একটা উটের পিঠে চাপানো হল ষাঁড়ের চামড়া আর বস্তাগুলো। দ্বিতীয় উটটার পিঠে চাপল বাই; তারপর রওনা দিলে।

গিয়ে তারা হাজির হল এক দূর পাহাড়ের কাছে। উটগুলোকে থামিয়ে বাই বস্তা আর চামড়া নামাতে বললে মিরালিকে।

হুকুম তামিল করার পর চামড়াটা উলটিয়ে তাতে মিরালিকে শুতে বললে বাই। মিরালি ভেবে পেল না কিসের জন্যে, কিন্তু জিজ্ঞেস করার সাহস হল না, মনিবের যা হুকুম তাই করলে।

চামড়া দিয়ে মিরালিকে জড়িয়ে বেঁধে ছেঁদে বাই নিজে লুকিয়ে রইল পাথরের আড়ালে।

কিছুক্ষণ পরে উড়ে এল দুটো শিকারী পাখি, টাটকা ষাঁড়ের চামড়ায় ছোঁ মেরে তাকে উঠিয়ে নিয়ে গেল একেবারে সেই অগম পাহাড়ের চুড়োয়।

সেখানে তারা ঠোকর মেরে নখ বিঁধিয়ে টানা হেঁচড়া করতে করতে ছিঁড়ে গেল চামড়াটা। চামড়ার ভেতরে মানুষ দেখে তারা ভয় পেয়ে ঝটপট উড়ে গেল, ষাঁড়ের ছালটাও নিয়ে গেল সঙ্গে করে।

মিরালি উঠে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকায়।

নিচ থেকে তাকে দেখে বাই চে'চাল:

'দাঁড়িয়ে আছিস যে! তোর পায়ের কাছে যে সব মণিমাণিক্য আছে সব ছ্ুঁড়ে ফ্যাল আমার দিকে!'

মিরালি তাকিয়ে দেখে সত্যিই। চারিদিকে নানা রকমের মণিমাণিক্য: চুনি পান্না, হীরে জহরৎ, নীলা পলা — যেমন বড়ো বড়ো তেমনি সুন্দর, ঝকঝক করছে রোদে।

মণিমাণিক্য জড়ো করে মিরালি ছুড়ে ছুড়ে ফেলতে লাগল নিচে। বাই তা কুড়িয়ে কুড়িয়ে বস্তায় ভরে।

মণিমাণিক্য ছুড়ে ফেলতে ফেলতে হঠাৎ ভয় হল মিরালির।

বাইকে ডেকে শুধোয়, 'কিন্তু এখান থেকে নামব কেমন করে, হুজুর?'

'এখন তো ছুড়ে দে, পরে বলব কী করে নামতে হবে,' বলে বাই।

সে কথা বিশ্বাস করে মিরালি ফের মণিমাণিক্য ছুড়ে ফেলতে লাগল।

সবক'টা বস্তা যখন টায়টোয়ে ভরে উঠল তখন বাই তা সব উটের পিঠে চাপিয়ে হেসে বললে:

'নিজেই এবার বুঝবি বাপধন আমার, কী কাজ আমি দিই আমার মজুরদের! খ্ুঁজে দ্যাখ পাহাড়ে তাদের কত হাড়গোড়!'

এই বলে চলে গেল বাই।

পাহাড়ের ওপর একলা পড়ে রইল মিরালি। নামার মতো একটা জায়গা খোঁজার চেষ্টা করলে ও কিন্তু চারিদিকে কেবল খাড়াই পাড় আর অতল খাদ, চারিদিকে কেবল হাড়গোড় ছড়ানো। সে হাড়গোড় তারই মতো বাইয়ের অন্যান্য মজুরের...

ভারি ভয় হল মিরালির।

হঠাৎ মাথার ওপর একটা আওয়াজ শুনলে মিরালি। তাকিয়ে দেখতে না দেখতেই তার ওপর নেমে এল এক মস্ত ঈগল; ছোঁ মেরে ছি'ড়ে খেতে যাবে, মিরালি কিন্তু হতভম্ব না হয়ে ঝট করে তার পা চেপে ধরল দুই হাতে। ঈগল ডাক ছেড়ে উঠে গেল আকাশে, এদিকে ওড়ে সেদিকে ওড়ে, পা থেকে ঝেড়ে

ফেলার চেষ্টা করে মিরালিকে কিন্তু পারে না। শেষ পর্যন্ত হয়রান হয়ে ঈগল নেমে এল মাটিতে। মিরালি তখন ছেড়ে দিলে ঈগলকে, ঈগলও উড়ে গিয়ে বাঁচল।

এই ভাবেই প্রাণ বাঁচল মিরালির।

ফের মজুর খাটার জন্যে সে এল বাজারে। দেখে কি — তার আগে মনিব বাই আসছে।

'মজুর লাগবে না তোমার?' জিজ্ঞেস করে মিরালি।

বাই স্বপ্নেও ভাবে নি তার মজুর বেঁচে আছে। তেমন ঘটনা কখনো ঘটে নি। মিরালিকে তাই অপর লোক ভেবে বাই তাকে কাজে নিয়ে ঘরে এল।

কিছুদিন পরে বাই তার মজুরকে হুকুম করলে ষাঁড় জবাই করে তার ছাল ছাড়াতে। পরে আদেশ হল দুটো উট আর চারটে বস্তা আনার।

আগের সেই পাহাড়ের কাছে গেল ওরা।

আগের মতোই বাই মিরালিকে বললে চামড়ার ওপর শুয়ে জড়িয়ে নিতে।

মিরালি বললে, 'কী করে করব দেখিয়ে দাও, আমি ঠিক বুঝছি না!'

'না বোঝার কী আছে? এই ভাবে শুবি!' এই বলে বাই চামড়াটাকে উলটিয়ে তাতে শুল।

মিরালিও অমনি তাকে চামড়ায় জড়িয়ে শক্ত করে বেঁধে ছেঁদে সরে গেল।

বাই চেঁচায়, 'বাপধন আমার, এ কী তুই করছিস?'

কিন্তু ততক্ষণে উড়ে এসেছে দুই শিকারী পাখি, চামড়ার বোঝাটা তারা ছোঁ মেরে উড়িয়ে নিয়ে গেল পাহাড়ের চুড়োয়। সেখানে ঠোঁটে নখে টানা হেঁচড়া করতেই ছাল ছিঁড়ে গেল। মানুষ দেখে ভয় পেয়ে উড়ে গলে তারা। বাই উঠে দাঁড়াল পায়ের ওপর।

'এই বাই, সময় নষ্ট কোরো না, আমি যা করেছিলাম, তেমনি করে মণিমাণিক্যগুলো ছুড়ে ছুড়ে ফ্যালো!' নিচ থেকে চেঁচিয়ে বললে মিরালি।

তখন বাই চিনতে পারল তার মজুরকে। ভয়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতে সে বললে:

'সেবার তুই পাহাড় থেকে নেমেছিলি কী করে, শিগগির বল!'

'বেশি করে আগে মণিমাণিক্য ছুঁড়ে দাও দিকি, তারপর বলে দেব কী করে নামতে হয়!' বললে মিরালি।

মণিমাণিক্য ছুঁড়ে দিতে লাগল বাই, আর মিরালি তা কুড়িয়ে কুড়িয়ে জড়ো করে। চার বস্তা ভরে গেলে তা উটের পিঠে চাপিয়ে মিরালি বললে:

'এই বাই, চারিদিকে তাকিয়ে দ্যাখ, তুই যাদের মেরেছিস তাদের হাড়গোড়! তুই বরং ওদের কাছেই জিজ্ঞেস করে নে কী করে নামতে হবে, আমি বাড়ি চললাম।'

উট হাঁকিয়ে মিরালি চলে গেল তার মায়ের কাছে।

আর পাহাড়ের ওপর ছুটোছুটি করলে বাই — গালমন্দ, হুমকি হামকি, কাকুতি মিনতি করতে লাগল, কিন্তু কেই বা তা শোনে।

লোভী কাজী

(তাজিকী কাহিনী)





সত্যি হোক, মিথ্যে হোক — এক যে ছিল গরিব। যতই খাটে গরিবি আর দূর হয় না। ঠিক করলে দূর শহরে গিয়ে রোজগার করবে। তাই আত্মীয় স্বজনের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত গিয়ে হাজির হল। বাড়ি বাড়ি যায়, কাজ খোঁজে। কোনো কাজেই তার আপত্তি নেই, কখনো বলে না, 'এ কাজ কঠিন, এ কাজ পারব না।' যে কাজই বলা হয়, তাই সে আগ্রহ করে নেয়, বিবেক মতো পালন করে।

তার রোজগার যা হত তা যেত কেবল খেতেই। যা বাকি থাকত তা এক থলিতে ভরে লুকিয়ে রেখে ভাবত: 'আরো কিছু দিন খাটি, আর একটু বেশি টাকা জমলেই বাড়ি ফিরব।'

এমনি করেই কয়েক বছর খাটলে ও, হাড়ভাঙা মেহনতে জমালে পুরো হাজার তঙ্কা। গরিবের পক্ষে সে তো আর কম নয়!

তাই ভাবনা শুরু হল গরিবটির, দুশ্চিন্তা শুরু হল: 'একটা বিপদ আপদ হয়ে যদি টাকাটা আমার মাঠে মারা যায়। নিজের কাছে রাখলে হারিয়ে বসতে পারি। কেউ বলে দেবে, ডাকু মাকু এসে আমায় খুন করে লুট করবে। যেখানে থাকি সেখানে যদি লুকিয়ে রাখি, তাহলেও তা উধাও হতে পারে। কেউ হয়ত দেখে ফেলবে — দুনিয়ায় কুলোক তো কিছু কম নেই! টাকাটি আমার যাবে, ঘরে ফিরব খালি হাতে...'

এই সব ভাবে গরিব, বুঝে পায় না, কী উপায়, কী করা যায়। শেষ পর্যন্ত সে মনে মনে ঠিক করলে:

'হাজার তঙ্কা আমি বরং কাজীর কাছে রেখে দেব। লোকে বলে, মানুষটা ইমানদার, সৎ। আমার টাকাটা ওর কাছে ঠিকই থাকবে। দেশে ফেরার সময় কাজীর কাছ থেকে নিয়ে নেব।'

এই সব ভেবে এই উদ্দেশ্যে সে কাজীর কাছে এল। কাজী তাকে ডেকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলে:

'কী চাই তোর?'

'হুজুর, আমি আমার টাকাটা আপনার কাছে গচ্ছিৎ রাখতে চাই। এর চেয়ে পাকা জায়গা আমার আর নেই। বেঁচে বর্তে যতদিন এ শহরে কাজ করব, ততদিন টাকাটা আপনি গচ্ছিৎ রাখুন।'

গরিবটার টাকার থলিটা নিয়ে কাজী ভারিক্কি চালে বললে:

'সানন্দেই তোর বাঞ্ছা পূরণ করব! ঠিকই বলেছিস — টাকা গচ্ছিৎ রাখার মতো পাকা জায়গা এর চেয়ে আর নেই।'

গরিব চলে গেল। কাজী টাকাটা গুনে গেঁথে লুকিয়ে রাখলে নিজের সিন্দুকে।

কিছুদিন পরে গরিব দেশে ফেরার আয়োজন করলে। কাজীর কাছে এসে বললে:

'হুজুর, এবার আমার টাকাটা ফেরত দিন, কাল আমি এ শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছি।'

গরিব লোকটির দিকে চেয়ে কাজী বললে:

'কোন টাকার কথা তুই বলছিস?'

'সেই যে হাজার তঙ্কা আমি আপনার কাছে গচ্ছিৎ রেখেছিলাম।'

'বোঝা যাচ্ছে, তোর মাথা খারাপ হয়েছে!' চেঁচিয়ে উঠল কাজী, 'টাকা আবার তুই আমায় দিলি কবে? বেড়ে বলেছিস বটে, হাজার তঙ্কা! তোর সাত পুরুষে কেউ কখনো শ' তঙ্কা দেখেছে! হাজার তঙ্কা তুই পেলি কোত্থেকে?'

গরিব বেচারি কাজীকে মনে করিয়ে দিলে কবে সে টাকাটা এনেছিল, কী বলেছিল। কাজী সে কথা কানেই তোলে না। মেঝেতে পা ঠুকে সে হাঁক দিলে তার নোকরদের।

'পিটুনি দে এই জোচ্চোরটাকে! ঘাড় ধরে বার করে দে! লাথি মার ওর পিঠে!'

কাজীর নোকরেরা গরিবটাকে মেরে ধরে খেদিয়ে দিলে।

কাঁদতে কাঁদতে বিলাপ করতে করতে গরিবটা রাস্তা দিয়ে হাঁটে।

'আমার এত মেহনত বৃথা গেল! জলে গেল আমার টাকা!' দুঃখে হায় হায় করে সে, 'লোভী কাজী সব আত্মসাৎ করে নিলে!'

সেই সময় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল একটি মেয়ে। গরিব লোকটার বিলাপ শুনে সে তাকে ভর্ৎসনা করে বললে:

'ছি ভাই, হয়েছে কী? চলমা পরা দাড়িওয়ালা সোমত্ত পুরুষ — বালবাচ্চার মতো অমন কাঁদছ কেন?'

গরিব লোকটি সখেদে বললে:

'কী আর বলি বোন, কী করে আমায় ঠকিয়েছে তা যদি জানতে! কত বছর ধরে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেছি — পেট পুরে খাই নি, রাতভরে ঘুমোই নি, জবর মেহনত করে হাজার তঙ্কা জমিয়েছিলাম, তা সব জলে গেল। সে কথা জানলে তুমি আর আমায় ছি ছি করতে না!..'

'কী হয়েছিল তা বলো তো দেখি আমায়,' বললে মেয়েটি।

গরিবটি তাকে জানালে কী ভাবে টাকাটা সে খুইয়েছে।

সখেদে সে শেষ করলে, 'লোকে আবার বলে কিনা এ কাজী ইমানদার, সৎ লোক!'

দরদ দিয়ে লোকটার কাহিনী সব শুনেটুনে মেয়েটি বললে:

'দুঃখু কোরো না, এখনো সব যায় নি। এসো আমার সঙ্গে, কিছু একটা উপায় করা যাবে।'

মেয়েটি ঘরে এসে একটা মস্ত পেঁটরা নিয়ে তার ছোট ছেলেটিকে বললে:

'আমি এই লোকটির সঙ্গে কাজীর কাছে চললাম। তুই আসবি আমাদের পিছু পিছু, কিন্তু খুব কাছাকাছি নয়। দেখিস যেন কেউ তোকে নজর না করে। লুকিয়ে অপেক্ষা করবি। কাজী এ লোকটাকে টাকা গুনে দিয়ে যেই আমার এই পেঁটরা নেবার জন্যে হাত বাড়াবে, অমনি ছুটে এসে বলবি, 'মাল বোঝাই উট নিয়ে বাবা ফিরে এসেছে!' '

ছেলেটি বললে:

'ঠিক আছে, তাই করব!'

পেঁটরা মাথায় করে মেয়েটি গরিব লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে চলল কাজীর বাড়ি। আর একটু দূরে তাদের পেছু পেছু চলল ছেলেটি।

বাড়ির সামনে এসে মেয়েটি বললে:

'আমি আগে ঢুকব, তুমি এসো একটু পরে।'

মেয়েটি কাজীর ঘরে ঢুকতেই কাজী তার দিকে আর তার মস্ত পেঁটরাটার দিকে চেয়ে বললে:

'কী কাজে এসেছ বোন, বলো?'

মেয়েটি বললে:

'হুজুর আমায় হয়ত জানেন। আমি হলাম ধনী সওদাগর রহিমের বৌ। স্বামী আমার কারাভান নিয়ে দূর দেশে গেছে, কবে ফিরবে জানা নেই। কয়েক রাত ধরে তাই আমি নিশ্চিন্তে ঘুমতে পারি না। ঘরের চারপাশে চোর ঘোরাঘুরি করে। মনে হয় আমাদের টাকাকড়ি নেবার তালে আছে। আমি তাই আমাদের টাকাকড়ি, ধনসম্পদ — সোনা রুপো মণিমাণিক্য সব জড়ো করে এই পেঁটরাটায় ভরেছি। এত ভারি যে বহু কষ্টে বয়ে আনতে হয়েছে। আপনি একটু মেহেরবানি

করে এটা গচ্ছিৎ রাখুন। আমার স্বামী ফিরে এলে এটা সে আপনার কাছ থেকে ফেরত নিয়ে যাবে।'

কাজী পেঁটরাটা একটু তুলে দেখল কেমন ভারি। লোভে ওর হাত তখন কাঁপছে। ভাবলে:

'এ পেঁটরায় অন্তত চল্লিশ কি পঞ্চাশ হাজার তঙ্কা হবে। বোঝা যায় হীরে জহরৎও কম নয়। শুনেছি তো রহিম সওদাগরের ধনদৌলৎ নাকি অনেক...'

কাজী বললে, 'তা বেশ, ভালো কথা বোন, তোমার দৌলৎ আমি গচ্ছিৎ রাখব, ভাবনা নেই। কিছু খোয়া যাবে না, সব পুরো ফেরৎ দেব, একটি তঙ্কাও লোকসান যাবে না!'

মেয়েটি কিন্তু কাজীর হাত থেকে তার পেঁটরাটা নিয়ে বললে:

'সবই ফেরৎ দেবেন সত্যি তো?'

'কোনো সন্দেহ কোরো না বোন, আমার ইমানের কথা, সততার কথা জানে এ শহরের সবাই!'

ঠিক এই সময় কাজীর ঘরে ঢুকল সেই গরিব লোকটি।

ওকে দেখেই ভারি খুশি হয়ে উঠল কাজী। ভাবলে:

'খোদা লোকটাকে পাঠিয়েছে! মেয়েটির কাছে আমার সততার প্রমাণ দেবার মতো ভালো উপলক্ষ আর কীই বা আছে! হাজার তঙ্কা লোকটাকে দিয়ে দেব, তার বদলে নেওয়া যাবে এই হীরে জহরৎ ভরা পেঁটরাটা। হুঁ-হুঁ! সেটা মন্দ নয়!'

মেয়েটিকে কাজী বললে:

'তোমায় ফের বলি বোন — কাজীর ঘর হল সবচেয়ে নিরাপদ, সবচেয়ে পাকা জায়গা। নিজের ঘরে তোমার পেঁটরা যা থাকবে, তার চেয়ে এখানেই থাকবে ভালো। যে কোনো সময়, তোমার স্বামীই আসুক, বা তোমার নিজেরই ইচ্ছে হোক, এলেই তোমার এই দৌলৎ তুমি ষোলো আনা ফেরৎ পাবে।'

কাজীর যত চাকরবাকর, বৈঠকে যারা হাজির ছিল সবাই মাথা নাড়লে: সত্যি কথাই বলেছে কাজী, তার প্রতিটি কথাই বিশ্বাস করা চলে।

এই সময় যেন হঠাৎ চোখ পড়ে গেছে গরিব লোকটার ওপর এমনি ভাব করে কাজী চেঁচিয়ে উঠল:

16-406

'এই তো, এই গরিব লোকটি তার সব সঞ্চয় — হাজার তঙ্কা গচ্ছিৎ রেখেছিল আমার কাছে! আজ সকালে সে আমার কাছে এসে টাকাটা চায়। কিন্তু আমি চিনতে পারছি না, হয়ত বা ঠগ, জোচ্চোর। ওকে চেনে এমন কাউকে ও সাক্ষী আনতে পারলে আমি এক্ষুনি সে টাকা ওকে দিয়ে দেব!'

তাই শুনে মেয়েটি বললে:

'হুজুর, এ লোকটাকে আমরা প্রায় বছর দুই থেকে জানি। ও আমাদের শহরে এসে দিন মজুরি করছে। আমাদের ওখানেও কাজ করেছে। হাতে কড়া ফেলে মেহনত করে ও টাকাটা রোজগার করেছে, এ আপনি বিশ্বাস করতে পারেন!'

অতি মোলায়েম হেসে কাজী বললে:

'সে কী, লোকটা তাহলে তোমার চেনা? দ্যাখো দিকি! ওহে ভায়া, এসে তাহলে তোমার হাজার তঙ্কা নিয়ে যাও! জলদি!'

নিজের মস্ত সিন্দুক খুলে কাজী হাজার তঙ্কা গুনে গুনে দরাজ ভাব করে দিয়ে দিলে। তড়বড় করে বললে:

'দেখলে তো বোন, পরের টাকা আমি কী ভাবে রাখি, মালিককে তা ফেরত দিই কিনা। পেঁটরাটা তোমার এখানেই গচ্ছিৎ রাখো, নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি যাও!'

পেঁটরাটা নেবার জন্যে হাত বাড়ালে কাজী। ঠিক সেই সময় রাস্তা থেকে ছুটে এসে ছেলেটি, বললে:

'শিগগির বাড়ি চলো মা! উট বোঝাই মাল নিয়ে বাবা ফিরে এসেছে, তোমার জন্যে বসে আছে!'

মেয়েটি হেসে বললে, 'তা আমার স্বামী যখন ফিরেই এসেছে তখন আর চোরের ভয় নেই! ইমানদার কাজীর সাহায্য ছাড়াই সে আমাদের ধনদৌলৎ রাখতে পারবে!'

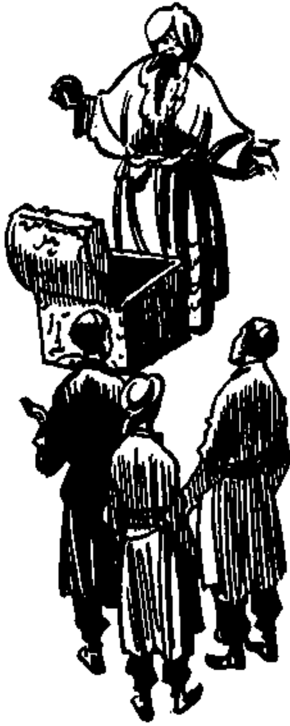
এই বলে মেয়েটি তার পেঁটরাটা মাথায় নিয়ে গরিব লোকটির সঙ্গে বেরিয়ে এল কাজীর ঘর থেকে।

বললে, 'কখনো হতাশ হতে নেই ভাই। এমন জোচ্চোর দুনিয়ায় নেই, যার জোচ্চুরি চিরকালই খাটবে। এবার দেশে ফিরে যাও, অনেক কাল বিদেশে বিভুঁইয়ে কাটিয়েছ, এবার গিয়ে বিশ্রাম নাও, মেহনতের কড়ি ভোগ করো!'

বিদায় নিয়ে যে যার পথে চলে গেল তারা।

আর একলা ঘরে কাজী তখন নিজের ওপরেই খেপে আগুন। নিজের দাড়ি নিজে ছেঁড়ে, মেজের ওপর লাথি মারে, কী করবে ভেবে পায় না।

হায় হায় করে সে বলে, 'কী নসিব! কী লোকসান! কী আফসোস! জাহান্নমে যাক ঐ রহিম সওদাগর! আর ঘণ্টা খানেক দেরি করে আসতে পারল না? কেবল একটি ঘণ্টা! তাহলে আর দেখতে হত না! হীরে জহরৎ ভরা এ পেঁটরা তাহলে চিরকাল আমারই থাকত! ফেঁপে উঠত আমার দৌলৎ! কানায় কানায় ভরে উঠত আমার মস্ত সিন্দুক! কী আফসোস! কী আফসোস!'



বিচক্ষণ ভাই

(উজবেক কাহিনী)

এক গরিব, তার তিন ছেলে। ছেলেদের সে প্রায়ই বলত:

'শোন বলি, আমাদের গোরু ভেড়া নেই, সোনা রুপো নেই, কোন সম্পত্তি নেই। তাই অন্য এক দৌলৎ জমাও: চেষ্টা করো বেশি করে জানতে, বেশি করে বুঝতে। সব জিনিসে নজর দেবে। গোরু ঘোড়া না থাক, আক্কেল যেন থাকে, সোনা রুপো না থাক, বুদ্ধি যেন থাকে। এ দৌলৎ থাকলে কখনো অকূলে পড়বে না, কারো চেয়ে খারাপ দিন কাটবে না।'

কত দিন যায় — বুড়ো মারা গেল। তিন ভাই জড়ো হয়ে সলাপরামর্শ করে ঠিক করলে:

'এখানে আমাদের করার কিছু নেই, দীন দুনিয়া ঘুরে দেখি। বিদেশে বিভুঁইয়ে রাখালি করব। ক্ষেতমজুরি করব, খিদেয় মরব না!'

ঠিকঠাক করে বেরিয়ে পড়ল তারা।

পাড়ি দিল তারা বিজন উপত্যকা, পার হল উঁচু উঁচু পাহাড়, হাঁটল অনেক দিন ধরে — চল্লিশ দিন!

সঙ্গে যা ছিল সব খেয়ে শেষ করেছে, খুব ক্লান্ত, ওদিকে পথেরও যেন শেষ নেই। কিছুটা জিরিয়ে নিয়ে ফের এগিয়ে চলল তিন ভাই।

শেষ পর্যন্ত চোখে পড়ল গাছপালা, গম্বুজমিনার, ঘরবাড়ি — কোন একটা বড়ো শহর।

খুশি হয়ে উঠল ভাইয়েরা, পা চালালে তাড়াতাড়ি করে।

বলে, 'পেছনে পড়ে কু, সামনে মেলে সু!'

শহরের কাছে এসে বড়ো ভাই হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। মাটির দিকে নজর করে বললে:

'কিছু আগে এখান দিয়ে গেছে এক মস্ত উট।'

আরো একটু এগুলো ওরা। মেজো ভাই রাস্তার দু'পাশে চেয়ে বললে:

'উটটা ছিল কানা।'

আরো একটু এগুতে ছোটো ভাই বলে:

'এ উটে ছিল এক ছেলে কোলে জেনানা।'

'ঠিক বলেছিস!' বললে বড়ো ভাই মেজো ভাই।

তিন ভাই আরো এগিয়ে চলল। কিছুক্ষণ পরে এক ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে দেখা। বড়ো ভাই তার দিকে তাকিয়ে বললে:

'হারানো জিনিস খুঁজছ তো, ঘোড়সওয়ার?'

ঘোড়া থামালে সওয়ার।

বলে, 'হারানো জিনিসই খুঁজছি।'

'উট হারিয়েছে তো?' জিজ্ঞেস করে বড়ো ভাই।

'উটই বটে,' বলে সওয়ার।

'মস্ত বড়ো উট?'

'মস্ত বড়ো।'

'তোমার উটের বাঁ চোখ কানা?' জিজ্ঞেস করে মেজো ভাই।

'হ্যাঁ, তার বাঁ চোখ কানা।'

'আর উটের ওপর জেনানা, কোলে বাচ্চা?' জিজ্ঞেস করে ছোটো ভাই।

ঘোড়সওয়ার সন্দেহভরে তিন ভাইয়ের দিকে চেয়ে বলে:

'তার মানে, আমার উটটা তোমাদের কাছে! কোথায় রেখেছ বলো!'

'আমরা তোমার উট চোখেও দেখি নি!' বললে তিন ভাই।

'না দেখে থাকলে এসব কথা জানলে কোত্থেকে?' জিজ্ঞেস করলে ঘোড়সওয়ার।

'আমরা নজর রেখে চলি, অনুমানে ধরি। জলদি ওই দিকে গিয়ে খোঁজো তোমার উট,' বললে তিন ভাই।

উটের মালিক বলে, 'উহুঁ, ওদিকে যাচ্ছি না! আমার উট তোমাদের কাছে, শিগগির ফেরত দাও!'

'আমরা যে তোমার উট চোখেও দেখি নি!' বললে ভাইয়েরা।

কিন্তু ঘোড়সওয়ার সে সব কথা কানেই তোলে না। কোমরবন্ধ থেকে তরোয়াল খুলে হাঁকাতে হাঁকাতে তিন ভাইকে হুকুম দিলে আগে আগে যেতে। এই ভাবেই তাদের তাড়া দিয়ে সে নিয়ে এল সে দেশের বাদশার প্রাসাদে।

প্রহরীদের হাতে তিন ভাইকে সঁপে দিয়ে সে বাদশার কাছে গিয়ে বললে:

'আমি আমার গোরু ঘোড়ার পাল নিয়ে পাহাড়ে চরাতে যাই, আমার ছোটো ছেলেকে নিয়ে বৌ আসছিল এক মস্ত কানা উটে চেপে। আসতে আসতে সে পেছিয়ে পড়ে পথ ভুলে কোথায় হারিয়ে গেছে। আমি খুঁজতে গিয়ে দেখি তিন পথিক। এরাই আমার উট নিয়েছে, ছেলে বৌকেও খুন করেছে নিশ্চয়!'

বাদশা তার কথা শুনে জিজ্ঞেস করলে:

'একথা ভাবার কারণ?'

'পথিকেরা নিজেরাই বললে যে উটটা মস্ত বড়ো, বাঁ চোখ কানা, তাতে এক বাচ্চা আর জেনানা।'

বাদশা ভেবেচিন্তে বললে:

'তুই কিছু না বলতেই ওরা যদি তোর উটের এ সব লক্ষণ বলে দিয়ে থাকে, তাহলে উট ওদের কাছেই। চোরদের নিয়ে আয় এখানে!'

উটের মালিক বেরিয়ে গিয়ে নিয়ে এল তিন ভাইকে।

বাদশা হুঙ্কার দিয়ে বললে, 'এই চোরেরা! জবাব দে, কী করেছিস এই লোকটার উট নিয়ে?'

ভাইয়েরা বললে, 'আমরা চোর নই, জাহাঁপনা, লোকটার উট কখনো চোখেও দেখি নি।'

বাদশা বললে:

'উটের মালিক কিছু জিজ্ঞেস না করতেই তোরা উটের সব লক্ষণ বলেছিলি। এখন আপত্তি করলে কী হবে?'

ভাইয়েরা বললে, 'জাহাঁপনা, এতে অবাক হবার কিছু নেই! ছোটো থেকেই আমাদের নজর রেখে চলা অভ্যেস। নজর দিয়ে দেখে মাথা খাটাতে শিখেছি আমরা। তাই উট চোখে না দেখলেও তার লক্ষণগুলো সব ধরতে পেরেছি।'

বাদশা হেসে জিজ্ঞেস করলে:

'কখনো না দেখলেও তার খুঁটিনাটি কি আর অমন করে জানা সম্ভব?'

ভাইয়েরা বললে, 'সম্ভব।'

'বেশ, সত্যি বলছিস কি মিথ্যা বলছিস যাচাই করব!'

বাদশা তার উজিরকে ডেকে কানে কানে কী বললে।

উজির তক্ষুনি প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গিয়ে ফিরে এল দুই চাকর নিয়ে, বাঁকে করে তারা বয়ে আনছিল এক মস্ত সিন্দুক। দরজার সামনে বাদশার চোখের সামনে তারা সন্তর্পণে সিন্দুকটাকে নামিয়ে রেখে সরে গেল। ভাইয়েরা দূর থেকে নজর করে দেখলে কোথা থেকে সিন্দুকটা নিয়ে এল, চাকরেরা কী ভাবে বইছিল, কী ভাবে মেজের ওপর তা নামালে।

বাদশা বললে, 'ওহে চোরেরা! বল তো দেখি কী আছে সিন্দুকে!'

বড়ো ভাই বললে:

'জাহাঁপনা, আমরা তো আগেই বলেছি আমরা চোর নই। এ সিন্দুকে আছে ছোটো ছোটো গোল গোল কোনো জিনিস।'

'সে জিনিস ডালিম,' বললে মেজো ভাই।

'এখনো তা বিশেষ পাকে নি,' বললে ছোটো ভাই।

বাদশা হুকুম দিলে:

'সিন্দুক নিয়ে আয় এখানে!'

চাকরেরা সিন্দুক নিয়ে এল বাদশার কাছে। ডালা খোলার হুকুম দিলে বাদশা। সিন্দুকের মধ্যে তাকিয়ে দেখলে: সত্যিই মস্ত সিন্দুকটায় কেবল না-পাকা ডালিম। অবাক হয়ে বাদশা ডালিম নিয়ে সভার সবাইকে দেখালে। তারপর হারানো উটের মালিকের উদ্দেশে বললে:

'উহুঁ, এ লোকগুলো চোর নয়! সত্যিই বুদ্ধি আছে এদের। উটের খোঁজ তোর করতে হবে অন্যখানে!'

বাদশার সঙ্গে যারা ছিল তারা সবাই এই তিন ভাইয়ের পর্যবেক্ষণ আর অনুমান শক্তি দেখে অবাক মানল। সবচেয়ে অবাক হল স্বয়ং বাদশা। নানা রকম খানাপিনার হুকুম করে সে ভাইয়েদের আপ্যায়ন করলে।

বললে, 'তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো নালিশ নেই। যেখানে খুশি যেতে পারো। কিন্তু তার আগে বুঝিয়ে বলো দেখি, কী করে বুঝলে ঐ লোকটার উট হারিয়েছে, কী করেই বা সে উটের সব লক্ষণ টের পেলে?'

বড়ো ভাই বললে:

'ধুলোর ওপর বড়ো বড়ো পায়ের ছাপ দেখে বুঝলাম আমাদের আগে আগে সেখান দিয়ে গেছে এক বড়ো মতো উট, তাই এই যে লোকটা চারদিকে তাকাতে তাকাতে এসে আমাদের সঙ্গ ধরল সে নিশ্চয় উটটাই খুঁজছে বলে আন্দাজ করলাম।'

বাদশা বললে, 'এটা মন্দ বলো নি। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কে বলেছিলে যে উটের বাঁ চোখটা কানা?'

মেজো ভাই উঠে বললে:

'আমি, জাহাঁপনা!'

'উটের বাঁ চোখ কানা তা জানলে কী করে? রাস্তায় তো তার ছাপ থাকে না!'

'এ আন্দাজ আমি করি কারণ রাস্তার ডান দিকের সব ঘাস খাওয়া, কিন্তু বাঁ দিকের একটি ঘাসও কেউ ছোঁয় নি,' বললে মেজো ভাই।

'এটাও মন্দ বলো নি,' বললে বাদশা। 'আর তোমাদের মধ্যে কে ধরেছিল যে উটের ওপর ছিল এক জেনানা আর তার ছেলে?'

'আমি ধরেছিলাম, জাহাঁপনা!' বললে ছোটো ভাই, 'আমার নজরে পড়েছিল যে উটটা এক জায়গায় হাঁটু গেড়ে বসেছিল, তার পাশে বালুর ওপর ছিল মেয়েলী জুতোর হালকা দাগ। সেই সঙ্গে ছোটো ছোটো আরো কিছু পায়ের দাগ দেখে বুঝেছিলাম জেনানার সঙ্গে একটি বাচ্চাও আছে।'

বাদশা বললে:

'খুবই সত্যি কথা! কিন্তু সিন্দুকে কেবল না-পাকা ডালিম সেটা ধরলে কী করে? এ আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না!'

বড়ো ভাই বললে, 'সিন্দুক বয়ে এনেছিল দু'জন চাকর, কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছিল সিন্দুক মোটেই ভারি নয়। মেজের ওপর সিন্দুক নামাবার সময় কানে এল এক পাশ থেকে অন্য পাশে গোল গোল কিছু জিনিস গড়িয়ে আসার শব্দ।'

মেজো ভাই বললে:

'আমি ভেবে দেখলাম সিন্দুকটা আনা হয়েছে বাগান থেকে। তার ভেতরে বিশেষ বড়ো নয় এই রকম গোল গোল কিছু জিনিস — তার মানে জিনিসটা ডালিম, কেননা আপনার প্রাসাদের চারপাশে তো ডালিমেরই গাছ।'

'ঠিক বলেছ!' বললে বাদশা।

তারপর ছোটো ভাইয়ের দিকে ফিরে বাদশা বললে:

'কিন্তু ডালিম যে পাকা নয় তা জানলে কী করে?'

ছোটো ভাই বললে, 'বছরের এ সময় ডালিম তো পাকে না। জাহাঁপনা নিজেই তা স্বচক্ষে দেখতে পারেন!'

খোলা জানলা দিয়ে সে দেখালে বাদশাকে।

জানলা দিয়ে নিজের বাগিচার দিকে তাকিয়ে বাদশার চোখে পড়ল ডালিমের গাছ, তাতে কাঁচা কাঁচা ফল।

তিন ভাইয়ের নজর আর বিবেচনা দেখে বাদশা বললে:

'ধনদৌলতে বড়ো না হলে কী হবে, বুদ্ধিতে তোমরা বড়ো!'

কে বড়ো ?

(কিরগিজ কাহিনী)



সে অনেকদিন আগের কথা। এক গ্রামে ছিল তিন সহোদর ভাই। সম্পত্তি বলতে তাদের ছিল কেবল একটি চকরা-বকরা ষাঁড়। একদিন তিন ভাই ঠিক করলে ভাগাভাগি করে পৃথক হবে। কিন্তু একটা ষাঁড় তিন ভাইয়ের মধ্যে ভাগ করা যায় কী করে? ভাবলে বেচবে, কিন্তু পাড়া পড়শীদের মধ্যে এমন ধনী কাউকে পাওয়া গেল না যে ষাঁড়টা কিনবে। ভাবলে, ষাঁড়টাকে মেরে, মাংস ভাগাভাগি করে নেবে। কিন্তু ঘরের ষাঁড় মারতে মায়া হল। একলা কারো ভাগে ষাঁড়টা ছেড়ে দিতেও মন চাইল না।

তাই ঠিক করলে জ্ঞানী বিচারকের উপদেশ নেবে।

তিন ভাই বলাবলি করলে, 'তিনি যা বলবেন, তাই আমরা মেনে নেব।'

তিন ভাই তাই ষাঁড়টি নিয়ে চলল বিচারকের কাছে। বড়ো ভাই রইল ষাঁড়ের মুণ্ডুটার কাছে, মেজো ভাই ষাঁড়ের পেটের কাছে, আর ছোটো ভাই তার লেজের কাছে।

ভোর বেলায় এক ঘোড়সওয়ার এসে তাদের সঙ্গ ধরল। ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে সে জিজ্ঞেস করলে:

'কোথায় নিয়ে চলেছ এই ষাঁড়টাকে?'

ব্যাপার কী তা সব সবিস্তারে জানিয়ে ছোটো ভাই বললে:

'ষাঁড়টাকে নিয়ে চলেছি জ্ঞানী বিচারকের কাছে, তিনি যা বলবেন তাই করব।'

বিদায় নেবার সময় ঘোড়সওয়ারকে বললে:

'শিগগিরই তুমি আমাদের মেজো ভাইকে দেখবে। সে আছে ষাঁড়ের পেটের কাছে। তাকে আমার সেলাম জানিয়ে বলো যেন একটু ভালো করে তাড়া দেয় ষাঁড়টাকে। সন্ধে হবার আগেই যেন গিয়ে পেঁছিই।'

'বেশ' বলে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল সওয়ার। দুপুর বেলায় সে পেঁছিল ষাঁড়ের পেটের কাছে মেজো ভাইয়ের ওখানে। কুশল বিনিময় করে বললে:

'তোমার ছোটো ভাই তোমায় সেলাম জানিয়ে বলেছে একটু ভালো করে ষাঁড়টাকে তাড়া দিতে — সন্ধের আগই যাতে পেঁছুন যায়।'

সওয়ারকে ধন্যবাদ দিয়ে মেজো ভাই তাকে অনুরোধ করলে:

'ষাঁড়ের মাথার কাছে আমাদের বড়ো ভাইকে যখন দেখবে তখন তাকে আমার সেলাম জানিয়ে বলো যেন একটু জোর তাড়া দেয়: জ্ঞানী বিচারকের গাঁয়ে তাড়াতাড়ি পেঁছুন দরকার।'

সওয়ার ফের ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল, ষাঁড়ের মাথার কাছে পেঁছুল সন্ধ্যা নাগাদ। বড়ো ভাইকে সে মেজো ভাইয়ের সেলাম জানিয়ে তার অনুরোধের কথা বললে।

বড়ো ভাই বলে, 'কোনো উপায় নেই। রাত হয়ে এসেছে। এইখানে থেমে পথেই রাত কাটাতে হবে।'

ঘোড়সওয়ার না থেকে ছুটে চলে গেল।

স্তেপের মধ্যে রাত কাটালে ভাইয়েরা। পর দিন সকালে ফের ষাঁড় হাঁকাতে শুরু করলে। হঠাৎ এক বিপদ হল। আকাশ থেকে উড়ে এল এক মস্ত ঈগল। ষাঁড়ের পিঠে ছোঁ মেরে তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল মেঘের কোলে।

ভাইয়েরা একসঙ্গে জুটে হায় হায় করতে লাগল তারপর খালি হাতেই ঘরে ফিরল।

ষাঁড়টাকে নিয়ে ঈগল ওদিকে আকাশে উড়ে চলেছে। কিছুক্ষণ পরে সে দেখে চারণভূমিতে এক পাল ছাগল চরছে, তার মধ্যে একটা যে ছাগল কী তার শিঙ! ঈগল চটপট নিচে নেমে এসে বসলে ছাগলের শিঙের ওপর, সেইখানে বসে বসে সে ষাঁড়টাকে খায় আর এদিক ওদিকে হাড় ছড়ায়।

এমন সময় এল প্রবল বৃষ্টি। ছাগলের পাল আর রাখাল এসে আশ্রয় নিলে এই ছাগলটার দাড়ির তলায়।

হঠাৎ বাঁ চোখে একটা ব্যথা বোধ হল রাখালের।

ভাবলে, 'নিশ্চয় চোখের মধ্যে পোকা মাকড় কিছু পড়েছে।'

সন্ধ্যার সময় সে তার ছাগলের পাল তাড়িয়ে নিয়ে এল নিজের গাঁয়ে। চোখের ব্যথাটা তখন ভারি বেড়ে উঠেছে। রাখাল বললে:

'ওহে, তোমরা শিগগির বদ্যি ডেকো। চোখের মধ্যে চল্লিশটা নৌকো ভাসিয়ে তারা ওই পোকাটাকে খুঁজে দেখুক। যন্ত্রণা আর সইছে না!'

চল্লিশটা বদ্যি ডেকে গাঁয়ের লোকেরা বললে:

'আমাদের ঐ রাখালের চোখের মধ্যে নৌকো ভাসিয়ে পোকাটাকে খুঁজে দেখো। যন্ত্রণা আর ওর সইছে না। তবে দেখো, চোখের কোনো ক্ষতি কোরো না!'

চল্লিশজন বদ্যি চল্লিশটি নৌকো ভাসালে চোখের মধ্যে, পোকা খোঁজাখুঁজি করে। দেখে কি — পোকা নয়, ষাঁড়ের গর্দানের হাড়টা। বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্যে যখন সে ছাগলের দাড়ির নিচে দাঁড়িয়েছিল, তখন সেটা তার চোখে এসে পড়ে।

রাখালের চোখের ব্যথা দূর হল, বদ্যিরা ঘরে ফিরল, ষাঁড়ের হাড়টা তারা ছুড়ে ফেলল গাঁ ছাড়িয়ে দূরে।

কিছু পরে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল একদল যাযাবর।

রাত হয়ে গেছে, বুড়োরা সলাপরামর্শ করে ঠিক করলে ওইখানেই রাত কাটাবে, আগুন জ্বালাবে।

বললে, 'এই নোনা ভুঁইটাই রাত কাটাবার পক্ষে সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে নিরাপদ।'

যাযাবররা সবই গোছগাছ করে শুতে যাবে, এমন সময় ভুঁইটা কাঁপতে লাগল, দুলতে লাগল।

বেদম ভয় পেয়ে গেল সবাই। লটবহর তাড়াতাড়ি চাপিয়ে ঘোড়া জুতে তারা রওনা দিলে।

সকাল হতে তবে সে ভয় কাটল। সেইখানে আস্তানা গেড়ে তারা চল্লিশজন সওয়ার পাঠালে ভূমিকম্পের জায়গাটায়, জেনে আসুক কী হয়েছিল।

সওয়াররা গিয়ে দেখে, রাতে যেটা তারা নোনা ভুঁই বলে ভেবেছিল সেটা এক মস্ত চ্যাটালো ষাঁড়ের হাড়। সে হাড় তখনো শেয়ালে চিবুচ্ছে।

'মাটি কেঁপেছিল তাহলে এই জন্যেই,' বলাবলি করলে সওয়াররা।

নিশানা নিয়ে তীর ছুঁড়ে তারা মারলে শেয়ালটাকে।

চল্লিশজন সওয়ার তারপর ছাল ছাড়াতে শুরু করলে শেয়ালটার। কিন্তু ছাল ছাড়ানো হল কেবল একপাশের, অন্য পাশের ছাল যেমন ছিল তেমনি রইল, কিছুতেই ওলটানো গেল না শেয়ালটাকে।

ফিরে এসে সওয়াররা সব কথা বললে মুরুব্বিদের।

মুরুব্বিরা ভাবতে লাগল কী করবে, কী উপায় বার করবে। এমন সময় এল একটি যুবতী মেয়ে। বললে:

'তোমাদের সওয়াররা যে আধখানা ছাল নিয়ে এসেছে সেটি আমায় দাও। আমার বাচ্চার টুপি সেলাই করব তাতে।'

মুরুব্বিরা বললে, 'বেশ, নিয়ে যাও!'

মেয়েটি তার কোলের শিশুর মাথার মাপ নিয়ে টুপির জন্যে ছাল কাটতে লাগল। যা ছাল তাতে কেবল আধখানা টুপি হয়। মেয়েটি তখন ফের মুরুব্বিদের কাছে এসে বললে:

'ছালের অপর আধখানাও আমায় দাও, কুলুচ্ছে না।'

চল্লিশ সওয়ার তখন কবুল করলে, শেয়ালটাকে ওলটাবার ক্ষমতা তাদের হয় নি, তাই অন্য পাশের ছালটা তারা ছাড়ায় নি।

বললে, 'ছালের আধখানাতেও যদি তোর কোলের ছেলের টুপি না হয়, তা হলে নিজে গিয়ে বাকিটা ছাড়িয়ে নে গা!'

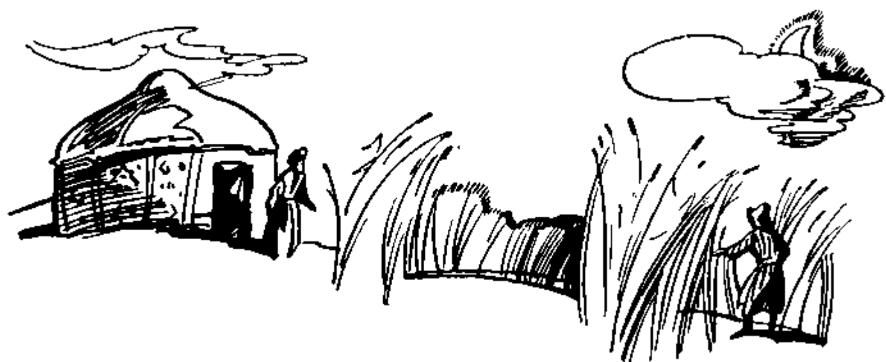
ছেলে নিয়ে মেয়েটি গেল শেয়ালের কাছে। অনায়াসে শেয়ালটাকে সে উলটিয়ে দিলে, ছাল ছাড়িয়ে দুই আধখানা জুড়ে টুপি বানালে নিজের ছেলের।

এবার বলো তো, কে সবচেয়ে বড়ো? যে ষাঁড়ের এক মুড়ো থেকে আরেক মুড়ো পর্যন্ত যেতে ঘোড়সওয়ারের পুরো দিন লেগে যায় — সেই ষাঁড়টা? নাকি ঈগল, ষাঁড়কে যে ছোঁ মেরে আকাশে তোলে? নাকি ছাগল, যার শিঙে বসে ষাঁড় ঠুকরিয়ে খায় ঈগল? নাকি রাখাল, যার চোখের মধ্যে চল্লিশ বদ্যি চল্লিশ নৌকো ভাসায়? নাকি শেয়ালটা, যে ষাঁড়ের হাড় চিবুতে ভয় পেয়ে যায় যাযাবরের দল? নাকি ঐ কোলের ছেলেটা, যার মাথার টুপিতে খেয়ে যায় সে শেয়ালের সব চামড়া? নাকি, এমন যার কোলের ছেলে — সেই মেয়েটি?

ভেবে দ্যাখো, ভালো করে ভেবে চিন্তে জবাব দিয়ো।

আল্দার-কোসে আর শিগাই-বাই

(কাজাখী কাহিনী)



পুরাকালে স্তেপে বাস করত আল্দার-কোসে নামে এক গরিব। সম্পত্তি বলতে একটা ঘোড়া ছাড়া তার কিছুই ছিল না, কিন্তু ফন্দিফিকির তার জানা ছিল অনেক।

ঐ স্তেপেই ডেরা বেঁধেছিল শিগাই-বাই নামে এক ধনী। যেমন ধনদৌলৎ তেমনি কৃপণ। এমন কৃপণ যে অতিথিকে এক টুকরো রুটি, এক ঢোক জল দিতেও সে নারাজ।

চালাক চতুর আল্দার-কোসে ঠিক করলে এই শিগাই-বাইকে একটু শিক্ষা দেবে।

নিজের ঘোড়াটিতে চেপে সে চলল শিগাই-বাইয়ের কাছে অতিথ হতে। এ খবর শুনে লোকেরা সব হাসাহাসি করতে লাগল:

'যা না আল্‌দার-কোসে, শিগাই-বাই তোকে কেমন আপ্যায়ন করে দেখিস! পেট ভরে খানা দেবে পুরুষ্টু ভেড়ার মাংস, পিনা দেবে সব সেরা আইরান*!'

আল্‌দার-কোসে বললে, 'আচ্ছা, দেখাই যাক!'

স্তেপে সে ঘুরে বেড়াল অনেক দিন, শিগাই-বাইয়ের ছাউনি খোঁজে। কিন্তু সবাই তাকে বলে:

'উহুঁ, এ এলাকায় শিগাই-বাইকে পাবে না: লোকজনের কাছ থেকে দূরে ও কোথায় যেন উঠে গেছে।'

আল্‌দার-কোসে কেবলি এগিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত দেখে স্তেপের মধ্যে একলা একটা ছাউনি। সে ছাউনির চারিপাশে ঝোপঝাড়।

'ঝোপঝাড়ের মধ্যে যে শিগাই-বাই ছাউনি ফেলেছে, সে কি আর খামোকা!' মনে মনে ভাবলে আল্‌দার-কোসে।

সত্যিই খামোকা নয়। বাইরের লোক কেউ আসছে এটা যাতে গৃহস্বামী আর তার পরিবার পরিজন আগেই জানতে পারে তার জন্যে এই ব্যবস্থা। ঝোপঝাড়ের শব্দ হবে, তার মানে কেউ আসছে ছাউনিতে। আর কেউ যখন আসছে তখন তাড়াতাড়ি খাবার দাবার সব লুকিয়ে রাখাই ভালো, আগন্তুককে খাওয়াবার দায় থাকবে না।

ব্যাপারটা আন্দাজ করলে বুদ্ধিমান আল্‌দার-কোসে।

ভাবতে লাগল, কোনো রকম শব্দ না করে শিগাই-বাইয়ের ছাউনি পর্যন্ত যাওয়া যায় কী করে।

যেতে গেলেই যে শব্দ হবে! আল্‌দার-কোসে তখন এক চালাকি খাটালে।

ঘোড়াটি ও একপাশে লুকিয়ে রেখে পাথর কুড়াতে লাগল। কুড়িয়ে কুড়িয়ে অনেক পাথর জড়ো করলে। তারপর অন্ধকার হতেই ঝোপঝাড়ের মধ্যে একটার পর একটা পাথর ছুড়ে মারতে লাগল।

আল্‌দার-কোসে পাথর ছুড়ে মারে, অমনি ঝোপঝাড়ে শব্দ হয়। ছাউনি থেকে বেরিয়ে এসে শিগাই-বাই এদিক ওদিক চায়, কান পেতে শোনে:

---

* আইরান — টোকো দুধ বিশেষ। — সম্পাঃ

'কে আসে?'

কেউ নেই। ছাউনিতে ফিরে এল সে। আল্‌দার-কোসে ওদিকে ফের পাথর ফেলে। ফের শব্দ হয় ঝোপঝাড়ে, ফের ছাউনি থেকে বেরিয়ে এসে চারিদিক দেখে শিগাই-বাই — না, কেউ নেই।

'বোঝা যাচ্ছে বাতাসে ঝোপঝাড় দুলছে,' এই ভেবে শিগাই-বাই আর ছাউনি ছেড়ে বেরুল না।

আর ঠিক এইটেই চাইছিল আল্‌দার-কোসে। ঘোড়াটির লাগাম ধরে সে ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে এগুতে লাগল কঞ্জুসটার ছাউনির দিকে। এক পা করে এগোয় আর থামে। আবার এগোয়, আবার থামে।

এই ভাবে সে পেঁছিল ছাউনির কাছে।

ছাউনির পর্দা তুলে দেখল আল্‌দার-কোসে — চারিদিকে ধনদৌলতে ঠাসা। সব জায়গায় গালিচা, সব জায়গায় তাকিয়া; একের পর এক সিন্দুক। আর ছাউনির মাঝখানে আগুনের সামনে পরিবারের লোকজন সমেত বসে আছে শিগাই-বাই। কড়াইয়ে ভেড়ার মাংস রান্না হচ্ছে, শিগাই-বাই চেয়ে চেয়ে দেখছে, চেখে দেখছে সেদ্ধ হল কিনা। আর সেই সঙ্গে টুকরো টুকরো মাংসের পুর দিয়ে সসেজ বানাচ্ছে। ময়দা মাখছে শিগাই-বাইয়ের বৌ। মেয়ে একটা হাঁস ছাড়াচ্ছে। ভেড়ার মাথাটা আগুনে সেঁকছে তার চাকর।

আল্‌দার-কোসে তখন আচমকা ছাউনির ভেতর ঢুকে বললে:

'কুশল হোক!'

অমনি ঝট করে কড়াই ঢাকা দিয়ে শিগাই-বাই বসে পড়ল সসেজের ওপর, বৌ বসে পড়ল ময়দার ওপর, ঘাগরার তলে হাঁস লুকলে মেয়ে, আর ভেড়ার সেঁকা মুণ্ডুটা পিঠ আড়াল করে রইল তার চাকর।

আল্‌দার-কোসের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে শিগাই-বাই জিজ্ঞেস করলে:

'তা স্তেপের নতুন খবর কী?'

আল্‌দার-কোসে বললে, 'সে আর কী বলব বাই, অনেক ব্যাপার, অনেক বৃত্তান্ত — বলে শেষ হবে না!'

'সব নাই বললি, দুটো একটা বল!'

'তোর ছাউনিতে আসার সময় বাই, দেখি কি, ইয়া মোটা এক সাপ — আমি ঢোকার সময় তুই যে সসেজটার ওপর বসে পড়েছিস তার চেয়েও মোটা।'

ভুরু কোঁচকালে শিগাই-বাই, কিন্তু কিছু বললে না। আল্‌দার-কোসে বলে চলল:

'বিশ্বাস কর বাই, সাপের মাথাটা না — যেমন বড়ো তেমনি কালো, ঠিক তোর ঐ ভেড়ার মাথাটার মতো, তোর চাকর যেটা এই মাত্র সে'কে পিঠের আড়ালে লুকিয়েছে।'

ভুরু কোঁচকালে শিগাই-বাই, কিন্তু ফের চুপ করে রইল। সেয়ানা লোকটা ওদিকে বলে চলল তার কাহিনী:

'হাঁটে সাপটা, ফোঁস ফোঁস করে, ঠিক তোর ঐ হাঁড়িটার মতো, যাতে তোর ভেড়ার মাংস সেদ্ধ হচ্ছে। ঘোড়া থেকে নেমে আমি একটা প্রকাণ্ড পাথর নিয়ে প্রাণপণে মারলাম সাপটার ওপর। মাথাটা থে'তলে গিয়ে দাঁড়াল ঐ ময়দার তালটার মতো, যার ওপরে তোর বউ বসে আছে। এই সব অবাক কাণ্ড ঘটছে আর কি স্তেপে, যদি মিছে বলে থাকি তবে ঐ হাঁসটা মেরে তোর মেয়ে যেমন ছাড়িয়েছে তেমনি যেন ছাল ছাড়িয়ে নিস আমার!'

ফের রাগে ভ্রূকুটি করলে শিগাই-বাই, কিন্তু এবারও কিছু বললে না। আল্‌দার-কোসেকে খেতেও দিল না।

বেশ রাত পর্যন্ত বসে রইল আল্‌দার-কোসে, গপ্প চালিয়ে গেল শিগাই-বাইয়ের সঙ্গে। হাঁড়িতে ওদিকে ভেড়ার মাংস সেদ্ধ হয়েই চলেছে, ছাউনি ভরে তার গন্ধ ছড়িয়েছে।

পথ পাড়ি দিয়ে এসে খিদে পেয়েছিল আল্‌দার-কোসের, কেবলি তাকায় হাঁড়ির দিকে, নিজের লালা গিলে খায়। শিগাই-বাই তা দেখে বলে:

'ছ মাস ধরে ফুটে যা আমার হাঁড়ি!'

আল্‌দার-কোসে অমনি তার জুতো খুলে, শুয়ে হাই তুলে বললে:

'বছর দুয়েক একটু জিরিয়ে নে আমার জুতো!'

শিগাই-বাই দেখে, অতিথি যাবার নাম করছে না। তাই নিজেও না খেয়েই শোবে ঠিক করলে।

সবাই শুয়ে পড়ল, মাংসের হাঁড়িটা রইল তেপায়ার ওপর।

শিগাই-বাই ভাবে, 'আল্‌দার-কোসে ঘুমিয়ে পড়লেই সবাইকে জাগিয়ে মাংসটা খাওয়া যাবে।'

আল্‌দার-কোসে ভাবে, 'কঞ্জুস শিগাই-বাই ঘুমুলেই পেট ভরে খেয়ে নেওয়া যাবে। হাঁড়ির মাংস যখন বহু আগেই সেদ্ধ হয়ে আছে তখন উপোস দিয়ে কী লাভ?'

শুল শিগাই-বাই, শুয়ে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়ল, সারা ছাউনি জুড়ে কী তার নাক ডাকা।

আল্‌দার-কোসে তখন উঠে হাঁড়ির মাংসটি খেয়ে তাতে ডুবিয়ে রাখলে শিগাই-বাইয়ের পুরনো জুতোজোড়া। তারপর হাঁড়ির মুখটা ঢাকা দিয়ে শুয়ে শুয়ে নজর রাখলে কী হয়।

কিছুক্ষণ পরে ঘুম ভাঙল শিগাই-বাইয়ের, কান পেতে শুনলে, চেয়ে দেখলে আল্‌দার-কোসের দিকে, ভাবলে ঘুমুচ্ছে। চুপি চুপি বউ মেয়েকে সে জাগিয়ে তুললে:

'ওঠ! ওঠ শিগগির! আল্‌দার-কোসে ঘুমুচ্ছে, এই বেলা মাংসটা খাওয়া যাক!'

হাঁড়ির ঢাকা খুলে নিজের জুতোটি বার করে ছুরি দিয়ে কেটে খাবার জোগাড় করলে। চিবোয় চিবোয়, মাংস কিন্তু বাগে আসে না!.. কী ব্যাপার, মাংস এমন শক্ত কেন?

'অলক্ষুণে আল্‌দার-কোসের দোষ,' বউকে বলে শিগাই-বাই, 'ওরই জন্যে মাংস অমন দড়কচা মেরে গেছে। তা ভাবনা নেই, ও চলে গেলেই ফের সেদ্ধ করে খাব! এখন টুকরোগুলোকে জড়ো করে তুলে রাখ হাঁড়িতে।'

চামড়ার জুতোর টুকরোগুলোকে জড়ো করে বউ তুলে রাখল হাঁড়িতে। শিগাই-বাই তখন বৌকে বললে, আগুন জ্বালিয়ে গতকালের ময়দা থেকে কিছু চাপাটি সেঁকে দিতে।

চাপাটি ভাজা হতেই শিগাই-বাই তা ঠাণ্ডা হতে না দিয়েই তাড়াতাড়ি বুকের মধ্যে পুরে চলে গেল তার গোরু ঘোড়ার পাল দেখতে।

কঞ্জুসটা বেরুতেই আল্‌দার-কোসে ছাউনি থেকে বেরিয়ে ছুটে গেল তার কাছে। বললে:

'ওহে, বাই! ভাগ্যিস ঘুম ভেঙেছিল, নইলে তোর কাছে বিদায় না নিয়েই যেতে হত! আমি আজই ফিরে যাচ্ছি যে!'

শিগাই-বাইয়ের সঙ্গে কোলাকুলি করতে লাগল আল্‌দার-কোসে। এমন জোরে তার বুকে চাপ দিলে যে গরম চাপাটিতে একেবারে বুক পুড়ে যেতে লাগল কঞ্জুসটার, শিগাই-বাই সহ্য করে, সহ্য করে, কিন্তু আর পারে না। চেঁচিয়ে উঠল:

'পুড়ে গেলাম! পুড়ে গেলাম!'

বুকের ভেতর থেকে চাপাটিগুলো বার করে চ্যাঁচালে:

'যাক এগুলো কুকুরের পেটে!'

আল্‌দার-কোসে বললে, 'সে কী বাই, গরম চাপাটি কুকুরকে দিয়ে কী হবে? বরং আমিই খাই!'

এই বলে চাপাটিগুলো সে খেয়ে নিলে।

বললে, 'বেশ চাপাটি বানায় তোর গিন্নি! অনেক দিন এমন খাই নি!'

এ কথার কোনো জবাব দিলে না শিগাই-বাই, পেটের খিদে পেটে নিয়েই রওনা দিলে স্তেপের উদ্দেশে।

সন্ধ্যার সময় স্তেপ থেকে ফিরে এসে দেখে, আল্‌দার-কোসে বসেই আছে তার ছাউনিতে।

'সে কি তুই যে বিদায় নিলি, চলে যাবি বলছিলি?' জিজ্ঞেস করে শিগাই-বাই।

'ভেবেছিলাম তাই, কিন্তু পরে মত বদলাল। তোর এখানে ভারি ভালো লাগছে আমার,' বললে আল্‌দার-কোসে।

রাগে মুখ কোঁচকালে শিগাই-বাই, কিন্তু কী আর করবে, ছাউনি থেকে অতিথিকে তো আর বার করে দেওয়া যায় না।

পরের দিন সকালে শিগাই-বাই ফের স্তেপে যাবার উদ্যোগ করলে, বউকে বললে:

'এক মশক আইরান দে আমায়, আল্‌দার-কোসে যেন না দেখে।'

মস্ত এক মশক আইরান ঢেলে বাইকে দিলে বৌ। নিজের আলখাল্লায় মশকটি লুকিয়ে বাই বেরুল।

ভাবে, 'এবার আর কোনো ঝামেলা হবে না।'

কিন্তু সেটি আর হল না। আল্‌দার-কোসে ছুটে গিয়ে কোলাকুলি করতে লাগল

শিগাই-বাইয়ের সঙ্গে। কোলাকুলি করতে করতে উলটে গেল আইরানের মশক। আলখাল্লা বেয়ে আইরান পড়ে। ক্ষেপে উঠে শিগাই-বাই মশকটা নিয়ে আল্‌দার-কোসের হাতে দিয়ে বলে:

'খা বাপু, খা! গেল!'

আল্‌দার-কোসে বলে, 'তা খেতে যখন বলছিস তখন খেয়েই নিই। আপত্তি করে তোর মনে দুঃখু দিয়ে কী হবে।'

এই বলে সমস্ত আইরান খেয়ে নিলে।

ফের ক্ষিদে পেটে নিয়েই স্তেপে গেল শিগাই-বাই। আর চতুর আল্‌দার-কোসে ছাউনিতে ফিরে এসে বৌ মেয়ের সঙ্গে গপ্প জুড়লে।

কঞ্জুসের ছাউনিতে অনেক দিন কাটালে আল্‌দার-কোসে। শিগাই-বাই যতই চালাকি খাটাক, যতই ফন্দি করুক, অতিথিকে ঠকাতে পারে না। ইচ্ছে থাক না থাক আল্‌দার-কোসেকে খাওয়াতেই হল।

সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত ভাবলে শিগাই-বাই, কী করে অতিথিকে ভাগাবে ছাউনি থেকে, কী করে শোধ তুলবে। ভেবে ভেবে এক বুদ্ধি করলে।

চাঁদ কপালী এক ঘোড়ায় চেপে আল্‌দার-কোসে এসেছিল তার ছাউনিতে। ঠিক করলে এই ঘোড়াটি জবাই করবে। ঘোড়াটার কাছ দিয়ে যাবার সময় প্রতিবার সে ভারি হিংস্র দৃষ্টিতে তাকাত তার দিকে।

আল্‌দার-কোসে তা নজর করলে।

সন্ধ্যা বেলা সে খানিকটা ঝুলকালি নিয়ে নিজের ঘোড়ার কপালের সাদা দাগটা লেপে দিয়ে শিগাই-বাইয়ের সেরা ঘোড়াটির কপালে সাদা মাটি বুলিয়ে দিলে।

তারপর ফিরে এসে ঘুমুতে লাগল।

রাত্রে শিগাই-বাই চুপি চুপি বেরুল ছাউনি থেকে, ঘোড়ার পালের মধ্যে যেটির কপালে সাদা দাগ সেটিকে বার করে কাটলে, তারপর প্রাণপণে চেঁচাতে লাগল:

'সর্বনাশ হয়েছে, আল্‌দার-কোসে! সর্বনাশ হয়েছে তোর ঘোড়ার!'

আল্‌দার-কোসে কিন্তু ছাউনি থেকে বেরুবারও গা করে না। জবাবে বললে:

'ভয় নেই বাই, চেঁচাস নে! সর্বনাশ আবার কী: চটপট কেটে ফেল, তোদের আমার সবারই দিব্যি মাংস জুটবে!'

আনন্দে শিগাই-বাইয়ের হাসি আর ধরে না। হাড়-জ্বালানে অতিথিটার ওপর শেষ পর্যন্ত শোধ তোলা গেছে তাহলে।

সকাল হতেই কেবল তার খেয়াল হল নিজের সেরা ঘোড়াটিকেই সে মেরেছে।

রাগে শিগাই-বাই ফেটে মরে আর কি, কিন্তু উপায় নেই, ঘোড়ার মাংস রান্না করে খাওয়াতে হল।

শেষ পর্যন্ত আল্দার-কোসে নিজেই হাঁপিয়ে উঠল বাইয়ের ঘরে দিন কাটাতে। ঠিক করলে নিজের গাঁয়ে ফিরে যাবে, আর সঙ্গে নিয়ে যাবে বাইয়ের মেয়েটিকে।

ভাবে, 'বরং আমারই বৌ হোক, নইলে অমন বাপের সঙ্গে থেকে থেকে নিজেই কেপন হয়ে উঠবে।'

শিগাই-বাইয়ের মেয়েটির নাম বিজ*-বুলদুক। ফুর্তিবাজ আল্দার-কোসেকে দেখে তার সঙ্গে সঙ্গেই ভালো লেগে গিয়েছিল। কারণে অকারণে আল্দার-কোসের দিকে চুপি চুপি চেয়ে দেখত মেয়েটি।

সকালে রোজকার মতো শিগাই-বাই যখন স্তেপে যাবার জন্যে ঘোড়ায় চেপে বসেছে, তখন আল্দার-কোসে বললে:

'তা বাই, তোর এখানে বেশ কাটল অনেক দিন। এবার ঘরে ফিরতে হয়। সন্ধ্যায় তোর ছাউনিতে ফিরে দেখবি বেশ খোলামেলা।'

শিগাই-বাই শোনে, নিজের কানকেও বিশ্বাস করে না।

'তোর বিজটা আমায় কেবল দে, যাবার মুখে জুতোটা একটু মেরামত করব, একেবারে ক্ষয়ে গেছে!'

শিগাই-বাই বলে, 'তা বেশ তো, বিজটা নিয়ে জুতো মেরামত করে রওনা দে। অনেক দিন তো কাটালি!'

এই বলে সে চলে গেল স্তেপে।

আল্দার-কোসে তখন ছাউনিতে ফিরে এসে গিন্নিকে বললে:

'তা গিন্নি, এবার বিজকে সাজিয়ে গুছিয়ে দাও, আমার সঙ্গে যাবে।'

---

* বিজ — চামড়া ফুটো করার কাঁটা। — সম্পাঃ

চে'চিয়ে উঠল বাইয়ের বৌ, 'একেবারেই মাথা খারাপ হল নাকি তোর? তোর মতো একটা লক্ষ্মীছাড়াকে কি কখনো শিগাই-বাই তার মেয়ে দেবে?'

'তাই দিয়েছে গিন্নি! সম্প্রদান করেছে! বিশ্বাস না হয় নিজেই জিজ্ঞেস করে দ্যাখো!'

ছাউনি থেকে বেরিয়ে বৌ চ্যাঁচাতে লাগল:

'শিগাই-বাই! শিগাই-বাই! আল্‌দার-কোসেকে তুই বিজ দিবি বলে কথা দিয়েছিস, সত্যি?'

বাই বললে, 'সত্যি! সত্যি! বিজ দিয়ে দে, তাড়াতাড়ি চলে যাক আমাদের ছেড়ে!'

এই বলে শিগাই-বাই ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে গেল স্তেপে।

শিগাই-বাইয়ের কথা অমান্যি করার সাহস হল না বৌয়ের। বিজ-বুলদুককে সাজিয়ে গুছিয়ে বার করে এনে দিলে। চাঁদ কপালী ঘোড়ার ওপর মেয়েটিকে চাপিয়ে রওনা দিলে আল্‌দার-কোসে।

যেতে যেতে মেয়েটিকে বলে:

'ভালো মানুষদের মধ্যে দিন কাটাবি, নিজেও ভালো হবি!'

সন্ধ্যায় শিগাই-বাই ফিরল নিজের ছাউনিতে। ওর অনুপস্থিতিতে কী হয়েছে সব শুনে রেগে আগুন হয়ে উঠল সে। ঘোড়ায় চেপে ছুটল আল্‌দার-কোসের সন্ধানে। সারা স্তেপ খুঁজে খুঁজে দেখলে, আল্‌দার-কোসেকে আর পেল না। খালি হাতেই ফিরতে হল কৃপণ শিগাই-বাইকে।

বরোল্‌দই-মের্গেন আর তার বীর পুত্র

(আল্‌তাই উপকথা)



সে অনেক দিনের কথা। অতি প্রাচীন কালে নীল আলতাই পাহাড়ে ছিল আলমিস নামে এক নরখাদক।

কুচকুচে কালো গোঁপ তার লাগামের মতো নেমে এসেছে কাঁধ ছাড়িয়ে। দাড়ি তার হাঁটু পর্যন্ত। লাল টকটকে চোখ। মুখে বড়ো বড়ো ধারালো দাঁত। আঙুলে ছুঁচলো নখ। সারা গা ভর্তি ঘন লোম।

ভারি হিংস্র, রক্তলোলুপ, নির্মম ছিল এই আলমিস। বনে সে ঝাঁপিয়ে পড়ত শিকারীদের ওপর, গাঁয়ে গিয়ে হানা দিত মেয়েদের ওপর, বুড়োবুড়িকেও ছাড়ত না, ছেলেপিলেকেও মায়া করত না। লোক ধরে ধরে খেত।

গায়ে তার এমন জোর, মাথায় এমন কুবুদ্ধি যে কেউ তার সঙ্গে লড়তে সাহস পেত না।

আলমিসকে দেখলেই লোকে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গিয়ে লুকাত...

কী করবে ভেবে পায় না লোকেরা। বলাবলি করে:

'আমাদের চেয়ে আলমিসের গায়ে জোর বেশি, বুদ্ধি বেশি! কেউ ওকে কাবু করতে পারবে না, কেউ ওকে ঠকাতে পারবে না। তাই সইতে হবে, চুপ করে থাকতে হবে।'

তাই সয়েই যায় সবাই, চুপ করেই থাকে।

এখন এক গাঁয়ে ছিল এক শিকারী। নাম তার বরোল্‌দই-মের্গেন। যেমন জোর তেমনি সাহস, তেমনি বুদ্ধি। লোকে শিকারে যায়, খালি হাতে ফেরে। বরোল্‌দই-মের্গেন কিন্তু কিছু না কিছু শিকার করবেই: কখনো শেয়াল মেরে আনে, কখনো নেউল, কখনো আর্মিন, কখনো কাঠবেড়ালি। সব বন, সব পাহাড় সে ঢুঁড়ে বেড়িয়েছে। কোনো জন্তু তাকে ছোঁয় নি, কোনো বিপদে সে পড়ে নি, কারণ বুদ্ধি তার ছিল পরিষ্কার, নজর ছিল কড়া, হাত ছিল জোরদার।

একদিন আলমিস তার নিজের পাহাড় ছেড়ে এসে গেল বরোল্‌দই-মের্গেনের গাঁয়ে। ভয়ে লোক ছুটে পালায় চারিদিকে, ভেবে পায় না কোথায় লুকোয়।

নরখাদক ততক্ষণে একটা ছেলেকে ধরে ফিরে গেল নিজের পাহাড়ে।

আল্‌মিস যতক্ষণ কাছাকাছি ছিল, লোকের তখন গলা উঁচু করে কথা বলারও সাহস ছিল না। আল্‌মিস চলে যেতেই চেঁচামেচি কান্নাকাটি পড়ে গেল।

মায়েরা কাঁদে, 'কে জানে পরের বার কার ছেলে ধরে নিয়ে যাবে রাক্ষসটা!'

ছেলেপিলেরাও কাঁদে, মরদরা চুপ করে থাকে, ভুরু কোঁচকায়। বরোল্‌দই-মের্গেন তাদের বলে:

'কেঁদে কী হবে, লুকিয়ে কী হবে। দরকার ঐ পোড়ারমুখো নরখাদকটাকে বধ করা, সবাই তাহলে নির্ভয়ে দিন কাটাবে।'

আর লোকে বলে:

'আলমিসকে কাবু করা যাবে না, ওর হাত থেকে রেহাই নেই। আমরা তো

18—406

পাখি নই যে আকাশে উড়ে যাব, মাছ নই যে জলে ডুবব। মুখপোড়া আলমিসের নখে দাঁতেই আমাদের মরণ দেখছি!'

ভারি দুঃখ হল বরোল্‌দই-মের্গেনের, ভারি রাগ হল, ক্ষোভ হল। নিজের ছেলের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবে:

'আলমিস ওকে তার ধারালো নখে দাঁতে ছিঁড়ে খাবে, সেই জন্যে কি আর ওর জন্ম? কেউ সে জন্যে জন্মায় নি! নরখাদকটাকে শেষ করতে হবে, মায়েদের দুঃখ ঘোচাতে হবে!'

কিন্তু কী তার উপায়?

আলমিসকে লড়াইয়ে ডাকা চলে না। শুধু এক জনকে নয় গাঁয়ের সব লোককে মেরে শেষ করতে পারে আলমিস। মরদেরা কেউ তার সঙ্গে লড়তেই আসবে না — সবাইকেই ভয় পাইয়ে দিয়েছে আলমিস, সবার সাহস ঘুচিয়ে দিয়েছে, সবার বীর্য হরণ করেছে। তার ওপর চালাকি খাটানোও অসম্ভব: সব সময় সে হুঁশিয়ার, সবকিছু সে চট করে ধরে ফেলে।

বরোল্‌দই-মের্গেন কেবলি ভাবে কী করে বাঁচানো যায় লোকেদের, মনে তার শান্তি নেই।

অনেক কথা সে ভাবলে, অনেক দিন ধরে ভাবলে। তারপর একটা বুদ্ধি করল।

কী বুদ্ধি করল সেটি কাউকেই সে বললে না।

সবচেয়ে জোরালো ধনুক সবচেয়ে ধারালো তীর নিয়ে সে তার ছেলেকে শুধাল:

'বুকে তোর সাহস আছে?'

'আছে!'

'লোকের জন্যে তোর মায়া আছে?'

'আছে!'

'তবে চল আমার সঙ্গে। পথ আমাদের অনেক দূর, কাজ আমাদের ভয়ঙ্কর। কিন্তু না গেলেই নয়। জিজ্ঞেস করবি কিছু?'

ছেলে কিন্তু কোনো কথাই জিজ্ঞেস করলে না। নীরবে চলল তার সঙ্গে।

যে পাহাড় থেকে আলমিস নেমে এসেছিল সেই পাহাড়ের দিকে চললে

শিকারী। গভীর বন পাড়ি দিলে তারা, পাথরের চুড়ো বেয়ে উঠল, অগম পথ ধরে হাঁটল, তারপর শেষ পর্যন্ত পেঁছল এক খোলা জায়গায়।

মস্ত একটা গাছের গুঁড়ি সেখানে দাঁড়িয়ে, চারিপাশে ঝোপঝাড়, গাছপালা। আশেপাশে কেউ কোথায় নেই — না পশু, না পাখি।

এইখানে থামল বরোল্দই-মের্গেন। নিজের শিকারীর পোশাক খুলে সাজালে গাছের গুঁড়িটাকে। ছেলে বাপের দিকে চেয়ে দেখে, কিছু বলে না। গাছের গুঁড়ির কাছে তারপর আগুন জ্বালালে বাপ। ছেলে দেখে কিছু বলে না।

শিকারী তাকে বললে:

'এইখানে বসে থাক, আগুনের কাছে। যাই ঘটুক পালাস না।'

'পালাব না!'

'খুব ভয়ের ব্যাপার কিন্তু, ভয়ঙ্কর লাগবে তোর!'

'ভয় পাব না!'

'তাহলে বসে থাক।'

ছেলে বসলে আগুনের কাছে আর বাপ তার তীর ধনুক নিয়ে লুকিয়ে রইল ঝোপের মধ্যে। শিকারী বসে আছে ঝোপের মধ্যে, ছেলে বসে আছে আগুনের পাশে, কেউ নেই চারিদিকে, সব চুপচাপ।

বসে রইল অনেকক্ষণ।

হঠাৎ শোনা গেল মড়মড় ঝটপট শব্দ। গাছপালার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল আলমিস। কুচকুচে কালো মোচ ঘাড়ের পেছনে ঝোলানো, টকটকে লাল চোখ, কড়মড় করছে ধারালো দাঁত। দেখে, আগুনের পাশে একটি ছেলে; আহ্লাদে হুঙ্কার দেয়:

'মাংসের খোঁজে গাঁয়ে যাচ্ছিলাম, আর মাংস দেখি এখানেই!' পরে তার চোখ পড়ল গাছের গুঁড়িটার দিকে, ভাবলে কোনো এক শিকারী। হেসে বললে, 'তবে দ্যাখ রে মানুষ, কেমন করে তোর ছেলেকে খাই! ওকে বাঁচাবার সাধ্য তোর নেই!'

এই বলে সে ছুটে গেল আগুনের কাছে।

ছোটে আলমিস, বাতাসে তার দাড়ি ওড়ে, চামড়ার আলখাল্লা খসে বুক খুলে যায়। ছুটে এল সে, কিন্তু ছেলেটা ছোটে গুঁড়ির আড়ালে। আলমিস ছোটে তার

পেছন পেছন, আর ছেলেটা কেবলি গঁড়ির চারপাশে ঘোরে। ধরতে আর পারে না আলমিস। বরোল্‌দই-মের্গেন তখন নিশানা ঠিক করে বাণ মারলে, ধারালো তীর গিয়ে বিঁধল একেবারে আলমিসের বুকে। গর্জন করে উঠল আলমিস, আর্তনাদ করে উঠল। সে গর্জনে নুয়ে গেল গাছ, পাথর ফেটে গড়িয়ে পড়ল পাহাড় থেকে।

বরোল্‌দই-মের্গেন তীরের পর তীর মেরে চলে রাক্ষসের দিকে।

ক্ষেপে গিয়ে আলমিস ঝাঁপিয়ে পড়ল শিকারীর সাজ পরানো গুঁড়িটার দিকে। গাছ কামড়াতে কামড়াতেই হঠাৎ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। বরোল্‌দই-মের্গেন কাছে এসে দেখে — নরখাদক মারা পড়েছে।

ভয় লেগেছিল কিনা সে কথা ছেলেকে সে কিছুই জিজ্ঞেস করলে না। শুধু বললে:

'চল যাই!'

এই বলে ফিরে এল গাঁয়ে।

ফিরে এসে বরোল্‌দই-মের্গেন লোকেদের বললে:

'ছেলেরা আমাদের বেঁচে বর্তে থাকবে, নির্ভয়ে দিন কাটাবে মায়েরা। আলমিস আর নেই, মারা পড়েছে সে।'

'কে মারলে?' জিজ্ঞেস করলে সবাই।

'আমি।'

'আর ছোটো ছেলেটিকে তুই সঙ্গে নিয়েছিলি কেন?'

'ওকে করেছিলাম আলমিসের টোপ।'

'কিন্তু আলমিস যে ওকে ছিঁড়ে খেতে পারত!'

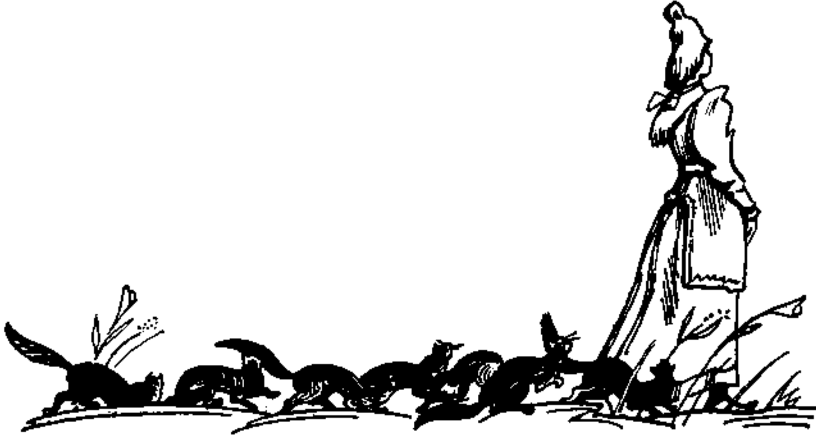
'তা পারত।'

এর বেশি একটি কথাও বললে না বরোল্‌দই-মের্গেন, ফিরে এল নিজের ঘরে।

চিরকেলে নিষ্ঠুর এক শত্রুর হাত থেকে এই ভাবেই মুক্তি পেল আলতাইয়ের লোকেরা।

ঘাস-কন্যা

(ইয়াকুৎ রূপকথা)



লোকে বলে, পাঁচ গোরুর মালিক এক ক্ষুদে বুড়ি-গিন্নি একদিন মাঠে গেল।

মাঠে গিয়ে দেখে এক ফার্ণ ঘাস, তার পাঁচটি শিষ। ঘাসের শিষ মূল কিছুই না ছিঁড়ে সে ঘাসটি উপড়িয়ে ফিরে এল তার ছাউনিতে, বালিশের উপর সেটি রেখে দিয়ে দুধ দুইতে বসল।

দুধ দুইছে, শোনে ছাউনির ভেতরে ঠুন্‌ঠুন্‌ ঘণ্টা। বুড়ির হাত থেকে দুধের পাত্র পড়ে গিয়ে দুধ ছলকে পড়ল। ছাউনির ভেতর ছুটে গিয়ে দেখে — যেমন ছিল তেমনি, সবই যথাস্থানে। বালিশের উপরে ফার্ণ ঘাস — যেমন ঘাস তেমনি। ফের ফিরল বুড়ি, দুধ দুইতে বসল। শোনে ফের সেই ঠুন্‌ঠুন্‌ ঘণ্টা। ফের দুধ ছলকে পড়ল বুড়ির, ভেতরে ছুটে গিয়ে দেখে, বিছানায় বসে আছে এক অপরূপ

সুন্দরী কন্যা। চোখ তার জ্বলজ্বলে মণির মতো, ভুরুদুখানি যেন দুই কালো নকুল। ফার্ণ ঘাসটি হয়ে গেছে ঐ কন্যে।

ক্ষুদে বুড়ির আনন্দ আর ধরে না। মেয়েটিকে বলে:

'আমার মেয়ে হয়ে থাক এখানে!'

তাই একসঙ্গেই রইল ওরা।

একদিন তরুণ ব্যাধ খার্জিৎ-বের্গেন গেল তাইগায়। দেখে এক ধূসর কাঠবেড়ালি, বাণ মারলে তার দিকে। ভোর থেকে সূর্যাস্ত অবধি বাণ মেরে চলল, কিন্তু কাঠবেড়ালিকে আর পায় না। ফার গাছ থেকে বার্চ গাছে, বার্চ থেকে লার্চ গাছে লাফিয়ে যায় কাঠবেড়ালি।

লাফাতে লাফাতে ক্ষুদে বুড়ির ছাউনির কাছে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল এক পাইন গাছে।

খার্জিৎ-বের্গেন পাইন গাছের কাছে ছুটে এসে বাণ মারলে। কাঠবেড়ালি ফের কোথায় গা ঢাকা দিল, আর বাণ গিয়ে পড়ল বুড়ির ছাউনিতে ধোঁয়া বেরবার ফুটোর মধ্যে।

খার্জিৎ-বের্গেন হাঁকলে, 'আমার বাণ দিয়ে দে, বুড়ি!'

কিন্তু জবাব পেলে না।

চটে উঠল খার্জিৎ-বের্গেন, লাল হয়ে উঠল রাগে। হুড়মুড়িয়ে ঢুকল ছাউনিতে।

ঢুকেই দেখে এক পরমা সুন্দরী কন্যে। সে রূপ দেখে সে মরে আর কি, বিচার বুদ্ধি লোপ পায়। তারপর একটি কথাও না বলে ছুটে গিয়ে চাপল তার ঘোড়ায়, ছুটল বাড়িমুখো।

গিয়ে বলে, 'বাপ আমার, মা আমার, পাঁচ গোরুর মালিক ক্ষুদে বুড়ির ঘরে এক পরমা সুন্দরী কন্যে! সেই মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে দাও আমার!'

খার্জিৎ-বের্গেনের বাপ অমনি নয় ঘোড়ার পিঠে নয় সওয়ারকে পাঠালে সেই সুন্দরীর জন্যে।

পাঁচ গোরুর মালিক বুড়ির কাছে এল সেই নয় সওয়ার। কন্যের রূপ দেখে তারা মরে। তারপর চৈতন্য ফিরতেই বেরিয়ে গেল সবাই। রইল শুধু তাদের মধ্যে সবচেয়ে যে মান্যগণ্য।

বলে, 'ক্ষুদে বুড়ি, তরুণ ব্যাধ খার্জিং-বের্গেনের হাতে মেয়েটিকে সম্প্রদান করো!'

'বেশ দেব,' বললে ক্ষুদে বুড়ি।

মেয়েটিকে শুধালে, যাবে নাকি সে।

মেয়েটি বলে, 'যাব।'

ক্ষুদে বুড়ি বলে, 'পণ চাই কিন্তু: গোরু ঘোড়া এনে ভরে দাও, মাঠে আমার যেন ঠাঁই না থাকে।'

তাই গোরু ঘোড়া এনে দিলে তার মাঠে — এত যে আর গুনে শেষ হয় না।

তারপর সাজ পরালে মেয়েটিকে, সাজালে চটপট, মানানসই। আনা হল এক রঙচঙে ঘোড়া। মুখে তার রুপোর লাগাম, পিঠে রুপোর জিন, পেটের কাছে এক রুপোর চাবুক। কনের হাত ধরে নিয়ে এল খার্জিং-বের্গেন, রঙচঙে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে চলল ঘরের পানে।

যেতে যেতে হঠাৎ দেখে শেয়াল। ধৈর্য ধরতে আর পারে না। বলে:

'তাইগায় চললাম শেয়াল মারতে। শিগগির ফিরব। আর তুমি যেয়ো এই পথ ধরে। এ পথ গেছে দু'দিকে। পুবের পথে টাঙানো আছে নেউলের চামড়া, আর পশ্চিমের পথে আছে সাদা গর্দানওয়ালা এক ভালুকের চামড়া। ও পথে যেয়ো না। সেই পথে যাবে যেখানে আছে নেউলের চামড়া।'

এই বলে ঘোড়া ছুটিয়ে গেল।

একা একাই এগিয়ে গেল মেয়ে, পৌঁছল সেই জায়গাটায় যেখানে দু'দিকে ভাগ হয়ে গেছে রাস্তা। পৌঁছে কিন্তু সে ভুলে গেল কী বলেছিল খার্জিং-বের্গেন। যেদিকে ভালুকের চামড়া ঝোলান সেই পথ ধরে সে এগিয়ে এসে পৌঁছল এক মস্ত লোহার ছাউনিতে।

ছাউনি থেকে বেরুল এক প্রেতকন্যে, গায়ে তার লোহার পোশাক, একটিমাত্র অষ্টবক্র পা, একটিমাত্র অষ্টবক্র হাত, কপালের ঠিক মাঝখানে একটিমাত্র বিদঘুটে ঘোলাটে চোখ আর কুচকুচে কালো লম্বা জিভটা তার নেমে এসেছে বুক পর্যন্ত।

মেয়েটিকে ধরে প্রেতকন্যে তাকে নামাল ঘোড়া থেকে, তার মুখের চামড়া টেনে ছিঁড়ে বসালে নিজের মুখে, গায়ের সব সাজসজ্জা অলঙ্কার খুলে নিজে পরলে,

ছাউনি পার করে ছুড়ে দিলে মেয়েটিকে আর রঙচঙে ঘোড়ায় চেপে নিজে যাত্রা করলে পুবমুখো।

খার্জিৎ-বের্গেনের বাপের ছাউনি পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে সে, তখন এসে তার সঙ্গ ধরলে খার্জিৎ-বের্গেন। কিছুই সে খেয়াল করলে না, কিছুই টের পেলে না।

কন্যে বরণ করতে জুটল সব আত্মীয়স্বজন। ঘোড়ার খুঁটির কাছে ছুটে এল নয় কুমার — বধূ বরণ করবে। ঘোড়ার খুঁটির কাছে ছুটে এল আট কুমারী — বধূ বরণ করবে। কুমারীরা বলে:

'কন্যে কথা বললেই না জানি তার মুখ থেকে পুঁতি ঝরে পড়বে মাটিতে!'

সে পুঁতির মালা গাঁথবে বলে সুতো নিয়ে এল তারা।

কুমাররা ভাবলে:

'কন্যে চরণ ফেললেই কালো নেউল ছুটবে তার পেছু পেছু।'

সে নেউল মারবে বলে তীর ধনুক নিয়ে এল তারা।

কথা কইলে কন্যে — মুখ থেকে তার ঝরে পড়ল ব্যাঙ। চরণ ফেললে কন্যে — ছুটে গেল যত নেড়ী বাদামী আর্মিন। বরণ করতে যারা এসেছিল সবাই হতভম্ব, সবারই মন খারাপ।

ঘোড়ার খুঁটি থেকে ছাউনি পর্যন্ত সবুজ ঘাস পেতে দিলে তারা। কন্যের হাত ধরে ঘরে তুললে তাকে।

ঘরে ঢুকল কন্যে, কাঁচ লার্চ গাছের তিনটে শাখা দিয়ে আগুন জ্বালালে। তারপর শুরু হল বিয়ের ভোজ। খানাপিনা, লীলাখেলা, হাসিঠাট্টা চলল। বৌ বদলের কথাটা কারো মনেও উঁকি দিল না।

ক্ষুদে বুড়ি এদিকে তার মাঠে গেছে গোরু দুইতে। দেখে, ঠিক সেই আগের জায়গায় নতুন এক পাঁচ শিষের ফার্ণ ঘাস — আগের চেয়েও এটি সুন্দর।

তার মূল সমেত ঘাসটি তুলে বুড়ি ছাউনিতে এসে রেখে দিলে বালিশের উপর। তারপর গিয়ে গোরু দুইতে বসল। শোনে ছাউনির ভেতর ঠুন্‌ঠুন্ ঘণ্টা। ছাউনির ভেতর ঢুকে দেখে বসে আছে সেই পরমা সুন্দরী কন্যে — এবার যেন আরো রূপবতী।

'সে কী, এলি কখন, ফিরলি কী করে?' জিজ্ঞেস করলে ক্ষুদে বুড়ি।

কন্যে বললে, 'জানো মা, থার্জিৎ-বের্গেন আমায় যখন নিয়ে যায় তখন বলে: 'আমি চললাম শেয়াল মারতে, আর তুমি যেয়ো সেই পথ ধরে যার মুখে ঝোলানো আছে নেউলের চামড়া। যে রাস্তায় ভালুকের চামড়া ঝোলানো সে দিকে যেয়ো না।' ভুল করে আমি ওই পথ ধরেই গিয়ে পৌঁছই এক লোহার ছাউনির কাছে। প্রেতকন্যে বেরিয়ে এসে আমার মুখের চামড়া তুলে নিয়ে নিজের মুখ ঢাকে। আমার সাজসজ্জা কেড়ে নিয়ে নিজে পরে, আমায় ছুঁড়ে দেয় লোহার ছাউনি পার করে। তারপর চলে গেল আমার রঙচঙে ঘোড়াটার পিঠে চেপে। ছেয়ে-ছেয়ে সব কুকুর আমায় কামড়ে ছিঁড়ে টেনে নিয়ে আসে তোমার ছাউনির কাছের বড়ো মাঠটায়। সেখানে আমি ফার্ণ ঘাস হয়ে বেড়ে উঠেছি। এবার থার্জিৎ-বের্গেনের দেখা পাই কী করে, মা?'

ক্ষুদে বুড়ি সান্ত্বনা দিলে তাকে।

বলে, 'দেখা হবে, মিলন হবে, এখন আগের মতো আমার কাছে থাক আমার মেয়ে হয়ে!'

ক্ষুদে বুড়ির কাছে ফের বাস করতে লাগল মেয়েটি।

রঙচঙে ঘোড়া কিন্তু টের পেলে যে ঘাস-কন্যে বেঁচে উঠেছে। মানুষের গলায় সে থার্জিৎ-বের্গেনের বাপকে বলে:

'আসবার পথে থার্জিৎ-বের্গেন মেয়েটিকে একা রেখে যায়। মোড় পর্যন্ত গিয়ে যেখানে ভালুকের চামড়া ঝোলানো সেই পথে যায় মেয়েটি, গিয়ে পৌঁছোয় লোহার ছাউনির কাছে। ছাউনি থেকে প্রেতকন্যে বেরিয়ে আসে। তার মুখের চামড়া ছিঁড়ে নিয়ে নিজের মুখ ঢাকে, সাজসজ্জা কেড়ে নিয়ে নিজে সাজে গোজে, মেয়েটিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় লোহার ছাউনি পার করে। সেই প্রেতকন্যে রয়েছে তোমার ঘরে, তোমার বাড়ির বৌ হয়ে। আর আমার মালিক ফের বেঁচে উঠেছে, তাকে গিয়ে নিয়ে এসো ছাউনিতে, ছেলের হাতে তুলে দাও! নইলে সর্বনাশ হবে, প্রেতকন্যে তোমার চাল চুলো শেষ করবে, তোমায় বাঁচতে দেবে না, সবাই মারা পড়বে!'

এই শুনে বুড়ো ছুটে ঢুকল ছাউনির মধ্যে।

বলে, 'এ বৌ তুই কোত্থেকে আনলি ছেলে?'

'পাঁচ গোরুর মালিক ক্ষুদে বুড়ির মেয়েকে এনেছি।'

বাপ বললে:

'রঙচঙে ঘোড়া আমায় সব নালিশ করে বলেছে। বলে, মেয়েটিকে তুই একা ফেলে গিয়েছিলি। বলে, দুই রাস্তার মোড় পর্যন্ত সে গিয়ে লোহার ছাউনির পথ ধরে। প্রেতকন্যে তাকে ঘোড়া থেকে টেনে নামায়, তার মুখের চামড়া ছাড়িয়ে নিজের মুখ ঢাকে তার সাজসজ্জায় নিজে সাজে। সবাইকে ঠকিয়েছে, ছলনা করে ঘরে উঠেছে! ক্ষুদে বুড়ির কাছে গিয়ে কন্যে ফেরত দিতে বল! ঘরে নিয়ে আয় তাকে! আর প্রেতকন্যেকে বুনো ঘোড়ার লেজে বেঁধে খেদিয়ে দে মাঠে। সেইখানেই তার হাড়গোড় ছড়াক! নইলে আমাদের সবাইকে সে মারবে — মানুষ পশু বাদ যাবে না!'

প্রেতকন্যের কানে গেল সে কথা। রাগে কালিন্দি হয়ে উঠল সে।

খার্জিৎ-বের্গেনের কানে গেল সে কথা। রাগে লাল হয়ে উঠল সে। প্রেতকন্যেকে পাকড়ে পর্দার পেছন থেকে পা ধরে টেনে এনে তাকে বাঁধলে বুনো ঘোড়ার লেজের সঙ্গে।

খোলা মাঠে ছুটে গেল ঘোড়া, চাঁট মারতে লাগল প্রেতকন্যেকে। তার কালো দেহ হয়ে উঠল যত সাপখোপ কৃমিকীটের স্তূপ। লোকে তা কুড়িয়ে কুড়িয়ে পোড়ালে।

তারপর খার্জিৎ-বের্গেন ছুটল ক্ষুদে বুড়ির কাছে। ঘোড়ার খুঁটির কাছে নামলে ঘোড়া থেকে। ক্ষুদে বুড়ি তাই দেখে ছুটে বেরুল ছাউনি থেকে, আনন্দ আর ধরে না। যেন হারানো রতন ফিরে পেয়েছে, মরা মানুষ বেঁচে উঠেছে। ঘোড়ার খুঁটি থেকে ছাউনি পর্যন্ত সবুজ ঘাস পেতে দিলে, সব সেরা হৃষ্টপুষ্ট গোরুটিকে জবাই করলে, সব সেরা মাংসল ঘোড়াটিকে কাটলে, বিয়ের ভোজ রাঁধতে বসলে।

ঘাস-কন্যা খার্জিৎ-বের্গেনের দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেললে:

'এলে কেন তুমি, কেন এলে? আটপেয়ে প্রেতের কন্যেকে তুমি আমার রক্তপাত করতে দিয়েছ, গায়ের নরম চামড়া ছাড়াতে দিয়েছ, আমায় ফেলে গেছ ছেয়ে

কুকুরের মুখে... এরপরে আবার এখানে বৌ নিতে আসো কী মুখে? ভেটকি মাছের চেয়েও কন্যে বেশি, উত্তুরে মাছের চেয়েও নারী বেশি। তাদের মধ্যে যাকে খুশি বৌ করো! আমি তোমার ঘরে যাব না!'

খার্জিৎ-বের্গেন বলে, 'আটপেয়ে প্রেতের কন্যের হাতে আমি তো তোমায় দিই নি! ছেয়ে কুকুরের মুখে ফেলে যাই নি! আমি বনে গিয়েছিলাম শেয়াল মারতে, পথ তোমায় বলে গিয়েছিলাম। আমি তো বলি নি, 'যাও মরো গে তুমি!' '

ক্ষুদে বুড়ি তখন এপাশ থেকে ওপাশ থেকে তার দুচোখের জল মুছিয়ে বসলে খার্জিৎ-বের্গেন আর ঘাস-কন্যার মাঝখানে:

'মরা মানুষ বেঁচে উঠল, হারানো ধন ফিরে এল, তারপরেও আনন্দ নেই কেন তোমাদের? ফের দুঁহু দোঁহা ভালোবাসো, মিলেমিশে ঘরকন্না করো! কেউ তোমরা আমার কথার অবাধ্য হয়ো না!'

ঘাস-কন্যা মেনে নিয়ে নরম গলায় বললে:

'বেশ, অবাধ্য হব না তোমার। সব কথা ভুলে যাব!'

খার্জিৎ-বের্গেন তখন লাফিয়ে উঠে নৃত্য করে, আনন্দ করে, চুমু খায়, কোলাকুলি করে। তারপর রঙচঙে ঘোড়ায় চাপালে রুপোর জিন, মুখে পরালে রুপোর লাগাম, রুপোর সাজে ঢেকে দিলে, রুপোর চাবুক হাতে নিলে। ঘাস-কন্যাকে সাজিয়ে গুছিয়ে রওনা দিলে ঘরমুখো।

অনেক দিন ধরে চলল তারা। বরফ পড়তে দেখে বুঝলে শীত; বৃষ্টি পড়তে দেখে বুঝলে গরম, কুয়াসা দেখে বুঝলে শরৎ। এমনি করেই পথ কাটল তাদের।

শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছল বাপের ছাউনিতে।

আত্মীয়স্বজনেরা সবাই, খার্জিৎ-বের্গেনের নয় ভাই সবাই জুটল বরণ করতে। ঘোড়ার খুঁটি থেকে ছাউনি পর্যন্ত তারা সবুজ ঘাস বিছিয়ে দিলে।

ভাবে, 'বৌ এসে যেই চরণ ফেলবে, অমনি তার পায়ে পায়ে ছুটে যাবে নেউল।'

তার জন্যে তীর ধনুক বানাতে বসল তারা, বানাতে বানাতে হাতের ছাল ছড়ে গেল।

আট বোন সুতো পাকাতে বসল, পাকাতে পাকাতে আঙুলের ছাল ছড়ে গেল। বরণের জন্যে কাল গোনে আর ভাবে:

'এসে যেই কথা কইবে অমনি সব রাঙা পুঁতি ঝরে পড়বে মুখ থেকে!'

কন্যে নিয়ে এসে পৌঁছল খার্জিৎ-বের্গেন। ঘোড়ার খুঁটির কাছে দুই কুমারী ছুটে গিয়ে লাগাম ধরলে ঘোড়ার। কন্যের হাত ধরে ঘোড়া থেকে নামালে। কন্যে কথা কয়ে উঠল অমনি রাঙা পুঁতি ঝরে পড়ল। কুমারীরা সব কুড়িয়ে নিয়ে মালা গাঁথতে বসল। ছাউনির দিকে চরণ ফেললে কন্যে — কালো নেউল ছোটাছুটি করলে তার পায়ে পায়ে। বাণ মারতে লাগল কুমারেরা।

ছাউনির ভেতর এল কন্যে — কচি লার্চ গাছের তিনটে শাখা নিয়ে আগুন জ্বালালে।

ধুমধাম করে বিয়ের ভোজ লাগল। গ্রাম গ্রামান্তর থেকে অতিথ এল, গাইয়ে এল, নাচিয়ে এল, কথক এল, মল্ল এল, খেলুড়ে এল...

ভোজ শেষ হল তিন দিন পরে, অতিথ কুটুম চলে গেল। বৌয়ের সঙ্গে বাস করতে লাগল খার্জিৎ-বের্গেন। দিন কাটালে তারা মিলেমিশে সুখে স্বচ্ছন্দে অনেক কাল ধরে। লোকে বলে, নাতিপুতিরা নাকি এখনো বেঁচে আছে তাদের।

সোনার পেয়ালা

(বুরিয়াৎ কাহিনী)



লোকে বলে, অতীত কালে ছিল এক সানাদ খাঁ।

একদিন নিজের সব লোকজন নিয়ে সে ঠিক করলে অন্য কোনো জায়গায় উঠে যাবে, যেখানে বসতির জায়গা বেশ ভালো, চারণ মাঠ অঢেল। কিন্তু সে দেশে যেতে অনেকটা পথ, অনেক দুঃখকষ্ট।

রওনা দেবার আগে খাঁ সমস্ত বুড়োদের মেরে ফেলার হুকুম দিলে।

বললে, 'বুড়োরা পথের বাধা! আমাদের সঙ্গে কোনো বুড়ো থাকা চলবে না, একটা বুড়োও যেন বেঁচে না থাকে! আমার হুকুম যে মানবে না সে কঠিন শাস্তি পাবে!'

লোকেদের যতই কষ্ট হোক, নিষ্ঠুর খাঁয়ের হুকুম মানতেই হল। সবাই ভয় করত খাঁকে, তার হুকুম অমান্য করার সাহস হল না কারো।

কেবল একজন, সানাদ খাঁয়ের প্রজা, তরুণ সিরেন নিজের বুড়ো বাপকে মারলে না।

বাপের সঙ্গে যুক্তি করলে ছাগলের চামড়ার এক মস্ত বস্তায় লুকিয়ে রাখবে, খাঁকে না জানিয়ে, কাউকে না জানিয়ে তাকে নিয়ে যাবে নতুন বসতিতে। তারপর যা হয় হবে...

সানাদ খাঁ তার সব লোকজন গোরু ঘোড়া তুলে নিয়ে যাত্রা করলে দক্ষিণ থেকে উত্তরে — কোন এক দূর দেশের দিকে। আর তাদের সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে ছাগলের চামড়ার এক মস্ত বস্তার মধ্যে চলল সিরেনের বুড়ো বাপ।

সবাইকে লুকিয়ে লুকিয়ে সিরেন খানাপিনা দিত বাপকে, আর যখন সবাই থামত তখন একেবারে অন্ধকার হয়ে এলে বাপকে বার করে দিত; তখন হাত পায়ের আড়িমুড়ি ভাঙত বাপ, একটু জিরিয়ে নিত।

এই ভাবে অনেকদিন ধরে চলে তারা এসে পেঁছিল এক বিরাট সাগরের কাছে। সানাদ খাঁ সেখানে রাতের জন্যে ছাউনি ফেলার হুকুম দিলে।

খাঁয়ের একজন অনুচর সমুদ্রের একেবারে তীরে এসে দেখে সাগরের তলে কী যেন ঝকমক করছে। ভালো করে তাকিয়ে দেখে — আশ্চর্য ছাঁদের এক মস্ত সোনার পেয়ালা। অনুচর সঙ্গে সঙ্গেই খাঁয়ের কাছে এসে জানালে যে সাগরের তলায় একেবারে তীরের কাছে রয়েছে এক মহামূল্য সোনার পেয়ালা।

এক মুহূর্ত না ভেবে সানাদ খাঁ হুকুম দিলে পেয়ালাটা নিয়ে আসতে। কিন্তু নিজে থেকে কেউ সমুদ্রের তলে ডুব দিতে রাজী হল না।

খাঁ তখন হুকুম দিলে লটারি করতে।

লটারিতে ভার পড়ল খাঁয়ের এক প্রজার ওপর। ডুব দিল সে কিন্তু ফিরে আর এল না।

ভার পড়ল আর একজনের ওপর। সাগরের খাড়াই পাড়ের ওপর থেকে সে ঝাঁপ দিলে, আর ওই সাগরের বুকেই রয়ে গেল...

সানাদ খাঁয়ের অনেক লোক এই ভাবে মারা পড়ল সমুদ্রে।

কিন্তু নির্মম খাঁ তার হুকুম থেকে নড়ে না। তার আদেশে তার বিশ্বস্ত প্রজারা একের পর এক সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে মারা পড়ল।

শেষ পর্যন্ত সোনার পেয়ালার জন্যে ঝাঁপ দেবার পালা পড়ল সিরেনের ওপর। তার বাপকে যেখানে লুকিয়ে রেখেছিল সেখানে গিয়ে সে বিদায় নিলে।

বললে, 'বিদায় দাও বাবা! চলি, আমারও মৃত্যু, তোমারও মৃত্যু...'

বুড়ো জিজ্ঞেস করলে, 'কেন, কী হল? তোর মরবার কী হল?'

সিরেন বাপকে বললে, লটারির পালায় তাকে সোনার পেয়ালার জন্যে ঝাঁপ দিতে হবে সাগরে।

শেষে বললে, 'আর সেখান থেকে কেউ ফেরে নি। খাঁয়ের আদেশে আমি তাই সাগরে মরব, আর তোমায় এখানে খুঁজে পেয়ে মারবে খাঁয়ের লোকেরা...'

বুড়ো সব শুনে বললে:

'আরে বোকার দল! সবাই তোরা সাগরে তলিয়ে যাবি, সোনার পেয়ালা আর পাবি না। ও পেয়ালা যে সাগরের তলে নেই। ওই পাহাড়টা দেখছিস, সাগরের একটু দূরেই যা দাঁড়িয়ে আছে? সোনার পেয়ালাটা আছে ওই পাহাড়ের চুড়োয়। যেটাকে পেয়ালা বলে ভাবছিস সেটা কেবল তার ছায়া। এটা তোরা আর ধরতে পারলি না?'

সিরেন বললে, 'তাহলে কী করব আমি?'

'পাহাড়ে গিয়ে ওঠ, সেখান থেকে পেয়ালাটা নিয়ে খাঁকে এনে দে। পাহাড়ে গিয়ে সেটা খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। পেয়ালার ঝলকানি দূর থেকেই নজরে পড়বে। তবে পেয়ালা হয়ত এমন অগম চুড়োয় আছে যেখানে ওঠা তোর সাধ্য নয়। তাহলে করবি কি, সবুর করে দেখবি, সেখানে হরিণ-টরিণ আসছে কি না। হরিণের পাল এলেই তাদের ভয় পাইয়ে দিবি। ছোটাছুটি করে পালাতে গিয়ে তারা পেয়ালায় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে। অমনি চট করে তা লুফে নিবি নইলে কোনো অতল আঁধার খাদের মধ্যে পড়ে যেতে পারে!'

সিরেন তক্ষুনি রওনা দিলে পাহাড়ে।

পাহাড়ের চুড়োয় ওঠা তার সহজ হয় নি। ঝোপঝাড় গাছপালা শিলাপাথর ধরে ধরে সে ওঠে, হাত পা ছড়ে গিয়ে রক্ত বেরয়, পোশাক আশাক ছিঁড়ে যায়।

শেষ পর্যন্ত প্রায় চুড়োর কাছে গিয়ে দেখে, একটা উ'চু অগম শিখরের ওপর ঝকঝকে এক চমৎকার সোনার পেয়ালা।

সিরেন দেখলে শিখরে ওঠা তার অসাধ্য। তখন বাপের পরামর্শ মতো অপেক্ষা করে রইল কখন হরিণের পাল আসে সেখানে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না: কয়েকটা হরিণ দেখা গেল শিখরে। শান্তভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা তাকিয়ে দেখছিল নিচে। প্রাণপণে হাঁকডাক লাগলে সিরেন। হরিণগুলো ভয় পেয়ে ছোটাছুটি করতে গিয়ে ধাক্কা মারলে সোনার পেয়ালায়। পেয়ালা গড়িয়ে পড়তে লাগল নিচে, সিরেন খপ করে ধরে ফেললে সেটাকে।

পেয়ালাটা হাতে নিয়ে আনন্দ করে সে নিচে নেমে এল। সানাদ খাঁয়ের কাছে গিয়ে তার সামনে রাখলে পেয়ালাটি। খাঁ জিজ্ঞেস করলে:

'সাগর থেকে এ পেয়ালা তুই তুললি কেমন করে?'

সিরেন বললে, 'সাগর থেকে তুলি নি, নিয়ে এসেছি পাহাড়ের চুড়ো থেকে। সাগরে ছিল কেবল তার ছায়াটা।'

'কে তোকে বললে সে কথা?'

'নিজেই আন্দাজ করেছি,' বললে সিরেন।

খাঁ আর কিছু জিজ্ঞেস না করে বিদায় দিলে তাকে।

পরদিন লোকজন নিয়ে সানাদ খাঁ ফের রওনা দিলে।

অনেক দিন ধরে পাড়ি দিয়ে তারা এসে পেশছল এক ধু-ধু মরুভূমির কাছে। রোদে মাটি পোড়া, ঘাস জ্বলে গেছে, আশেপাশে কোথাও একটা নদী নেই, ঝর্ণা নেই। ভয়ানক তেষ্টায় লোকজন গোরু ঘোড়া মরে। জলের খোঁজে খাঁয়ের লোকেরা ছুটল দিগ্বিদিকে কিন্তু জল আর পায় না — চারিদিকে কেবল শুকনো পোড়া মাটি। আতঙ্ক হল লোকেদের, বুঝে পায় না কী হবে, কী করবে...

সিরেন তখন চুপি চুপি বাপের কাছে এসে বললে:

'কী করি বলো বাবা! জলের অভাবে লোকজন গোরু ঘোড়া সব মরছে!'

বুড়ো বললে:

'একটা তিনবছুরে গোরু ছেড়ে দিয়ে তার পেছন পেছন যা। যেখানে থেমে মাটি শুঁকবে সেইখানে খুঁড়িস।'

সিরেন ছুটে গিয়ে একটা তিনবছুরে গোরু ছেড়ে দিলে। গোরুটা মুখ নামিয়ে এদিক ওদিক হাঁটতে লাগল। শেষ পর্যন্ত এক জায়গায় থেমে ভয়ানক শব্দ করে শুকনো মাটি শুঁকতে লাগল।

সিরেন বললে, 'এইখানে খোঁড়ো!'

লোকে খুঁড়তে শুরু করে দিলে। কিছু পরেই মিলল এক মস্ত ভূগর্ভ স্রোত। মাটি থেকে বইছে ঠাণ্ডা নির্মল জল। সবাই প্রাণভরে খেলে, আনন্দ আর ধরে না।

সানাদ খাঁ সিরেনকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলে:

'এমন শুখা জায়গায় তুই মাটির তলের জল খুঁজে পেলি কী করে?'

সিরেন বললে:

'বার করলাম লক্ষণ দেখে...'

লোকে প্রাণভরে জল খেয়ে বিশ্রাম নিয়ে ফের রওনা দিলে।

অনেক দিন যাবার পর তারা এক জায়গায় ডেরা বাঁধলে। রাত্রে হঠাৎ ভয়ানক বৃষ্টি এসে সব আগুন নিভে গেল। যত চেষ্টা করে কিছুতেই আর আগুন জ্বালাতে পারে না কেউ। ভিজে স্যাঁৎসেঁতে সবাই, ঠাণ্ডায় হিম — কী করবে কেউ কিছু ভেবে পায় না।

শেষ পর্যন্ত কার যেন নজরে পড়ল দূরের একটা পাহাড়ের চুড়োয় আগুন জ্বলছে।

সানাদ খাঁ হুকুম দিলে, এক্ষুনি গিয়ে আগুন নিয়ে আসতে হবে পাহাড় থেকে।

খাঁয়ের হুকুম তামিল করতে ছুটল লোকে। একের পর এক লোকে চলল পাহাড়ে। সবাই দেখলে ঘন ফার গাছের নিচে আগুন জ্বলছে, শিকারী তাতে গরম হয়ে নিচ্ছে। সবাই তারা জ্বলন্ত লাকড়ি নিল একটা করে, কিন্তু ডেরা পর্যন্ত পেঁৗছতে পারল না, বৃষ্টিতে সব নিভে গেল।

সানাদ খাঁ চটে উঠে হুকুম দিলে, যারা আগুন আনতে গিয়ে আনতে পারে নি, তাদের সবার শাস্তি হবে।

এবার আগুন আনার পালা পড়ল সিরেনের। বাপের কাছে গিয়ে সে শুধাল:

'এবার কী করা যায়? পাহাড় থেকে ডেরা পর্যন্ত আগুন নিয়ে আসি কী করে?'

বুড়ো বলল:

19-406

'জ্বলন্ত কাঠ নিস না — পথে যেতে যেতে তা সব নিভে যাবে, হয় পুড়ে যাবে নয় বৃষ্টিতে নিভে যাবে। সঙ্গে একটা মস্ত হাঁড়ি নে, তার মধ্যে যত পারিস অঙ্গার ভরে আনবি তাহলেই ডেরায় আগুন আনতে পারবি!'

বাপ যা বললে সিরেন তাই করলে। পাহাড় থেকে সে নিয়ে এল হাঁড়ি ভর্তি জ্বলন্ত অঙ্গার। লোকে ফের আগুন জ্বালালে, পোশাক আশাক শুকিয়ে গা হাত পা গরম করে খানা পাকাল।

কে আগুন এনেছে জেনে খাঁ তলব করলে সিরেনকে।

সিরেন আসতেই সানাদ খাঁ রেগে তাকে ধমকাতে লাগল:

'কী রকম লোক তুই? কী করে আগুন আনা যায় জানতিস অথচ এতক্ষণ মুখ বুজেছিলি? সঙ্গে সঙ্গে বললি না কেন কী ভাবে আগুন আনতে হবে?'

'আমি নিজেই যে জানতাম না...' বললে সিরেন।

'তাহলে পরে জানতে পারলি কী করে?' জেরা করলে সানাদ খাঁ।

এমন জেরা করতে লাগল খাঁ যে সিরেনকে শেষ পর্যন্ত কবুল করতে হল যে খাঁয়ের সব হুকুম সে তামিল করতে পেরেছে কেবল তার বুড়ো বাপের পরামর্শে।

'কোথায় তোর বাপ?' জিজ্ঞেস করলে খাঁ।

সিরেন বললে, 'সারা পথ আমি তাকে নিয়ে এসেছি চামড়ার এক মস্ত বস্তায় করে।'

খাঁ তখন বুড়োকে তলব করে বললে:

'আমার হুকুম বরবাদ। বুড়োরা বোঝা নয় জোয়ানের। বুড়ো হলেই তবে জ্ঞান। লুকিয়ে থাকতে হবে না, খোলাখুলিই সকলের সঙ্গে যাবে তুমি!'

পবন দেব

(নেনেৎস উপকথা)



এক ডেরায় ছিল বুড়ো। তার তিন মেয়ে। তার মধ্যে ছোটো মেয়েটি সবচেয়ে সুন্দরী, সবচেয়ে বুদ্ধিমতী।

বুড়োর দিন কাটত কায়ক্লেশে। ছাউনিটা ছিল ফুটোফাটা, খারাপ। গরম পোশাক আশাক কম। বেশি ঠাণ্ডা পড়লে সে মেয়েটিকে নিয়ে বসে বসে আগুন পোয়াত। রাতে আগুন নিভিয়ে শুতে যেত আর শীতে ঠক্‌ঠক্‌ করত সকাল পর্যন্ত।

একদিন মাঝ শীতে তুন্দ্রায় নামল এক মহা তুষার ঝড়। একদিন যায়, দু'দিন যায়, তিন দিন যায় — ঝড় আর থামে না, ছাউনি সব উড়িয়ে নিয়ে যায় আর কি। ছাউনি থেকে লোকে বেরুতে পারে না, উপোস দিয়ে বসে থাকে।

তিন কন্যা নিয়ে ছাউনিতে বসে আছে বুড়ো, ঝড়ের গর্জন শুনছে। বলে:

'এ ঝড় আমরা কাটিয়ে উঠতে পারব না! এ ঝড় পাঠিয়েছেন পবন দেব কতুরা। দেখছি, তাঁর রোষ হয়েছে, বোঝা যায় ভালোমতো একটি বউ চাই তাঁর। তুই বড়ো মেয়ে, তুই যা কতুরার কাছে, নইলে আমাদের গোটা জাত ধ্বংস পাবে। গিয়ে তাঁকে বলিস যেন ঝড় থামান!'

মেয়ে বলে, 'যাব কেমন করে? পথ যে জানি না!'

'আমি তোকে একটা ছোট্ট স্লেজ দেব। ঝড়ের উল্টোমুখে সেটায় ঠেলা দিবি, তারপর তার পেছু পেছু চলবি। ঝড়ে তোর পোশাকের বাঁধন খুলে যাবে, কিন্তু থামিস না, ফিরে বাঁধিস না। জুতোয় তোর বরফ ঢুকে যাবে কিন্তু দাঁড়াস না তুই, ঝাড়িস না। পথে দেখবি এক উঁচু পাহাড় — সেই পাহাড়ে উঠবি। সেইখানে থামবি, জুতো থেকে বরফ ঝেড়ে ফেলবি, পোশাকে বাঁধন দিবি। পাহাড়ের ওপরে উঠলে তোর কাছে উড়ে আসবে এক ছোট্ট পাখি। এসে তোর কাঁধে বসবে, তাড়িয়ে দিস নে, গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করিস। তারপর স্লেজে চেপে গড়িয়ে নামবি পাহাড় থেকে। স্লেজ তোকে নিয়ে যাবে সোজা কতুরার ছাউনির দোরে। ভেতরে ঢুকবি, কিছু ছুঁবি নে, বসে অপেক্ষা করবি। কতুরা এলে তিনি যা বলেন করবি।'

বড়ো মেয়ে পোশাক পরে স্লেজের পেছনে দাঁড়িয়ে ঝড়ের উল্টোমুখে ঠেলা দিয়ে এগিয়ে চলল।

কিছু দূর যায়, পোশাকের বাঁধন খসে পড়ল, শীত করতে লাগল। বাপের কথা না শুনে ফের বাঁধন দিতে লাগল সে। বরফ ঢুকল জুতোর মধ্যে। থেমে গিয়ে বরফ ঝাড়তে লাগল সে। তারপর এগিয়ে চলল সে ঝড়ের মুখে। অনেক দূর গিয়ে দেখে পাহাড়, উঠল তাতে। ছোট্ট পাখি উড়ে এল সেখানে, তার কাঁধে এসে বসতে চায়। মেয়েটি হাত নেড়ে তাড়া দিল পাখিকে। কয়েকবার পাক দিয়ে উড়ে চলে গেল পাখিটা। বুড়োর বড়ো মেয়ে তখন স্লেজে চাপল, গড়িয়ে নামল পাহাড় বেয়ে। স্লেজ থামল এক মস্ত ছাউনির কাছে।

ছাউনির ভেতর ঢুকল মেয়ে। দেখে কি — ছাউনির ভেতরে অগ্নিপক্ক হরিণের মাংস। আগুন উসকিয়ে দিয়ে মেয়েটি গরম হয়ে নিলে তারপর মাংস থেকে চর্বি চেঁছে তুলতে লাগল। চেঁছে তোলে আর খায়। চেঁছে তোলে আর খায়। অনেক

খেয়েছে হঠাৎ শোনে কে যেন ঢুকেছে ছাউনির ভেতরে। দরজায় ঝোলানো চামড়াটা তুলে ভেতরে ঢুকল এক তরুণ মহাদেহী। সেই হল কতুরা। মেয়েটিকে দেখে সে শুধায়:

'কোত্থেকে এসেছ? কী চাই তোমার এখানে?'

'তোমার কাছে আমায় পাঠিয়েছে আমার বাপ।'

'কেন পাঠিয়েছে?'

'তুমি আমায় বিয়ে করবে বলে।'

'ওঠো, এই যে মাংসটা শিকার করে এনেছি সেটা রান্না করে দাও।'

মাংস রান্না করে দিলে মেয়েটি।

কতুরা বললে হাঁড়ি থেকে মাংস নিয়ে আধাআধি ভাগ করতে। বললে:

'অর্ধেকটা আমরা খাব আর বাকি অর্ধেকটা একটা বারকোশ করে নিয়ে যেয়ো পাশের ছাউনিতে। ভেতরে ঢুকো না, দুয়োরে দাঁড়িয়ে থেকো। এক বুড়ি বেরিয়ে আসবে। তাকে মাংসটা দিয়ে অপেক্ষা করো, যতক্ষণ না সে বারকোশ ফেরত দেয়।'

মাংস নিয়ে ছাউনি থেকে বেরিয়ে গেল মেয়েটি। ওদিকে ঝড় গর্জন করছে, বরফ ঝরছে, কিছুই দেখা যায় না। এমন তুষার ঝড়ে কে আবার খোঁজা-খুঁজি করে!.. মেয়েটি একপাশে সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলে তারপর মাংস ছুড়ে দিলে বরফে। কতুরার কাছে ফিরে এল শূন্য বারকোশ নিয়ে।

কতুরা তার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে:

'মাংস দিয়ে এসেছ?'

'হ্যাঁ।'

'বারকোশটা আনো তো, দেখি মাংসের বদলে তোমায় কী দিয়েছে।'

শূন্য বারকোশ দেখালে মেয়েটি। কতুরা কিছু না বলে খেয়ে দেয়ে শুল।

সকালে উঠে সে ছাউনির মধ্যে হরিণের কাঁচা ছাল এনে বললে:

'আমি শিকারে চললাম, তুমি ততক্ষণ এই ছাল খাস্তা করে আমার জন্যে নতুন পোশাক, জুতো আর দস্তানা সেলাই করে রেখো। ফিরে দেখব কী রকম কাজ জানো তুমি।'

কতুরা বেরিয়ে গেল তুন্দ্রায়, বুড়োর মেয়েটিও কাজ শুরু করলে। হঠাৎ ছাউনির ছালের পর্দা তুলে ভেতরে ঢুকলে এক সাদাচুলো বুড়ি।

বললে, 'ও মেয়ে, আমার চোখে কুটো পড়েছে, তুলে দে!'

মেয়ে বলে, 'আমার কাজে এখন ব্যাঘাত করো না, সময় নেই!'

বুড়ি কিছু না বলে ঘুরে চলে গেল। ছাউনির মধ্যে কেবল ঐ বুড়োর মেয়ে। ছালটা সে খাস্তা করে, ছুরি দিয়ে কাটে, তাড়াহুড়ো করে পোশাক তৈরি করতে বসে কতুরার। সেলাই করে যেমন তেমন — কেবলি তার তাড়াহুড়ো। একদিনের মধ্যে আবার ভালো করে সেলাই করা যায় নাকি! তাতে আবার সেলাই করার সুতোও নেই...

সন্ধ্যায় শিকার থেকে ফিরল কতুরা। জিজ্ঞেস করে:

'পোশাক তৈরি?'

'তৈরি।'

কতুরা হাত দিয়ে দেখে — চামড়া শক্ত, ভালো করে খাস্তা করা হয় নি। নজর করে দেখে — সব সেলাই বাঁকা ট্যারা, মাপসই নয়। রেগে উঠল কতুরা, বুড়োর মেয়েকে বার করে দিলে ছাউনি থেকে, ছুড়ে দিলে অনেক দূরের এক বরফ স্তূপের মধ্যে, সেইখানে শীতে জমে মারা গেল মেয়েটি।

বরফ ঝড় ওদিকে আরো গর্জন করে শুরু হয়েছে...

ছাউনির ভেতর বসে থাকে বুড়ো, শোনে দিন রাত ঝড়ের কী গর্জন। বলে:

'বড়ো মেয়ে আমার কথা শোনে নি! যা বলেছি তা করে নি! তাই ঝড় থামছে না, কতুরার রাগ হয়েছে। মেজো মেয়ে, তুই যা তাঁর কাছে!

ছোট্ট একটা স্লেজ বানালে বুড়ো, বড়ো মেয়েকে যা যা বলেছিল তাই বললে, পাঠালে তাকে কতুরার কাছে। নিজে বসে থাকে ছোটো মেয়েটিকে নিয়ে, কাল গোনে কখন ঝড় শান্ত হয়।

ঝড়ের উল্টোমুখে স্লেজ ঠেলে চলল মেজো মেয়ে। পথে তার পোশাকের বাঁধন খসে গেল, বরফ ঢুকল জুতোয়। শীত করতে লাগল। বাপের আদেশ ভুলে গিয়ে সে আগেভাগেই জুতোর বরফ ঝেড়ে ফেললে, জামার বাঁধন টেনে বাঁধলে।

পাহাড়ে উঠে দেখে পাখি। হাত নেড়ে তাকিয়ে দিলে তাকে। তারপর স্লেজে

বসে গড়িয়ে নামল পাহাড় বেয়ে, সোজা একেবারে কতুরার ছাউনিতে।

ছাউনিতে ঢুকে আগুন উসকিয়ে হরিণের মাংস খেয়ে কতুরার পথ চেয়ে বসে রইল।

শিকার থেকে ফিরে কতুরা দেখে এক কন্যে। বলে:

'কেন এসেছ আমার কাছে?'

'তোমার কাছে আমায় পাঠিয়েছে আমার বাবা।'

'কেন?'

'তুমি আমায় বিয়ে করবে বলে।'

'তাহলে বসে আছ কেন? খিদে পেয়েছে, শিগগির মাংস রান্না করো!'

মাংস রান্না হতে কতুরা বললে হাঁড়ি থেকে মাংস নিয়ে দু'ভাগ করতে।

বললে, 'এক ভাগ খাব আমরা, বাকি অর্ধেকটা একটা বারকোশ করে নিয়ে যাও পাশের ছাউনিতে। নিজে ভেতরে ঢুকো না, বারকোশ ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকো।'

মাংস নিয়ে বেরুল মেয়েটি। ওদিকে ঝড় গজরাচ্ছে, বরফ পাক মারছে, কিছুই দেখা যায় না... এগুতে ইচ্ছে হল না তার, বরফের ওপর মাংস ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে তারপর ফিরে এল।

'মাংস দিয়ে এসেছ তো?'

'হ্যাঁ, দিয়ে এসেছি।'

'এত তাড়াতাড়ি ফিরলে যে! দেখি তো বারকোশখানা, মাংসের বদলে কী তোমায় দিয়েছে!'

শূন্যি বারকোশের দিকে চেয়ে দেখলে কতুরা, কিছু বললে না। ঘুমুতে গেল। সকাল বেলায় ছাউনির মধ্যে হরিণের কাঁচা চামড়া এনে আগের মতোই বললে সন্ধ্যের মধ্যে একটা নতুন পোশাক সেলাই করে দিতে।

'সেলাই করে রেখো! সন্ধ্যেয় এসে দেখব কেমন তোমার কাজ।'

শিকারে গেল কতুরা, কাজে লাগল মেয়েটি। ভয়ানক তাড়াহুড়ো, যেমন তেমন যাই হোক, সন্ধ্যের আগেই সেলাই করে ফেলতে হবে। হঠাৎ ছাউনির মধ্যে ঢুকল সাদাচুলো বুড়ি।

বলে, 'ও মেয়ে, আমার চোখে কী পড়েছে তুলে দে তো, নিজে পারছি না।'

'তোমার চোখের কুটো তোলার আমার সময় নেই। হাতে আমার এমনিতেই অনেক কাজ, ব্যাঘাত করো না তো বাপু!'

কিছু না বলে চলে গেল বুড়ি। রাত হতে কতুরা ফিরল শিকার থেকে। বলে, 'পোশাক তৈরি তো?'

'তৈরি।'

'দাও পরে দেখি।'

পরে দেখলে। সব সেলাই বাঁকা ট্যারা, বিচ্ছিরি, গায়ে খাটো। ভয়ানক চটে উঠল কতুরা, বড়ো মেয়ের মতো মেজো মেয়েকেও সেই বরফের স্তূপে ছুড়ে ফেলে দিলে। সেইখানেই শীতে মারা গেল মেজো মেয়ে।

এদিকে ছোটো মেয়েটিকে নিয়ে বুড়ো বসে আছে ছাউনিতে, কখন ঝড় থামবে, ধৈর্য আর ধরতে পারে না। ঝড় কিন্তু আগের চেয়েও ফুঁসে উঠল, ছাউনি যায় যায়...

বুড়ো বললে, 'মেয়েরা আমার কথা শোনে নি; আরো খারাপ করেছে, রাগিয়ে দিয়েছে কতুরাকে। তুই আমার শেষ মেয়ে তবু কতুরার বৌ হবার জন্যে তোকেই পাঠাতে হচ্ছে। না পাঠালে লোকেরা সবাই যে খিদেয় মারা পড়বে। যাত্রা কর তবে!'

কী করে যেতে হবে, কী করতে হবে সব বুড়ো শিখিয়ে দিলে ছোটো মেয়েটিকে।

ছাউনি থেকে বেরুল মেয়েটি, স্লেজের পেছনে দাঁড়িয়ে বাতাসের উল্টোমুখে ঠেলা মারলে। ওদিকে ঝড় ফুঁসছে গজরাচ্ছে, উল্টে ফেলে দিতে চাইছে, দু'চোখ আঁধার — কিছুই দেখা যায় না!

ঝড় ঠেলে এগুচ্ছে মেয়ে, বাপের একটি কথাও সে ভোলে নি। যা যা বলেছে ঠিক তাই তাই করছে। জামার বাঁধন খসে গেল — সে বাঁধন বাঁধে না। জুতোয় বরফ ভরে উঠল। সে বরফ ঝাড়ে না। শীত করছে, বাতাসের উল্টো যাওয়া কত কষ্ট, তবু থামে না, কেবলি চলে। যেতে যেতে দেখা গেল পাহাড়। পাহাড়ে উঠল মেয়ে, তারপর থেমে জুতো থেকে বরফ ঝেড়ে ফেললে, জামার বাঁধন বেঁধে নিলে। তখন উড়ে এসে এক পাখি বসল তার কাঁধে। পাখি সে তাড়িয়ে দিলে না, পালকে

হাত বুলিয়ে আদর করলে। পাখি উড়ে গেল, মেয়ে তখন স্লেজে বসে পাহাড় গড়িয়ে নামল একেবারে কতুরার ছাউনিতে।

ছাউনির ভেতর ঢুকে অপেক্ষা করতে লাগল। হঠাৎ দরজায় ঝোলানো চামড়ার পর্দা তুলে ছাউনিতে ঢুকল এক তরুণ মহাদেহী — কতুরা। মেয়েটিকে দেখে হেসে বললে:

'কেন এসেছ বলো তো?'

'বাবা পাঠিয়েছে।'

'কেন?'

'তোমার কাছে মিনতি করে পাঠিয়েছে যেন ঝড় থামাও। নইলে আমাদের ডেরায় সব লোক মারা পড়বে।'

'বসে আছ কেন, আগুন জ্বালাবে না, মাংস রাঁধবে না? খিদে পেয়েছে আমার, তুমিও দেখছি এসে থেকে কিছু খাও নি।'

তাড়াতাড়ি মাংস রাঁধলে মেয়েটি। হাঁড়ি থেকে মাংস নিয়ে খেতে দিলে কতুরাকে। কতুরা খেয়ে দেয়ে বললে, অর্ধেক মাংস যেন সে পড়শীর ছাউনিতে দিয়ে আসে।

মাংসের বারকোশ নিয়ে মেয়েটি বেরুল ছাউনি থেকে। চারিদিকে ঝড় ফুঁসছে, বরফ পাক দিচ্ছে, ঘূর্ণি বইছে আরো জোরে। যাবে কোন দিকে, কোথায় সে ছাউনি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলে মেয়েটি তারপর এগিয়ে চলল।

কোথায় চলেছে নিজেই জানে না... হঠাৎ উড়ে এল সেই পাখিটি, যে তার কাঁধে এসে বসেছিল পাহাড়ে। ঠিক তার মুখের কাছে ফরফরিয়ে উড়তে লাগল। মেয়েটি চলল পাখির পেছন পেছন। যেদিকে পাখি উড়ে যায়, সেইদিকেই সে পা চালায়। যেতে যেতে হঠাৎ দেখে একদিকে আগুনের ফুলকি দেখা যাচ্ছে। খুশি হয়ে সেই দিকে এগিয়ে গেল মেয়েটি, ভাবলে ঐ বুঝি ছাউনি। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখে কোথায় ছাউনি, দেখা যায় কেবল একটা বড়ো সড়ো ঝোপের মতো। সেই ঝোপ থেকে ধোঁয়া উঠছে। ঝোপের চারধার ঘুরে দেখলে মেয়েটি, পা দিয়ে ছুঁয়ে দেখলে — হঠাৎ দরজা দেখা গেল। মুখ বাড়িয়ে এক সাদাচুলো বুড়ি জিজ্ঞেস করল:

'কে তুই, কী চাই?'

'মাংস এনেছি, দিদিমা, কতুরা তোমায় দিতে বলেছে।'

'কতুরা বলেছে? তবে দে, আর তুই এইখানে দাঁড়িয়ে থাক।'

ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে মেয়ে। দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। শেষ পর্যন্ত ফের দুয়োর খুলল। মুখ বাড়িয়ে বুড়ি তাকে বারকোশ ফেরত দিলে। বারকোশ ভরা দারচিনির মতো কী সব জিনিসে। মেয়ে ফিরে এল কতুরার কাছে।

কতুরা জিজ্ঞেস করলে, 'এতক্ষণ কোথায় ঘুরছিলে? ছাউনি খুঁজে পেয়েছ?'

'পেয়েছি।'

'মাংস দিয়েছ?'

'দিয়েছি।'

'বারকোশটা আনো তো, দেখি তাতে কী আছে।'

কতুরা দেখে, বারকোশের মধ্যে রয়েছে ছুরি, আঁচড়া, ঝাড়ন — চামড়া খাস্তা করার সব উপকরণ, রয়েছে লোহার সুঁই। হাসলে কতুরা:

'ভালো ভালো সব জিনিস দিয়েছে তোমায়, কাজে লাগবে!'

সকালে কতুরা উঠে ছাউনির মধ্যে নিয়ে এল এক হরিণের কাঁচা চামড়া। বললে, সন্ধ্যা নাগাদ তার জন্য একেবারে নতুন পোশাক জুতো আর দস্তানা সেলাই করে দিতে হবে।

'ভালো করে সেলাই করলে তোমায় বিয়ে করব!'

চলে গেল কতুরা। মেয়েটি বসলে তার কাজ নিয়ে। বুড়ির উপহার ভারি কাজে লাগল তার। সেলাইয়ের উপকরণ সবই আছে তাতে। একদিনে কাজ হবে কত!.. সত্যি মেয়েটি ভাবে কম, করে বেশি। চামড়া ঘষে, বানায়, কাটে, সেলাই করে। হঠাৎ দুয়োরের চামড়ার পর্দা তুলে ঢোকে সেই বুড়ি, যাকে সে মাংস দিয়ে এসেছিল।

বুড়ি বলে, 'একটু দ্যাখ তো মেয়ে, চোখ থেকে কুটোটা একটু বার করে দে। নিজে নিজে আর পারি না!'

আপত্তি করলে না মেয়েটি। একপাশে সেলাই ফোঁড়াই সরিয়ে রেখে চোখের কুটো তুলতে বসল।

বুড়ি বলে, 'ঠিক আছে, চোখ আর কর্‌কর্‌ করছে না। এবার আমার ডান কানটা একটু দ্যাখ তো!'

মেয়ে তার ডান কানে তাকিয়ে দেখে ভয় পেয়ে গেল।

'কী দেখলি সেখানে?' জিজ্ঞেস করে বুড়ি।

'তোমার কানের মধ্যে বসে আছে এক মেয়ে।'

'চুপ করে আছিস কেন, ওকে ডাক দে। কতুরার পোশাক বানাতে সে তোকে সাহায্য করবে।'

বুড়োর মেয়ের আনন্দ আর ধরে না; ডাক দিলে মেয়েটিকে। ডাক শুনে বুড়ির কান থেকে বেরিয়ে এল একটি নয়, চার চারটি যুবতী মেয়ে, চার জনেই কাজে লেগে গেল: কেউ চামড়া ঘষে, খাস্তা করে, কেউ কাটে, কেউ ফোঁড় করে, চটপট তৈরি হয়ে গেল পুরো পোশাক। বুড়ি তখন মেয়েগুলিকে ফের কানের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে চলে গেল।

সন্ধ্যায় শিকার থেকে ফিরে কতুরা শুধোয়:

'যা বলেছিলাম সব করেছ তো?'

'সব।'

'দাও তো, মাপ দিয়ে দেখি!'

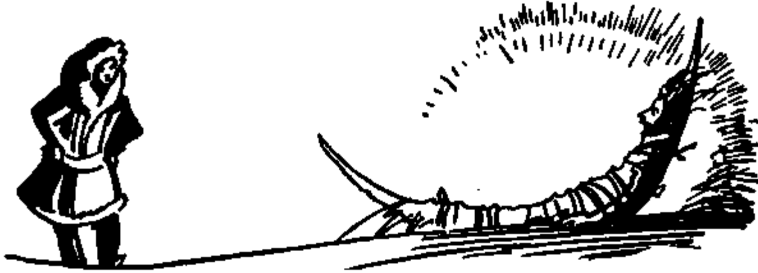
পোশাক আশাক হাতে নিয়ে দেখলে কতুরা — তুলতুল করছে। গায়ে পরে দেখলে: আঁট নয়, ঢিলা নয়, যেমনটি চাই তেমনি, যেমন পাকা সেলাই তেমনি সুন্দর। হেসে বললে কতুরা:

'ভালো লেগেছে কন্যে তোমায়! আমার মা, আমার চার বোনেরও পছন্দ হয়েছে। কাজ করতে পারো ভালো; সাহসও আছে, তোমার জাতের লোকেরা যাতে না মারা পড়ে তার জন্যে ভয়ংকর ঝড় ঠেলে তুমি এসেছ। বৌ হয়ে থাক আমার ছাউনিতে!'

বলতেই ঝড় থেমে গেল তুন্দ্রায়। ঘরে বসে থাকা সাঙ্গ হল, কনকনে শীত দূর হল। ছাউনি থেকে বেরিয়ে এল সব লোকে!

কন্যা ও চন্দ্রকলা

(চুকচি উপকথা)



চুকচিদের মধ্যে ছিল একটি লোক, তার এক কন্যে। সে কন্যে বাপের অন্ধের নড়ি। গরম কালে সে তাদের পশুপাল নিয়ে চরাতে যায় ডেরা থেকে অনেক দূরে, আর শীত পড়লে চলে যায় আরো দূরে। খাবার জন্যে তার বল্গা হরিণ-ষাঁড়ে চেপে সে ডেরায় ফেরে ক্কচিৎ কদাচিৎ।

একদিন তার বল্গা হরিণ মাথা তুলে আকাশের দিকে চেয়ে বলে:

'দ্যাখ, দ্যাখ!'

আকাশের দিকে চেয়ে কন্যে দেখে — দুই বল্গা হরিণের স্লেজে চেপে চন্দ্রকলা নেমে আসছে।

'কোথায় যাচ্ছে ও, কেনই বা নামছে?' জিজ্ঞেস করে মেয়েটি।

হরিণ বলে, 'তোকে হরণ করবে!'

ভয় পেল কন্যে।

'কী করি এখন! আমায় যে নিয়ে যাবে!'

বল্গা হরিণ খুর দিয়ে বরফ খুঁড়ে গর্ত করলে। বলে:

'শিগগির এইখানে এসে বস!'

কন্যা বসলে, হরিণ তাকে বরফ চাপা দিলে। কোথায় মেয়ে — বরফের এক স্তূপ শুধু!

আকাশ থেকে নেমে এল চন্দ্রকলা, হরিণ থামিয়ে নামলে তার স্লেজ থেকে। এদিক ওদিক যায়, চারিদিকে চায় — মেয়েকে আর পায় না। স্তূপটার কাছে এল, চুড়োটাও দেখলে, কিন্তু ধরতে পারলে না কী।

চন্দ্রকলা বলে, 'কী আশ্চর্য! কোথায় গেল মেয়েটি? খুঁজে যে পাচ্ছি না! এখন যাই, পরে ফের নেমে আসব। তখন নির্ঘাৎ বার করব, হরণ করে নিয়ে যাব!'

স্লেজে চাপল চন্দ্রকলা, হরিণ তাকে নিয়ে গেল আকাশে।

চন্দ্রকলা চলে যেতেই বল্গা হরিণ বরফ খুঁড়তে লাগল। কন্যে বেরিয়ে এসে বলে:

'চল, শিগগির ফিরি ডেরায়! নইলে চন্দ্রকলা দেখে ফেলবে — ফের নেমে আসবে। তখন আর লুকোবার জো থাকবে না!'

উঠে বসল স্লেজে। পুরো দমে ছুটল বল্গা হরিণ। এল ডেরায়। ছাউনির ভেতর ছুটে ঢুকল মেয়ে। ছাউনিতে বাপ নেই। কে তাহলে বাঁচাবে?..

বল্গা হরিণ বলে:

'লুকিয়ে পড়তে হবে, নইলে পেছু ধাওয়া করে আসবে চন্দ্রকলা!'

'লুকোই কোথায়?'

'আমি তোকে কিছু একটা বানিয়ে দেব, ধর একটা পাথরের চাঙ!'

'উহুঁ, ধরে ফেলবে!'

'তাহলে একটা হাতুড়ি করে দিই তোকে!'

'ধরে ফেলবে!'

'তাহলে ছাউনির খুঁটি!'

'ধরে ফেলবে!'

'ছাউনির দোরগোড়ায় চামড়ার পর্দাটার একটা চুল!'

'ধরে ফেলবে, ধরে ফেলবে!'

'কী করি তাহলে, বেশ তোকে একটা প্রদীপ করে রেখে দেব!'

'সেই ভালো! সেই ভালো!'

'তাহলে বস!'

বসল কন্যে। বল্গা হরিণ খুর দিয়ে চাঁট মারলে — কন্যে হয়ে গেল এক প্রদীপ। জ্বলজ্বল করে জ্বলে সে প্রদীপ, সারা ছাউনি আলো হয়ে ওঠে।

প্রদীপ হতে না হতেই চন্দ্রকলা কন্যের সমস্ত পশুপাল খুঁজে দেখে এসে পৌঁছল ডেরায়।

নিজের হরিণটি খুঁটিতে বেঁধে ছাউনিতে ঢুকল। খুঁজতে লাগল। এদিক খোঁজে ওদিক খোঁজে, কোথাও আর পায় না। ছাউনির খুঁটিগুলোর মধ্যে গিয়ে দেখে, হাঁড়ি পাতিলে উঁকি দেয়, ছালের প্রতিটি লোম পরখ করে, বিছানার তলের প্রতিটি পালা হাতড়ায়, মেঝের প্রতি টুকরো মাটি — কোথাও নেই সে!

প্রদীপটা কিন্তু তার চোখে পড়ে না, কেননা প্রদীপ যেমন জ্বলজ্বলে, চন্দ্রকলাও তেমনি।

চন্দ্রকলা বলে, 'আশ্চর্য ! গেল কোথায়? দেখছি তাহলে আমায় এখন ফিরতে হয়।'

ছাউনি থেকে বেরিয়ে হরিণের বাঁধন খুললে। বাঁধন খুলে চাপল স্লেজে। স্লেজ হাঁকাতে যাবে অমনি কন্যে ছুটে এসে চামড়ার পর্দা সরিয়ে কোমর পর্যন্ত বাড়িয়ে হেসে বললে চন্দ্রকলাকে:

'এই তো আমি! এই তো আমি!'

হরিণ ফেলে চন্দ্রকলা ফের ঢুকলে ছাউনিতে। কন্যে ততক্ষণে ফের প্রদীপ হয়ে গেছে।

খুঁজতে শুরু করলে চন্দ্রকলা। ডালপালার মধ্যে খোঁজে, ছালের লোম, মাটির চাঙের মধ্যে খোঁজে — কিন্তু কোথাও নেই সে।

'সে কী! কী আশ্চর্য! কোথায় সে? গেল কোথায়? দেখছি খালি হাতেই ফিরতে হবে!'

ছাউনি থেকে বেরিয়ে হরিণের বাঁধন খুলতে যায়, অমনি কন্যে কোমর পর্যন্ত উঁকি দিয়ে হাসে, বলে:

'এই তো আমি! এই তো আমি!'

ফের ছাউনিতে ছুটে এল চন্দ্রকলা, খুঁজতে শুরু করলে। খুঁজলে অনেকখন ধরে, সবকিছু হাতড়ে দেখলে, সব কিছু উলটুল করলে, কিন্তু খুঁজে আর পায় না...

খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে গেল সে, রোগা হয়ে গেল, দুবলা হয়ে গেল। টেনে টুনে পা ফেলে। কষ্টে সৃষ্টে হাত নাড়ে।

তখন আর ভয় পেল না কন্যে। স্বরূপ ধরে সে বেরিয়ে এল ছাউনি থেকে, চন্দ্রকলাকে জাপটে ধরে তার হাত পা বেঁধে ফেললে।

চন্দ্রকলা বলে, 'উঃ আঃ, আমায় যে মেরে ফেললি! তা মেরেই ফ্যাল, আমারই তো দোষ -- পৃথিবী থেকে তোকে হরণ করতে চেয়েছিলাম। তবে শেষ নিঃশ্বাসের আগে আমায় একটু ঢাকাঢুকো দিয়ে শুইয়ে দে। গরম হয়ে নিই, ভারি জমে গেছি...'

অবাক লাগল কন্যের:

'জমে গেছ মানে? তুমি তো চিরকাল খোলা আকাশে থাকো, ছাউনি নেই তোমার, হাঘরে তুমি, এখনো তাই থাকে। তোমার আবার ঢাকাঢুকো কিসের?'

কন্যের কাছে কাকুতি মিনতি করতে লাগল চন্দ্রকলা:

'আমি যদি চিরকালের হাঘরে, তবে সেই খোলা আকাশেই ছেড়ে দে আমায়! তোদের মন মাতাব আমি! ছেড়ে দে আমায় — আমি হব তোদের পথের দিশারী! ছেড়ে দে আমায় — রাতকে দিন করে দেব! ছেড়ে দে আমায় — তোদের জন্যে বছর মেপে যাব আমি! প্রথমে হব বুড়ো ষাঁড়ের চাঁদ, তারপরে বাছুর জন্মের চাঁদ, তারপর জলের চাঁদ, তারপর পাতা ফোটার চাঁদ, তারপর গরমের চাঁদ, তারপর শিঙ খসার চাঁদ, তারপর বুনো হরিণ মিথুনের চাঁদ, তারপর প্রথম শীতের চাঁদ, তারপর ছোটো দিনের চাঁদ...'

'আর ছেড়ে দিলে যখন তোমার বল হবে, হাতে পায়ে জোর হবে, তখন আমার পিছু ধাওয়া করবে না তো?'

'উঁহু, আর করব না! সব ভুলে যাব! করবই বা কী করে — তুই যে ভারি বুদ্ধিমতী! আকাশের পথ ছেড়ে আর কখনো নেমে আসব না! ছেড়ে দে, কিরণ দিই!'

ছেড়ে দিলে, কিরণ দিতে লাগল চন্দ্রকলা।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে আমরা বাধিত হব।

আশা করি আপনাদের মাতৃভাষায় অনূদিত রুশ ও সোভিয়েত সাহিত্য আমাদের দেশের জনগণের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক হবে।

আমাদের ঠিকানা:

'রাদুগা' প্রকাশন
১৭, জুবোভ্স্কি বুলভার
মস্কো ১১৯৮৫৯, সোভিয়েত ইউনিয়ন

'Raduga' Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow 119859, Soviet Union

